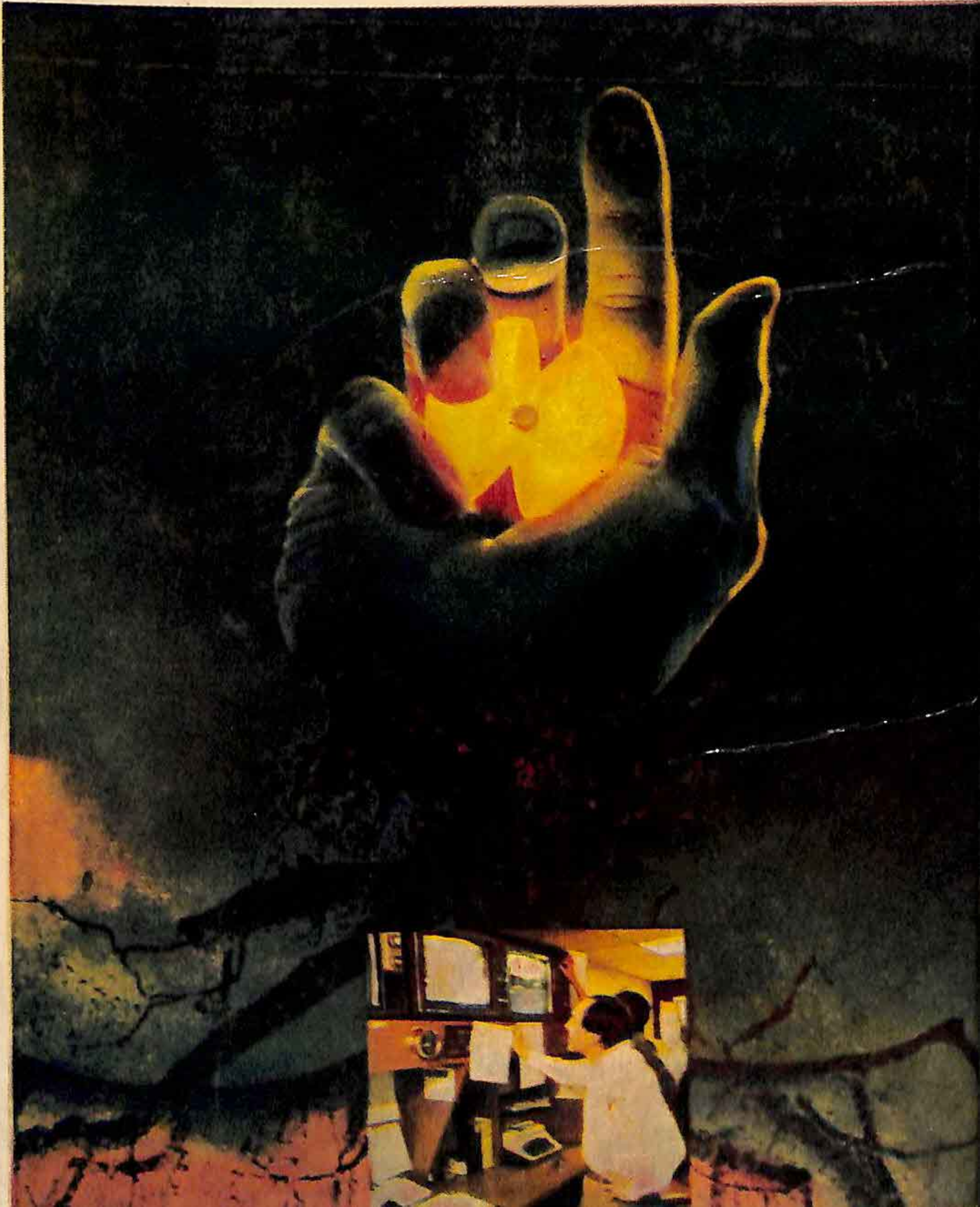
বিজ্ঞান রথের সারথি

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়



বিজ্ঞান রথের সারথি

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল :
মার্চ, ১৯৮৫

প্রকাশক :
কান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর ঘোষ

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য : পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমতী মালা মজুমদার
শ্রীমান প্রদীপকুমার মজুমদার
কল্যাণবরেষু



LOUIS PASTEUR



F. W. ADAM SERTURNER

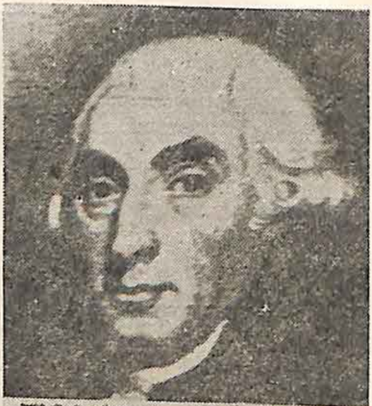


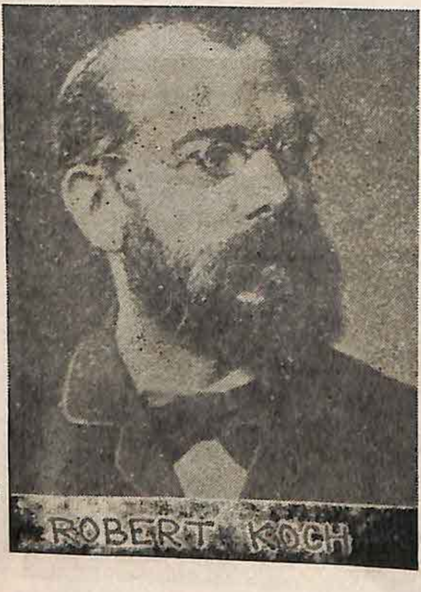
MICHAEL FARADAY



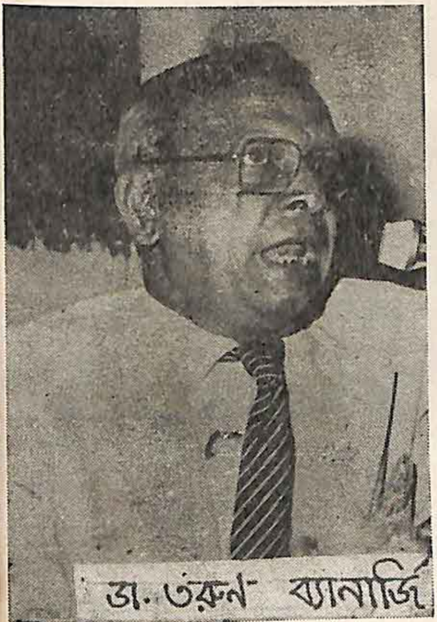
ALBERT EINSTEIN


EDWARD JENNER

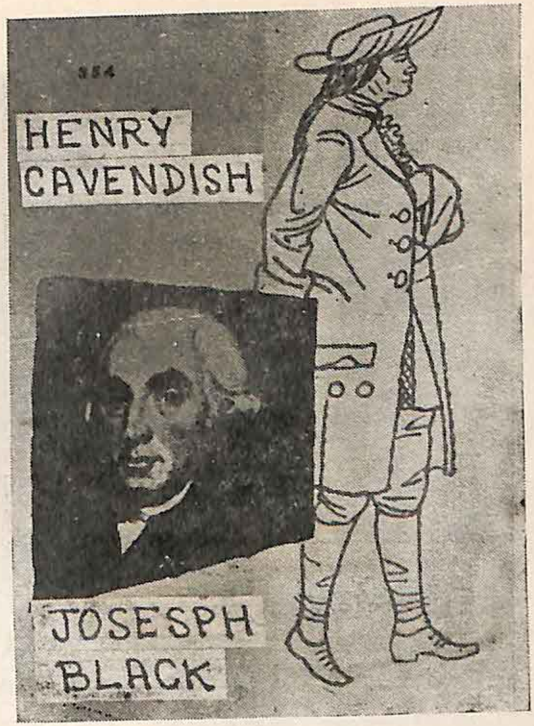

JOSEPH BLACK


ROBERT KOCH


HORACE WELLS



ডা. তরুণ ব্যানার্জি

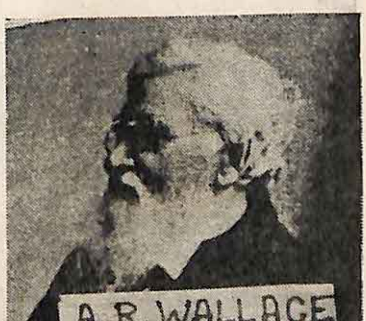


HENRY CAVENDISH

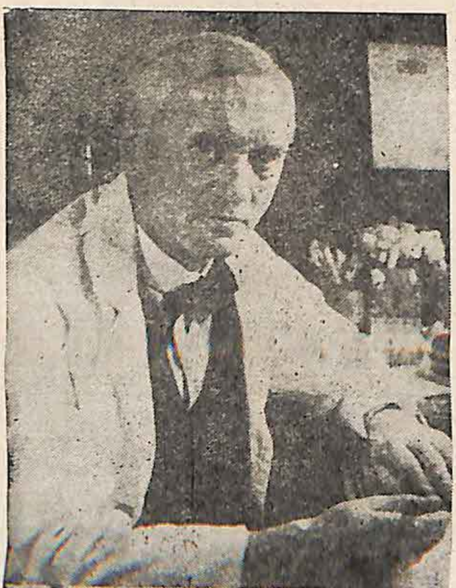
JOSESPH BLACK



LAVASOR



A. R. WALLACE



SIR ALEXANDER FLEMING



ডা. মহামায়া সরকার



G. DOMAGK.



ডা. লোলিথা কামেশ্বরম



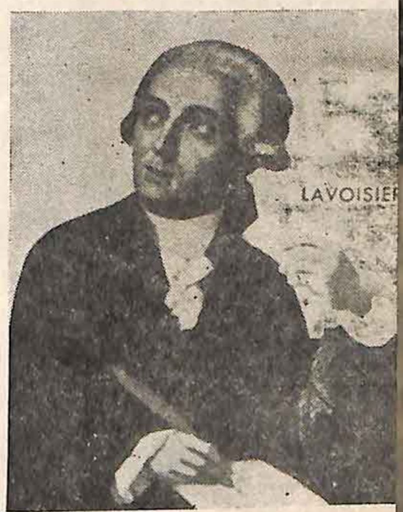
ROBERT KOCH



JOSEPH PRIESTLY



জগমোহন কোঠারি





PAUL EHRLICH



ARISTOTLE

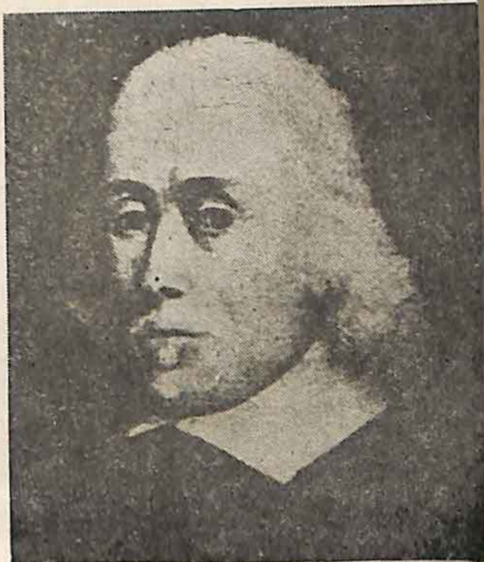


ডা. বিশ্বনাথ রায়

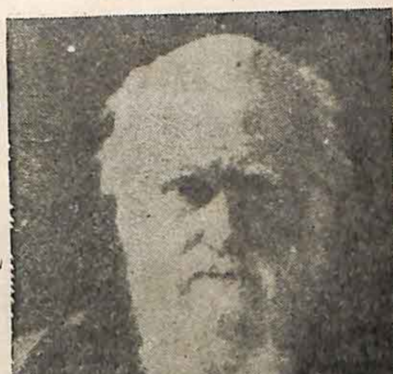


ডা. কামেশ্বরম


W. RONTGEN


WILLIAM HARVEY


HARRY S. TRUMAN


CHARLES DARWIN



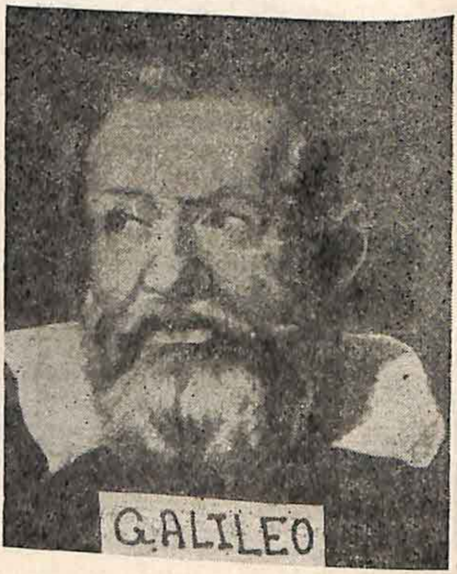
SELMAN A. WAKSMAN



DR. B.N. PURANDARE



ALFRED JOSEPH CLARK



G.ALILEO

॥ এক ॥

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস আরম্ভ করলে মানুষের বন্যজীবন থেকেই শুরু করা মনে হয় উচিত হবে, কারণ প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল সেদিন, যেদিন মানুষ জন্তু হিসেবে অরণ্যে বাস করত।

মানুষের সেদিন যে রূপ ছিল, কোনমতেই আমাদের সঙ্গে তার মিল হতে পারে না। সেদিন মানুষ ছিল বর্বর, নিষ্ঠুর, পুরুষ। সারা গায়ে বড় বড় লোম, মাথা ভরতি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বড় বড় নিষ্ঠুর প্রখর নখ, বড় বড় দাঁত—। সেদিন সমাজ আজকের মত ছিল না। অরণ্যের মধ্যে মানুষ অন্য জন্তুর সঙ্গেই বাস করত। দলের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হত এবং যে জিততো সেই দলপতি হয়ে উঠত। এদের আচার ব্যবহারও নিতান্ত পশুর মতই ছিল সেদিন। শিকার বধ করে কাঁচা মাংস নখ দিয়ে ছিঁড়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করত। মানুষের নিজস্ব কোন আলাদা ভাষা ছিল না। আকারে ইঙ্গিতে শব্দে পরস্পর পরস্পরের মনের কথা জানাবার চেষ্টা করত। সে যুগে মানুষের আলাদা কোন সমাজও ছিল না। বনের অন্যান্য পশুর সঙ্গে সেও বনের মধ্যে বাস করত।

সে যুগে মানুষের নানা বিপদ ছিল। বনের মধ্যে দল বেঁধে বাস করলেও ভয়ঙ্কর রকমের জন্তুর আক্রমণে প্রায়ই মানুষকে নাজেহাল হতে হত, আর ছিল দাবানল। আগুনকে প্রায়ই তখন মানুষ অন্য জন্তুর মতই ভীষণ ভয় করত। আগুন যে কী সে ধারণা তখন মানুষের ছিল না। দাবানলের দিকে তাকিয়ে মানুষ ভাবত, আগুনও বুঝি একটা বিরাট আকারের জানোয়ার। আগুনের নিঃশ্বাসে সমস্ত প্রাণী, গাছপালা ঝলসে যায়। অন্যান্য পশুদের সঙ্গে মানুষও সে বন থেকে পালিয়ে অন্য বনে আশ্রয় নিত নতুন জীবন যাপন করবার জন্যে।

এমনি একটি দিনে।

একদল মানুষ শিকারের সন্ধানে সকাল থেকেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোথাও শিকারের সন্ধান নেই। পশুগুলো যেন মানুষের গন্ধ পেয়ে লুকিয়ে পড়েছে। শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষগুলো সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যের সময় ক্ষিধের জ্বালায় নেতিয়ে পড়ল। আজ অনাহারেই কাটবে পুরো দিনরাত। দলপতি তখনও আশা ছাড়েনি। এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল যদি কোন শিকার পাওয়া যায়।

হঠাৎ বনের মধ্যে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ল। গাছে গাছে ঘর্ষণ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দাবানল। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু পরেই দপ্ করে আবির্ভাব হবে আগুন নামক ভয়ঙ্কর জন্তুটির। তার নিঃশ্বাসে সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। পালাও। বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও।

জন্তু জানোয়ার সরীসৃপ মানুষ সব একসঙ্গে পালাতে লাগল বন ছেড়ে। দলপতি একটু পিছিয়ে পড়েছিল, কারণ শিকার খুঁজতে সে বনের ভেতর অনেকখানি চলে গিয়েছিল। দলপতি প্রাণপণে ছুটছে তার দলে পৌছুবার জন্যে। দলের লোকেরা অনেক দূরে চলে গেছে। তাদের ধরতে না পারলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

দপ্ করে সামনে জ্বলে উঠল দাবানল।

পালাবার পথ বন্ধ। পেছন দিকেও আগুন জ্বলছে। একমাত্র উপায় যদি পাশ কাটিয়ে পালানো যায়। একটা ভাঙ্গা ডাল তুলে নিয়ে মানুষটা বাঁ-দিকে ছুটতে লাগল। যদি আগুন নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। ডাল দিয়ে লড়াই করবে তার সঙ্গে।

দেখতে দেখতে আগুন কাছে এসে পড়ল। আগুনের হলকায় তার গা পুড়ে যাচ্ছে। আর সহ্য করা যাচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে হাতের ডাল দিয়ে এলোপাথাড়ি আগুনকে পেটাতে শুরু করল। আগুনের খানিকটা নিবে গেল কিন্তু ডালের ডগাটা জ্বলতে লাগল। মানুষটা অবাক হয়ে দেখল আগুন মার খেয়ে ফোঁসফোঁসিয়ে তেড়ে এলো না। নিজের হাতে ধরা ডালের ডগায় যে আগুন জ্বলছে তার ব্যবহারও তো হিংস্র পশুর মত নয়। মাটিতে আছাড় মেরে আগুন নিবিয়ে ফেলল। জ্বলন্ত ডালটিকে নিয়ে লোকটা ছুটতে লাগল নিজের দলের দিকে। আগুন জ্বলছে। অবাধ্য পশুর মত তার ব্যবহার নয়। দাবানল কমে আসছে। মানুষটা দাবানলের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ডালটা পুড়ে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। লোকটা আর একটা ডাল ভেঙে নিল। চেপে ধরল জ্বলন্ত কাঠের ডগায়। পুরনো ডাল থেকে আগুন নতুন ডালে চলে এলো পোষা পাখির মত।

নিজের দলে মিশতে সবাই ভয় পেয়ে গেল দলপতির কারখানায়। দলপতি তাদের অভয় দিয়ে বোঝাল এ আগুন বিপদ আনবে না বরং বিপদে সাহায্য করবে। বনের মধ্যে হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে বাঁচতে হলে আগুন ছাড়া আর কোন কিছু দিয়েই বাঁচা সম্ভব হবে না। দলপতির নির্দেশে সকলে শুকনো কাঠ,

গাছ পাতা জড়ো করে চারধারে সাজালো, পারলো না শুধু একজন। অসহ্য যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। দলপতি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অন্য সকলকে গাছপালা সাজাবার হুকুম দিল, জায়গাটার চারদিকে বেড়ার মত গাছপাতা সাজানো হয়ে গেলে দলপতি আগুন জেলে দিল। আস্তানার চারদিকে একটা আগুনের পাঁচিল তৈরি হল। আশেপাশে যে সমস্ত জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা আগুন দেখে দূরে পালিয়ে গেল। মানুষের নিরাপদ আস্তানার সৃষ্টি হল।

শুধু নিরাপদ আশ্রয় নয়, সেদিন থেকে তৈরি হল মানুষের আলাদা সমাজ। আগুনের বেড়াজাল ভেঙ্গে অন্যান্য পশুরা মানুষের কাছাকাছি আসতে সাহস করল না, বরং দূরে পালিয়ে গেল। পারিপাশিক নিরাপত্তা সৃষ্টি হবার পর মানুষের দল নিজেদের মঙ্গল, উন্নতি এবং নিরাপত্তার দিকে নজর দেবার সময় পেল।

যে লোকটি কাতরাচ্ছিল, তার দিকে এগিয়ে গেল দলপতি। অন্য সকলেও দলপতিকে অনুসরণ করল। লোকটির পা ফুলে উঠেছে। পায়ে একটা হাড় ফুটেছে। হাড় ফুটে বিষাক্ত হয়ে গেছে পুরো পায়ের পাতা। একটা লোক তাড়াতাড়ি কতকগুলো পাতা কচলে তার রস লাগিয়ে দিল ফুলো জায়গাটায়। ভাবল যদি কোন উপায়ে লোকটার যন্ত্রণা কমে যায়। সে যুগের মানুষের মস্তিষ্কে বুদ্ধি ছিল না বললেও অত্যুক্তি হবে না। সে যা করত বনের পশুর অনুকরণেই করে বসত। তখনকার মানুষ লক্ষ করত অন্য অন্য পশুরা নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই করে। আজকের যুগেও প্রাকৃতিক চিকিৎসকরা লক্ষ করে দেখেছেন মনুষ্যেতর প্রাণী প্রকৃতির ভেতর থেকেই ওষুধ খুঁজে বার করে নেয়। কুকুর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে খাবার খেতে চাইবে না এবং ঘাসের ডগা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে বমি করবে, পায়খানা হবে, তারপর আপনা থেকেই সুস্থ হয়ে ওঠে। পশুরা আঘাত পেলে নিজের ক্ষতস্থান নিজে চেটে চেটে সারিয়ে নেয়। বেজিকে যদি সাপে কামড়ায় সে ছুটে গিয়ে মাইমোে পাতা চিবিয়ে খেয়ে বিষের তেজ নষ্ট করে ফেলে। প্যাঁচা মাঝে মাঝে ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খায় পালকের উকুন ছাড়াবার জন্য।

এ সমস্তই প্রকৃতিগত চিকিৎসা। প্রকৃতির মধ্যে যারা বাস করে আপনা থেকেই তারা এই ধরণের চিকিৎসা আবিষ্কার করে নেয়। মানুষও সেদিন পশু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই তার চিকিৎসা প্রথাও ছিল বিভিন্ন পশুদের মত।

ধুলো বালি পাতা লতা দিয়েও দলের লোকটির পায়ের ফুলো কমল না বরং বেড়ে যেতে লাগল। পেকে পুঁজ হয়ে গেল, দেখতে দেখতে জ্বর বেড়ে গেল। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সেই মানুষটা।

দলপতি চিন্তিত হয়ে পড়ল লোকটির জন্য। সেই বোধহয় প্রথম মানুষ আর একজন মানুষের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করতে শুরু করল। এ সময় মানুষকে বলা হয় ক্রো-ম্যাগনন। ক্রো-ম্যাগনন মানুষের খুলি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এরা এদের পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

দলপতি চিন্তিত হয়ে দলের সবাইকে জিজ্ঞাসা করল, কীভাবে অসুস্থ লোকটিকে সুস্থ করা যায়? সকলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, তারপর মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ জানাল সে চেষ্টা করে দেখতে পারে।

দলপতির অনুমতি পেয়ে লোকটি একটা পাথরকে আর একটা পাথর দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুঁচলো করে ফেলল, তারপর সেই ছুঁচলো পাথরটা অসুস্থ লোকটার পায়ের পাতায় ফুঁড়ে দিয়ে লম্বালম্বি চিরে দিল। গলগলিয়ে পুঁজ বেরিয়ে গেল পা থেকে তার সঙ্গে গলা পচা হাড়টাও বেরিয়ে গেল। সকলে সবিস্ময়ে দেখল পুঁজ রক্ত বেরিয়ে যাবার একটু পরেই লোকটা সুস্থ হয়ে বসল।

দলপতি তখন ঠিক করল, সেই বিশেষ লোকটি দলের সকলের চিকিৎসা করবে। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগের শেষের দিকে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের কালে দলবদ্ধভাবে অসুস্থতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। সেই যে অসুস্থ মানুষের পায়ের নীচে পাথর চিরে অপারেশন করা হয়েছিল, সেই অপারেশন আজও চলছে। যে আবিষ্কার ক্রো-ম্যাগনন মানুষের একজন আকস্মিকভাবে করেছিল সে আবিষ্কারের ধারা অব্যাহতভাবে ইতিহাস ধরে চলে আসছে।

॥ দুই ॥

ক্রো-ম্যাগনন্ যুগ থেকেই মানুষের বিজ্ঞান শুরু হয়েছে, এ কথা বিশেষজ্ঞগণ বার বার প্রমাণ করেছেন নানা তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে। মানুষ নামক জন্তুর সভ্যতার অগ্রগতির পদক্ষেপ আরম্ভ হয়েছিল ক্রো-ম্যাগনন্ কালে অর্থাৎ প্রস্তরযুগের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। এই সময়ে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। আর এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ অন্যান্য বনজ পশুর সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মানুষ আগুন জ্বালিয়ে নিজের আস্তানাকে আলাদা করে নিল, নিরাপদ করে ফেলল। এই সময় থেকেই মানুষ গুহা অথবা ঘর তৈরি করে থাকার ব্যবস্থা অবলম্বন করল, অতীত কালের বনজ জীবন পরিত্যাগ করে সামাজিক জীবনের সূচনা করল। আগুনের আবিষ্কারের পরই মানুষ তার জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলল। কাঁচা মাংসের বদলে আগুনে ঝলসানো মাংস তার খাদ্য হল। লোহা ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু আগুনে গরম করে ব্যবহার শুরু করল। ইতিহাস-বিদ্‌দের আখ্যানুযায়ী এই যুগের নাম হল লোহা এবং ব্রোঞ্জের যুগ।

এই যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আরও উন্নতি শুরু হল। মানুষ রোগ দূর করার জন্য শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নৃতত্ত্ববিদেরা নরকরোটি পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই যুগের মাথার খুলিতে ছোট-বড় গর্ত আছে। সেগুলিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ট্রিফাইন (trephine)। বিভিন্ন ধরনের ট্রিফাইন দেখে এই ধারণা হয় যে তখনকার মানুষরা একাধিক রোগে মাথার খুলি ফুটো করত। বর্তমান যুগে ট্রিফাইন করা হয় ব্রেন সার্জারি করার জন্যে। তাহলে কি সেই ব্রোঞ্জ বা লৌহ যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্রেন সার্জারির খুব প্রচলন ছিল? স্বভাবতই সাধারণ মানুষের মনে এ প্রশ্ন আসে। এ তথ্য নিয়ে বিশেষ-জ্ঞগণ বহু রকমের গবেষণা করেছেন। তাঁদের ধারণা লৌহ যুগে চিকিৎসাপদ্ধতি দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। অল্প সামান্য অসুখে সাধারণ চিকিৎসা করা হত, বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়লে নানারকম অদ্ভুত চিকিৎসার আয়োজন করা হত।

এমনি একটি দিনে—

একটা মানুষের হঠাৎ তড়কা আরম্ভ হল। দলের সকলে সবিস্ময়ে দেখল জোয়ান মানুষটা চাষ করতে করতে হঠাৎ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মাঠের ওপর পড়ে গেল। আশে পাশে যারা চাষ করছিল ছুটে এসে মানুষটাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গাঁয়ের

চিকিৎসকের বাড়ি হাজির হল। চিকিৎসক দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে রোগীর উপসর্গের কথাগুলো শুনলেন তারপর গম্ভীরভাবে বললেন—বুঝতে পেরেছি।

উপস্থিত সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রোগের কিনারা হয়েছে তাহলে। লোকটি তাহলে সুস্থ হয়ে উঠবে। ঢং করে ঘণ্টা বাজালেন চিকিৎসক।

কুটিরের ভেতর থেকে দুজন ষণ্ডাগণ্ডা সহকারী এসে চিকিৎসকের পাশে দাঁড়াল। চিকিৎসক তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই লোকটার দেহে খারাপ আত্মা প্রবেশ করেছে। তারই প্রভাবে ওর তড়কা হচ্ছে। ও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—ঠিক বলেছেন প্রভু।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মানুষের দল আনন্দে চিৎকার করে উঠল—প্রভুর জয় হোক।

চিকিৎসকের সামনে রুগ্ন রোগীকে শুইয়ে দেওয়া হল। সহকারী দুজন রোগীর হাত-পা বেঁধে ফেলল। নিরুপায় নির্জীব রুগ্ন মানুষটি নির্বিবাদে চিকিৎসকের অত্যাচার সহ্য করতে লাগল। হাত-পা বাঁধার পর চিকিৎসক তার সহকারীদের নিয়ে বিচিত্র সুরে ও ভঙ্গীতে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে চিকিৎসক আর তার সহকারীদ্বয় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন, রোগী তখন অচেতন।

কিছুক্ষণ রোগীর দিকে তাকিয়ে চিকিৎসক ঘোষণা করলেন—আত্মা পালিয়ে গেছে। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

জয়, মহাপ্রভুর জয়।

গ্রামবাসী সমস্বরে চিকিৎসকের জয়গান ঘোষণা করল। তারা খুসী মনে রোগীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে ঘুম থেকে ওঠাল। রোগী জেগে বসে চারদিকে তাকিয়ে আবার গোঁ গোঁ করতে লাগল। হাত-পা খিঁচতে লাগল। কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়তে লাগল। আবার—আবার সেই তড়কার ঝাঁকানি।

গ্রামবাসীরা সভয়ে চিকিৎসকের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলতে লাগল—প্রভু! এর ভেতরে যে আত্মা ঢুকেছে, তাকে যেভাবে হোক তাড়াতে হবে।

—হুম্। চিকিৎসক নিজের দাড়ি নাড়তে নাড়তে গম্ভীরভাবে বললেন, ওর দেহের মধ্যে যে দূষিত আত্মা ঢুকেছে, তাকে শরীর থেকে বার করে দিতে হবে, নইলে ওর নিস্তার নেই।

—ঠিক! ঠিক কথাই বলেছেন প্রভু। ওর শরীর থেকে যেভাবে হোক ওই দূষিত আত্মাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

চিকিৎসক সহকারীদের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সহকারীরা ঘরের মধ্যে চলে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এল হাতে হাতুড়ি আর লোহার ধারাল ছেনির মত অস্ত্র নিয়ে। মৃত্যুর আতঙ্কে নীল হয়ে রোগী চিৎকার করে উঠল ওই অস্ত্র দেখে। সে জানে ওই অস্ত্র দিয়ে কি করা হবে। সে নিজেও দেখেছে অনেক রোগীর প্রাণ এইভাবে শেষ হয়ে গেছে।

রোগীর স্ত্রী চিকিৎসকের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে মিনতি জানাল—প্রভু ওকে মেরে ফেলবেন না। ও রুগ্ন হয়েই বেঁচে থাকুক।

—না, না—সমবেত মানুষের দল চিৎকার করে উঠল—ওই বদ-আত্মা নিয়ে আমরা থাকতে দেব না। বেশিদিন এইভাবে থাকলে ওই আত্মা আরও অনেক লোকের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবে। অনেককে ওই ধরনের রুগ্ন করে দেবে।

—ঠিক ঠিক! আবার মাথা নাড়লেন চিকিৎসক।—এই, তোমরা ওকে চেপে ধর। মাথা যেন না নাড়তে পারে। শেষের আদেশ সহকারীদের।

সহকারী দুজন রোগীর মাথা চেপে ধরল। এমনভাবে যে সে যেন নড়াচড়া করতে না পারে। উপস্থিত জনতা লোকটির হাত-পা চেপে ধরল। চিকিৎসক কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে ঠিক করলেন মাথার কোন জায়গায় ফুটো করলে আত্মাটা ঠিক বেরিয়ে যেতে পারবে। তারপর নির্ধারিত স্থানে বাটালী বসিয়ে হাতুড়ির ঘা মারতে শুরু করলেন। একদিকে রোগীর প্রাণবিদারক চিৎকার, অন্যদিকে সমবেত জনতার জয়োল্লাস। অনেকক্ষণ পরে মাথার খুলির একটা চাকতি খুলে বেরিয়ে এল, তার সঙ্গে ঘিলুর অনেকটা অংশ এবং মস্তিষ্কের জল। দেখতে দেখতে চোখের সামনে রোগী চিরনিদ্রায় লুটিয়ে পড়ল।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত এপিলেপ্সি (মৃগী), আধকপালে (মিগ্রেন) প্রভৃতি স্নায়বিক রোগের চিকিৎসায় সে যুগের চিকিৎসকরা মাথার খুলি ট্রিফাইন করতেন। এই সময় থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে মন্ত্র এবং ম্যাজিক প্রবেশ করে। সে যুগের মানুষেরও ধারণা ছিল রোগ কোন অসাধু আত্মার অত্যাচারের ফল। যাঁরা রোগের চিকিৎসা করতেন, অর্থাৎ বর্তমানকালের ভাষায় যাঁদের চিকিৎসক বলা হয়, তাঁরাও এই কথা বিশ্বাস করতেন এবং ভূত তাড়াবার জন্য নানারকম আদিভৌতিক ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নিতেন। মানবসভ্যতার প্রথম সূচনা থেকে মানুষের মনে কুসংস্কার সর্বপ্রথমে বাসা বাঁধে। পরবর্তীকালে ধর্মের সৃষ্টি হয়,

কিন্তু মানুষের মনে কুসংস্কার এবং অলৌকিক ভীতি থাকার জন্যই ধর্মকে অত সহজে সে গ্রহণ করেছিল।

সে যুগের চিকিৎসকরা নানারকম মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং পারদর্শী ছিলেন। সমাজের অন্যান্য স্তরের লোকেরা চিকিৎসকদের ভয় করত, এবং খুব সম্মান করত। ত্রিশ হাজার বছর আগেকার কথা বলে কী হবে, আজও আমরা কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আজও অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পরিত্যাগ করে মন্ত্র, যাগযজ্ঞের আশ্রয় নিই যদি রোগীর কোন উপকার হয়।

মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারাও উন্নত হয়ে ওঠে। কবে থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত হয়ে ওঠে, সেকথা বলা আজ খুবই কঠিন, তবে ছ' হাজার খৃস্টপূর্ব সময় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঠিক ইতিহাসের খোঁজ পাই। প্রায়ই একই সময়ে, দুটি দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নত গ্রন্থের কথা জানতে পারা যায়। দুটি দেশে বহু খ্যাতনামা চিকিৎসকের নামও ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। প্রথম দেশ আমাদেরই ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় দেশ গ্রীস।

॥ তিন ॥

প্রাচীন হিন্দুযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল একথা প্রায় সকলেই জানেন। এই যুগের চিকিৎসাধারাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ এবং বৌদ্ধোত্তর যুগ।

বেদ ভারতীয় শিক্ষাধারার মর্মমূল। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান আয়ুর্বেদ গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। আয়ুর্বেদ নামটি এসেছে তার অন্যতম কারণ এই গ্রন্থের বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আয়ুর বৃদ্ধি ঘটে। আয়ুর্বেদের সৃষ্টি হয়েছে ঋগ্‌বেদ থেকে, যে বেদে বিভিন্ন রকমের ওষুধের কথা আলোচিত হয়েছে। শল্যচিকিৎসা অথবা সার্জারি বিষয়ক জ্ঞান আয়ুর্বেদে লিপিবদ্ধ আছে। আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন স্বয়ং ব্রহ্মা। সৃষ্টির রক্ষার জন্য ব্রহ্মা শত অধ্যায়ে বিভিন্ন রোগের বিধি বর্ণনা করেন। এক একটি অধ্যায়ে একশ করে শ্লোক আছে। আয়ুর্বেদই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ঔষধগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত এবং উন্নত ধরনের হয় সুশ্রুত

এবং আত্রেয়র সময় থেকে। তার আগে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে খানিকটা ধর্ম, খানিকটা পুরাণতত্ত্ব মিশে একাকার হয়েছিল। অশ্বিনীকুমার, ভরদ্বাজ, সে যুগের খ্যাতনামা চিকিৎসক। অনেকের মতে, ভরদ্বাজ বৃহস্পতির পুত্র এবং ব্রহ্মার কাছ থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞান শিখেছিলেন। ভরদ্বাজের শিষ্যবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন চরক, সুশ্রুত, ভগবৎ এবং মাধব। ধন্বন্তরি প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাজগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। অনেকের মতে তিনি বিষ্ণু-অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান করে তোলার জন্য।

যাই হোক, প্রাচীন বৈদিক যুগে চিকিৎসাধারার যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিকশিত হয়েছিল, তা আজও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও খণ্ডন করার ক্ষমতা নেই। পূর্ববর্তী যুগের বিশ্বাসকে বৈদিক যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একেবারে নস্যাৎ করে দেন নি। ক্রো-ম্যাগনন্ যুগ কি তার পরেও হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যে বিশ্বাসকে মনে পোষণ করে এসেছিল, বৈদিক যুগের বিজ্ঞানীরা তাকে বিজ্ঞানসম্মতরূপে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁদের মতে অসুস্থতা থেকেই মৃত্যু ঘটে। মানুষ যদি অসুস্থতা থেকে মুক্তি পায়, সে অমর হয়ে উঠতে পারে। যে পদার্থের সমন্বয়ে মানুষের দেহ গঠিত, তারই ছন্দহীনতায় অসুস্থতার সৃষ্টি। মানুষের দেহ সৃষ্টি হয়েছে আত্মা (পুরুষ) এবং পদার্থের (প্রকৃতির) মিশ্রণে। বেদপূর্ব যুগে দুষ্ট আত্মার প্রবেশে অসুখের সৃষ্টি হয় বলে যে ধারণা ছিল, বৈদিক যুগের বিজ্ঞানীরা সে ধারণাকে পরিবর্তিত করে জানালেন, না দুষ্ট আত্মার প্রবেশ নয়, শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রমে নিজের আত্মাই বিচলিত হয়ে পড়ে। আর তারই প্রকাশে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। দৈহিক পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দোষে রোগ সৃষ্টি হয়, এ কথা প্রায় আট হাজার বছর আগে বৈদিক যুগের বিজ্ঞানীরা বলে গিয়েছিলেন, আজও তার খুব বেশি নড়চড় হয়নি।

বৈদিক যুগের চিকিৎসকদের মতানুযায়ী দৈহিক দোষ প্রধানতঃ তিন প্রকারের। বায়ু, পিত্ত, কফ। বায়ু দোষ অর্থে পরিপাকযন্ত্র এবং তার আনুষঙ্গিক অঙ্গের দোষ। পিত্ত দোষ স্বভাবতঃ লিভারের দোষ আর কফ দোষ শ্বাস-প্রশ্বাস-এর দোষ। এ ধরনের শ্রেণীবিভাগ চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে আজও আমরা করে থাকি।

বৈদিক যুগের চিকিৎসাধারাকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগকে বলা হয় পুরাণের যুগ এবং নবীনতর যুগকে সংহিতার যুগ বলা

হয়। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের ধারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে দানা বেঁধে ওঠে এবং আর্যসভ্যতার কালে পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নতধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি লক্ষ করা হয়।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মেডিকেল সিম্পোসিয়াম্ হয় ভারতবর্ষে, সম্ভবতঃ সাতশত খৃষ্টপূর্ব সময়ে হিমালয়ের পাদদেশে। চরক সংহিতা থেকে আমরা জানতে পারি, ঋষি ভরদ্বাজ এই সিম্পোসিয়ামের সভাপতি ছিলেন। এই সিম্পোসিয়ামে আলোচিত হয় রোগ কাকে বলে এবং কী করে রোগের নিরাময় করা যায়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ এই সিম্পোসিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। আদিরস, জামদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গৌতম, সাংখ্য, পুলস্ত্য, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, অশ্বলান্য, কপিঞ্জল, বিশ্বামিত্র, ভার্গব, চ্যবন, অভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, কৌদিন্য, দেবলা, গাঁবলা, কুশিকা, বদারণ্য, বদিশা, সারালোমা প্রভৃতি শত শত চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এই সিম্পোসিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিরা একবাক্যে ঋষি ভরদ্বাজকে সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নানারকম রোগের চিকিৎসার প্রতিবিধান করতে বলেন। সেই সভায় ঠিক হয়, ভরদ্বাজ মুনি চিকিৎসকদের মুখপাত্র হয়ে ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূর্ণ শিক্ষাগ্রহণ করে ফিরে এসে অন্যান্য চিকিৎসকদের মধ্যে সেই জ্ঞান বিতরণ করে দেবেন। প্রত্যেকের অভিমত নিয়ে ঋষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু! আমি আপনার কাছ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষালাভ করতে চাই।'

—কেন? দেবাদিদেব ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন।

—মানুষের শরীর নীরোগ করতে চাই। রোগই একমাত্র শত্রু যা মানুষকে অমরত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। আপনি সেই অমরত্বের অধিকারী। আপনি জানেন মানুষ কী করে অমর হতে পারে।

ইন্দ্রদেব ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন—এ শাস্ত্রের মূলমন্ত্র আমি জানি না।

—আশাকরি আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন না, তবে আমাকে বলে দিন কার গেছে গেলে শিক্ষালাভ করতে পারব?

—মহামুনি ব্রহ্মার কাছে।

ভরদ্বাজ ব্রহ্মার সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর আবেদন পেশ করলেন। ব্রহ্মার বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য ভরদ্বাজ দীর্ঘকাল তপস্যায় মগ্ন রইলেন। তপস্যার

অন্তর্নিহিত কারণ হল যে বিদ্যালাভের জন্য তপস্যা করা হয় সেই বিদ্যার প্রতি নিষ্ঠা এবং ধৈর্য কতখানি আছে দেখার জন্যই তপস্যার পরীক্ষা। তপস্যা হল প্রস্তুতির পরীক্ষা। এ পরীক্ষা চিরকাল হয়ে আসছে, আজও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

তপস্যার শেষে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে ভরদ্বাজকে প্রশ্ন করলেন—তুমি কি চাও?

—মানুষের অমরত্ব।

—না, তা সম্ভব নয়।

—কেন প্রভু?

—মানুষের শরীরের মধ্যে যে পদার্থ আছে, তার ক্ষয় অনিবার্য, ক্ষয় এবং পূর্তির সমন্বয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের সৃষ্টি। যখন ক্ষয় বেশি হয়, তখনই অসুস্থতা দেখা দেয়, অতিরিক্ত ক্ষয় ঘটলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ঋষি ভরদ্বাজ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—প্রভু, আপনি সৃষ্টিকর্তা হয়েও পক্ষপাতদুষ্ট। আপনি দেবতাকে অমর করেছেন, কিন্তু মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলে ঘোষণা করছেন।

ব্রহ্মা মৃদু রহস্যজনক হাসি হাসলেন। ভরদ্বাজ মৃদু উত্তেজিত হয়ে বললেন—যেহেতু আপনার কোন উত্তর নেই, সেই হেতু আপনি হেসে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

ব্রহ্মা হেসে জবাব দিলেন—তুমি তপস্যায় আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, সেইজন্য তোমাকে জবাব দিচ্ছি। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি যা ভেবেছি, তুমি তার বাস্তব রূপ দিতে পারবে। কিন্তু একথা খুব গোপনে রাখবে, কারণ একথা যদি কেউ জানতে পারে দেবতাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেবে।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্রহ্মার দিকে তাকালেন। ব্রহ্মা ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমি মানুষকেও পরোক্ষভাবে অমর করেছি।

অবাকবিস্ময়ে ভরদ্বাজ ব্রহ্মার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ব্রহ্মা একই সুরে বলে যেতে লাগলেন—মানুষকে আমি আরও বেশি ভালবাসি। মানুষ অমৃতস্যঃ পুত্রা। সে অমর—

—প্রভু! আপনার কথাগুলি একটু পরিষ্কার করে বলুন।

—মানুষকে আমি প্রজনন ক্ষমতা দিয়েছি, বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দিয়েছি। মানুষ তার পুত্রের কীর্তির মধ্যে, বংশের কীর্তির মধ্যেই বেঁচে থাকবে। তার ফলে

মানুষ যুগ যুগ ধরে, চিরকাল বেঁচে থাকবে। আরও বড় হবে, আরও উন্নত হবে। কিন্তু দেবতাদের আর বংশবৃদ্ধি হবে না। তাঁরা যে ক'জন আছেন, সেই কজনই চিরকাল থাকবেন, কিন্তু মানুষ বাড়বে, এত বাড়বে যে তারা ইচ্ছে করলে দেবকুলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে।

ঋষি ভরদ্বাজ অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের দীর্ঘায়ু হবার অধিকারও কি নেই।

—নিশ্চয়ই আছে। দৃঢ়কণ্ঠে ব্রহ্মা উত্তর দিলেন—কিন্তু সে বিদ্যা অল্প কথায় শেখা যাবে না।

—আমি পৃথিবীর চিকিৎসকদের মুখ্য প্রতিনিধি। আমি আপনার কাছে এসেছি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য। যতদিনই লাগুক আমি অপেক্ষা করব। পরিপূর্ণভাবে শিক্ষালাভ করে আমি সর্বত্র সেই শিক্ষাধারাকে ছড়িয়ে দেব।

—বেশ! তবে শোন।

ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হয়ে মানুষের অসুস্থতার বিভিন্ন কারণ ব্যক্ত করলেন। কী পদ্ধতিতে, কী চিকিৎসায় সেই অসুস্থতা নিরাময় হতে পারে তারও পদ্ধতি জানালেন। ব্রহ্মা-মুখ-নিঃসৃত বাণীই হল বৈদিক যুগের আয়ুর্বেদ।

॥ চার ॥

চরক সংহিতা প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাগ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে চিকিৎসকগণ এই গ্রন্থটিকে রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

চরক সংহিতা একজন চিকিৎসক কর্তৃক সৃষ্ট নয়। আত্রেয় চিকিৎসার বিধান মুখে মুখে বলে যান। তাঁর শিষ্য অগ্নিবেশ, সেই বিধিগুলি লিপিবদ্ধ করেন। অগ্নিবেশের পরে চরক অগ্নিবেশের লেখাকে সুসম্পাদিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন এবং সেই গ্রন্থেরই নাম চরক সংহিতা।

চরক সম্পাদিত সংহিতার আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আত্রেয়র নাম এসে পড়ে, কারণ—চরক সংহিতার সর্বত্র আত্রেয়, পুনর্বসু এবং অগ্নিবেশের উল্লেখ ছড়িয়ে আছে।

আত্রেয় প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মহাভারতে কৃষ্ণ-আত্রেয় নামের উল্লেখ আছে। যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন

এবং তাঁর বিদ্যার নাম ছিল কায়াচিকিৎসা। ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, পুনর্বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসকদের আলোচনাগুলি চরক সংহিতায় সংকলিত আছে। চরক সংহিতা সেইজন্য কোন একটি বিশেষ সময়ে রচিত হয়নি। মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে মহামতি চরক পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে চরক সংহিতা।

প্রাচীন ভারতের নানা জায়গায় এবং নানা সময়ে আত্রেয় নামের উল্লেখ আছে। এই সব নামগুলিই একজনের কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মহাভারতে উক্ত কৃষ্ণ-আত্রেয় অত্রির পুত্র এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী এ বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ নেই। ভরদ্বাজ আহূত চিকিৎসক সম্মেলনে সম্ভবতঃ কৃষ্ণ-আত্রেয় উপস্থিত ছিলেন এবং চিকিৎসা বিষয়ক নানা তর্ক হয়। আত্রেয় এবং ভরদ্বাজ দুজনেই দিকপাল চিকিৎসক এবং দুজনের আলোচনার বিষয় অগ্নিবেশ লিপিবদ্ধ করে নেন, পরবর্তীকালে চরক সংহিতায় তা সংকলিত হয়। ভরদ্বাজ এবং আত্রেয় এত বিখ্যাত ছিলেন যে অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত ভরদ্বাজ এবং আত্রেয় একই ব্যক্তি। অনেকের অভিমত আত্রেয় এবং পনুর্বসু একই ব্যক্তি। তাঁর নিজস্ব নাম ছিল পনুর্বসু এবং অত্রির পুত্র ছিলেন বলে তার নাম আত্রেয়। আত্রেয় এবং পনুর্বসু হিন্দু যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়েছেন। চরকের নিজস্ব অভিমত আত্রেয় পুনর্বসু এবং আত্রেয়, পনুর্বসু একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম।

বৌদ্ধ যুগেও আমরা আত্রেয় নামের উল্লেখ দেখতে পাই, যিনি গৌতম বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জীবকের গুরু ছিলেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বৌদ্ধযুগের আত্রেয় এবং বৈদিকযুগের আত্রেয় ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধ যুগের আত্রেয় যাঁকে ভিক্ষু-আত্রেয় বলা হয়, তিনি তক্ষশীলায় জ্ঞানলাভ করেছিলেন এবং তিনি সার্জারীতে বিশেষ করে ব্রেন সার্জারীতে পারদর্শী ছিলেন। জীবকও ব্রেন সার্জারীতে বিখ্যাত ছিলেন। বৈদিক যুগের আত্রেয় মেডিসিনে প্রখ্যাত ছিলেন, চরক সংহিতায় কোথাও তক্ষশীলার নাম উল্লেখ নেই, ব্রেন সার্জারীর কথাও বলা নেই। সেই থেকে প্রতীয়মান হয়, বৌদ্ধ আত্রেয় এবং আত্রেয় দুজন পৃথক ব্যক্তি।

চরক নিজেও মহাভারতের কৃষ্ণ-আত্রেয়র নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি অগ্নিবেশ ছাড়াও চক্রপানি এবং ভেল নামের উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন এঁরা উভয়েরই আত্রেয় পনুর্বসুর শিষ্য ছিলেন। অগ্নিবেশ কাশ্যপ

সংহিতা এবং অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ সংকলিত করেন, ভেল, ভেল সংহিতা করেছিলেন।

চরক সংহিতার সঠিক সময় নির্ধারণ করা আয়াসসাপেক্ষ। পাণিনির ব্যাকরণে চরকের নাম উল্লেখ আছে, এ থেকে ভাবা যেতে পারে চরক পাণিনির পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পাণিনির সময়কাল যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ছ-শ বছরের আগে, তাইতে ধারণা হতে পারে চরক খ্রীষ্টপূর্ব ছ-শ বছরের আগে বর্তমান ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব সাত 'শ বছর সময়ে ভরদ্বাজ আহূত চিকিৎসক সম্মেলন হিমালয়ের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আত্রেয় উপস্থিত ছিলেন। অগ্নিবেশও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অগ্নিবেশ এই সম্মেলনের আলোচনা অগ্নিবেশ সংহিতায় সংকলিত করেন। অগ্নিবেশ সংহিতাকে আরও সুন্দর ভাবে সংকলিত করেন চরক, অতএব এই ধারণা করা অন্যায় হবে না যে চরক সংহিতার সময়কাল সাতশ খৃষ্টপূর্ব থেকে ছ-শ খৃষ্টপূর্বের মধ্যে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে পাণিনি গ্রন্থে যে চরকের নাম আছে সে চরক অগ্নিবেশ সংহিতার রচয়িতা নন। পাণিনি গ্রন্থে যে চরকের নাম আছে, তিনি যজুর্বেদের কিছু মন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। যজুর্বেদ, আয়ুর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব অগ্নিবেশ এবং আত্রেয় থেকে এই চরক অনেক আগের লোক, সেই জন্য পাণিনি গ্রন্থে যে চরকের উল্লেখ আছে, তিনি কখনও চরক সংহিতার রচয়িতা হতে পারেন না। ঐতিহাসিক এবং চীন পরিব্রাজকদের মতানুযায়ী চরক ছিলেন কণিষ্কের রাজচিকিৎসক। কণিষ্কের সময়কাল প্রথম শতাব্দী, অতএব এই চরক যদি চরক সংহিতার রচয়িতা হয়ে থাকেন, তাহলে চরক সংহিতার সময়কাল যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর একশত বৎসরের ভিতর।

যাজ্ঞবল্ক্যকৃত শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় অগ্নিবেশ বৌদ্ধযুগের পূর্বের মানুষ। যাজ্ঞবল্ক্য বুদ্ধদেবের সমসাময়িক এবং তাঁর গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মাণ আত্রেয় অগ্নিবেশের শিক্ষাধারারই আলোকপাত করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর গ্রন্থে আত্রেয় অগ্নিবেশের উল্লেখ করেছেন নানা স্থানে, কিন্তু কোথাও তক্ষশীলা বা ভিক্ষু আত্রেয়র নাম উল্লেখ করেন নি। তক্ষশীলা বৌদ্ধযুগে পৃথিবী বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সম্মানিত এবং ভিক্ষু-আত্রেয় তক্ষশীলার সবচেয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। ভিক্ষু-আত্রেয় যদি চরক-সংহিতার রচয়িতা হতেন, তাহলে কোন না কোন গ্রন্থকারদের লেখনীতে তক্ষশীলা এবং ভিক্ষু আত্রেয়র নাম উল্লেখ থাকত।

শতপথ ব্রাহ্মণে এবং চরক সংহিতায় বলা আছে, মনুষ্যদেহে সর্বসাকুল্যে

তিনশ ষাটটি হাড় আছে। সুশ্রুত সংহিতায় এই উক্তিকে পরিবর্তন করে বলা হয়েছে তিনশ হাড় আছে। একটি মৃত শিশুর হাড় পরীক্ষা করে এবং গণনা করে সুশ্রুত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কোন কোন জায়গায় চরকের অভিমত গ্রহণ করেছেন, কোন কোন স্থানে সুশ্রুতকে অনুসরণ করেছেন। চরক উল্লেখ করেছেন মানুষের বক্ষপিঞ্জরে চৌদ্দটি হাড় আছে, সুশ্রুত বলেছেন সতেরোটি আছে। যাজ্ঞবল্ক্য সুশ্রুতের মতকেই গ্রহণ করেছেন, এই থেকে এ ধারণা করা অন্যায় হবে না যখন যাজ্ঞবাল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণ রচনা করেন তখন চরক এবং সুশ্রুত উভয়ের মতবাদই দেশে প্রচলিত ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনকের সভাচিকিৎসক ছিলেন। জনকরাজ অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। অজাতশত্রু ৫৫৪ খৃষ্টপূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য আনুমানিক ৫৫৭ খৃষ্টপূর্বে বর্তমান ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের গ্রন্থে আত্রেয় অগ্নিবেশ চরক সুশ্রুতের উল্লেখ আছে, অতএব ধারণা করা যেতে পারে উল্লিখিত মনীষীগণ ছ-শ থেকে সাতশ খৃষ্টপূর্ব সময়ে বর্তমান ছিলেন। মোটকথা আত্রেয় অথর্ববেদের অন্তিমকাল থেকে শতপথ ব্রাহ্মণ সময়ের পূর্বে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন বলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত।

চরক সংহিতায় আমরা প্রথম চিকিৎসাবিষয়ক আলোচনা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে দেখতে পাই। চরক সংহিতাতেই প্রথম আমরা বিভিন্ন মতের তর্ক দেখতে পাই। উন্নততর জ্ঞানলাভের জন্য নিত্য তর্কের প্রয়োজন একথা চরক সংহিতায় সর্বত্র উচ্চারিত। গৌতমের ন্যায় বাৎসায়ণের তর্ক-শাস্ত্রে নীতিগতভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে তর্কশাস্ত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ন্যায়গত তর্ক চরক সংহিতার পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে কি না সন্দেহ।

চরক সংহিতার আলোচনায় এমন সুন্দরভাবে চিকিৎসকদের বিষয়ে বলা আছে, যে আজকের যুগেও তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। চরক সংহিতায় বহুবিধ মেডিকেল সিম্পোসিয়ামের কথা লেখা আছে, যার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু সিম্পোসিয়াম নয়, সেই সিম্পোসিয়ামে কোন কোন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মতামতও সংহিতায় লিপিবদ্ধ আছে। চরক সংহিতায় যেভাবে চিকিৎসার ধারা এবং চিকিৎসকদের কর্তব্য লিপিবদ্ধ আছে তা অতীব বিজ্ঞানসম্মত।

চরক সংহিতায় বলা আছে, চিকিৎসক সম্মেলনে কতকগুলি নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়। চিকিৎসকরা চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইরে কোন কথা আলোচনা

করতে পারবেন না, করলেও সে আলোচনা সম্মেলনে স্থান পাবে না। চিকিৎসা-বিষয়ক আলোচনা করতে হলে প্রত্যেকটি আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া প্রয়োজন। কোন চিকিৎসকের অভিমত কোন গ্রন্থে লেখা আছে অথবা নিজের গবেষণার অভিমত সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বলতে হবে। হাতে কোন রেফারেন্স না থাকলে সম্মেলনে আলোচনা করার অধিকার থাকবে না। এই সিদ্ধান্ত যে কত বিজ্ঞানসম্মত আজকের যুগের চিকিৎসকমণ্ডলী তা স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।

সম্মেলনে দু' ধরনের তর্কযুদ্ধ হবার কথা বলা হয়েছে। মিত্রতর্ক এবং শত্রুতর্ক। মিত্রতর্ক অর্থে কেউ চিকিৎসা বিষয়ে আরও গভীর জ্ঞানলাভের জন্য তর্কযুদ্ধ আহ্বান করেছেন। শত্রুতর্ক অর্থে কেউ কোন মতকে খণ্ডন করার জন্য তর্কযুদ্ধ ডেকেছেন। উভয় যুদ্ধেই দেশের জ্ঞানীগুণীকে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে হত, কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি। মিত্রতর্ককে চরক সংহিতায় নামকরণ করা হয়েছে জল্প এবং শত্রুতর্ককে বলা হয়েছে বিতান্ত। জল্পতর্কে উভয়পক্ষের ভালমন্দ আলোচিত হয়, বিতান্ততর্কে অন্য পক্ষের ভুলগুলিকে শুধু বলা হয় এবং তাকে খণ্ডন করার জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করা হয়।

চরক সংহিতার মধ্য থেকেই চিকিৎসার ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মতরূপ গ্রহণ করে। চিকিৎসকদের মানবদেহ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন একথা চরক সংহিতায় বার বার উল্লেখ করা আছে। মানুষের রোগ নিয়ে চিকিৎসা করতে হলে আগে রোগ সম্বন্ধে এবং মানবদেহ সম্পর্কে ওতপ্রোতভাবে জানতে হবে। রোগের কারণ রোগের উপসর্গ বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকলে চিকিৎসার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয় একথা চরক সংহিতায় বার বার উচ্চারিত। শুধু জ্ঞানলাভ করলেই হবে না, সেই জ্ঞানের বিষয় বিশেষজ্ঞের কাছে পরীক্ষা দিতে হত। নবীন পরীক্ষার্থী বিশেষজ্ঞের সামনে উপস্থিত হলে বিশেষজ্ঞমণ্ডলী তাঁকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করতেন—তুমি নবতন্ত্রম পরীক্ষার্থী ?

নবতন্ত্র অর্থে চিকিৎসাশাস্ত্রের নয়টি বিভাগই পরীক্ষার্থী আয়ত্ত করেছে আগে, বিশেষজ্ঞমণ্ডলী জেনে নিতেন। পরীক্ষার্থী যদি নয়টি বিভাগই শিক্ষালাভ করে থাকে তাহলে তাকে নয়টি বিভাগের পরীক্ষা দিতে হত। যদি কোন একটি বিভাগের শিক্ষালাভ করে থাকে, তাহলে তাকে বলতে হত—আমি একতন্ত্রম পরীক্ষার্থী।

পরীক্ষার্থী যে বিভাগের শিক্ষা আয়ত্ত করেছেন, সেই বিভাগের পরীক্ষা দিয়ে

যদি বিশেষজ্ঞদের সন্তুষ্ট করতে পারতেন, তবেই তিনি চিকিৎসার অধিকারী হতেন।

চিকিৎসার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই চরক সংহিতার যুগ থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত রূপ নেয় এবং চিকিৎসার মধ্যে স্পেশালাইজেশন প্রথার সৃষ্টি হয়।

॥ পাঁচ ॥

চরক সংহিতার মত সুশ্রুত সংহিতা প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শুধু প্রাচীন ভারতে নয়, পরবর্তীকালের চিকিৎসাশাস্ত্র গড়ে ওঠে প্রধানতঃ চরক এবং সুশ্রুত সংহিতাকে অবলম্বন করে। চরক সংহিতার মধ্যে আমরা যেমন বিভিন্ন রোগের বিবরণ পাই, তার উপসর্গ ও চিকিৎসার ধারার আলোচনা দেখতে পাই, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন মত লক্ষ্য করি, ঠিক তেমনি শল্যচিকিৎসা অথবা সার্জারির বিশদ ব্যাখ্যা আমরা সুশ্রুত সংহিতায় দেখতে পাই। চরক এবং সুশ্রুত সংহিতায় যে ধরণের আলোচনা আছে, তা এত উন্নত ধরনের, বর্তমানকালের চিকিৎসাবিশারদরা সেইসব আলোচনাকে খণ্ডন করতে পারেন না।

সুশ্রুত সংহিতায় সার্জারির বিষয় যে ধরণের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়, গ্রীকদেশেও অনুরূপ অপারেশনের কথা বলা আছে, এ থেকে দু' রকমের অভিমত সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন গ্রীস দেশ থেকে ভারতে সার্জারির সৃষ্টি আবার কারুর অভিমত ভারতবর্ষ থেকে গ্রীস দেশে শল্যবিদ্যার পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছে।

সুশ্রুত ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশজাত। ধন্বন্তরি ঋষি প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক। গুরুদা পুরাণ দিবদাসকে ধন্বন্তরির বংশজাত বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এই পুরাণের মতে দিবদাস ধন্বন্তরি বংশের চতুর্থ বংশ। কিন্তু সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে ধন্বন্তরি এবং দিবদাস একই ব্যক্তি। এই প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসকের নিজস্ব নাম ছিল দিবদাস এবং বংশ পরম্পরায় ধন্বন্তরি পদবী ব্যবহার করতেন। সেই মতানুসারে দিবদাস ও ধন্বন্তরি পৃথক ব্যক্তি নন, একই ব্যক্তি যাঁর পুরো নাম দিবদাস ধন্বন্তরি।

যে সংহিতা সুশ্রুত সংহিতা নামে খ্যাত, তার সংকলন করেন প্রথম

২

নাগার্জুন। প্রাচীন সংহিতাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সম্পাদিত করেন দিবদাস ধন্বন্তরি, যাঁকে ভারতীয় মতে পৃথিবীর শল্যচিকিৎসার জনক বলা হয়। প্রাচীন সংহিতায় বিজ্ঞানের সঙ্গে অনেক কাল্পনিক, অনেক পৌরাণিক গল্প মেশানো ছিল, দিবদাস ধন্বন্তরি পৌরাণিক ও অযৌক্তিক কাহিনীগুলিকে বাদ দিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পর্যবসিত করেন। সুশ্রুত ধন্বন্তরির সংহিতার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে আর একটি সংহিতা তৈরি করেন, যাকে পরবর্তীকালে আখ্যা দেওয়া হয় বৃদ্ধ সংহিতা। প্রথম নাগার্জুন, ধন্বন্তরি সংহিতা এবং বৃদ্ধ সংহিতাকে এক করে তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার সংযোজন করে একটি সংহিতার সৃষ্টি করেন, যে সংহিতা পরবর্তীকালে বিশ্বসমাজে সুশ্রুত সংহিতা নামে খ্যাত হয়ে ওঠে।

প্রথম নাগার্জুন আনুমানিক চারশ খৃষ্টপূর্ব কালের মানুষ, এই নাগার্জুন যদি সুশ্রুত সংহিতাকে সম্পাদিত ও সংকলিত করে থাকেন তাহলে আদি সুশ্রুত সংহিতা আনুমানিক ছশ খৃষ্টপূর্ব কালে সংকলিত হয়েছিল। ধন্বন্তরিকে আমরা দেখতে পাই, আত্রেয় পুনর্বসুর চিকিৎসক সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে অগ্নিবেশ আত্রেয় পুনর্বসুকে প্রশ্ন করলেন, হে পণ্ডিত আত্রেয়! আমরা জানতে চাই: মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কিভাবে পুষ্ট হয়? ভ্রূণের কোন অংশ সর্বাগ্রে সৃষ্টি হয়? কিভাবে ভ্রূণ তার দেহের পুষ্টি গ্রহণ করে? নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার সময় শরীরের কোন্ অংশ সর্বাগ্রে ভূমিষ্ঠ হয়? কি প্রথায়, কোন পদ্ধতিতে কোন পথে নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়? শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর কি কি কারণে শিশুমৃত্যু ঘটে? কি ধরনের খাদ্য এবং কোন্ পদ্ধতিতে লালন পালন করলে শিশুমৃত্যু পরিহার করা যায়? মানুষের বয়সের উর্ধসীমা কতদূর? দীর্ঘজীবী হবার পদ্ধতি কি উপায়ে আয়ত্ত করা যায়?

অগ্নিবেশের প্রশ্ন শুনে আত্রেয় পুনর্বসু অন্যান্য চিকিৎসাবিশারদদের মতামত আহ্বান করেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন, যথা—ঋষি ভরদ্বাজের অভিমত যেহেতু মানুষের সমস্ত অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্ক সেইজন্য ভ্রূণের মস্তিষ্ক সর্বাগ্রে সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত চিকিৎসক ভাল্কি বলেন—ভ্রূণের হৃদপিণ্ড সর্বাগ্রে সৃষ্ট হয়, কারণ হৃদপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত দেহে রক্ত চলাচল ঘটে। ভদ্রকাপার অভিমত—নাভিকুণ্ডলীর সৃষ্টি সর্বাগ্রে কারণ নাভিমণ্ডলী থেকে ভ্রূণের পুষ্টি সৃষ্টি হয়। ভদ্রশৌণক জানান অন্ত্র সর্বাগ্রে সৃষ্টি হয়। কারণ অন্ত্র শরীরের গতি পরিচালিত করে। বড়িশ মুনির অভিমত অনুভূতি গ্রন্থিগুলি সর্বাগ্রে সৃষ্টি। নানা মুনির নানা মতের শেষে ধন্বন্তরি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আমার মতে ভ্রূণের সমস্ত অংশ একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। শরীরের প্রত্যেকটি

অঙ্গ প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেকটি অঙ্গের কার্য প্রত্যেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নবজাতকের ভূমিষ্ঠকালে সমস্ত অঙ্গই পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। যদি একই সঙ্গে সৃষ্টি না হয়, তাহলে সীমিত সময়ের মধ্যে সমস্ত অঙ্গ পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে পারে না।

ধন্বন্তরির এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে আজও বিশেষজ্ঞগণ খণ্ডন করতে পারেননি।

চরক সংহিতায় আমরা ধন্বন্তরির নাম দেখতে পাই। আর চরকের সময়কাল ছ'শ থেকে সাত'শ খৃষ্টপূর্বের মধ্যে। সেই কারণে সুশ্রুত সংহিতার আদি সংস্করণ ছ'শ খৃষ্টপূর্বকালে হয়েছিল একথা অনুমান করা অন্যায় হবে বলে মনে হয় না।

প্রথম নাগার্জুনের সঙ্গে দ্বিতীয় নাগার্জুনের গোলমাল হবার কোন হেতু নেই, কারণ দ্বিতীয় নাগার্জুন একজন রসায়ণবিদ (কেমিষ্ট) ছিলেন এবং তার সময়কাল অষ্টম শতাব্দী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিন্দু কেমিষ্ট্রি গ্রন্থে দ্বিতীয় নাগার্জুনকে দশম শতাব্দীর মানুষ বলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে বলেছেন, নাগার্জুন অষ্টম শতাব্দীর মানুষ।

প্রথম নাগার্জুন সম্পাদিত সুশ্রুত সংহিতায় সুভাতি গৌতম-এর নাম উল্লেখ আছে। সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে সুভাতি গৌতম-এর জ্ঞানানুসারে ভ্রূণের দেহ (ট্রাঙ্ক) সর্বাগ্রে সৃষ্টি হয়, কিন্তু এ ধরনের উক্তি আমরা চরক সংহিতায় এর আগেই পেয়েছি।

আত্রেয় মুনির সভাপতিত্বে যে সিম্পোসিয়াম হয়েছিল তাতে শৌণক মুনি একই উক্তি করেছিলেন। শৌণক সংহিতাতেও একই ধরনের ভ্রূণতত্ত্ব আলোচিত আছে, তাইতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা সুশ্রুত সংহিতার কিয়দংশ শৌণক এবং অন্যান্য বৌদ্ধপূর্ব পণ্ডিত কর্তৃক সংযোজিত। পরবর্তীকালে নাগার্জুন যখন সম্পাদনা করেন তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতের নাম সংযোজিত করে নবকলেবরে সুশ্রুত সংহিতার সৃষ্টি করেন।

পণ্ডিতদের ধারণা, সুশ্রুত সংহিতার শেষাংশ প্রথম নাগার্জুন কর্তৃক লিখিত, যে অংশকে 'উত্তরতন্ত্রম্' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনেকের অভিমত উত্তরতন্ত্রম্ অংশও সুশ্রুত সংহিতার মতই পূর্ব থেকেই বলা ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে ছিল না, নাগার্জুন কেবল সংহিতার সমস্ত অংশ সুচারু ও সুন্দরভাবে সংকলিত, সংযোজিত ও সম্পাদিত করেছিলেন। দিবদাস ধন্বন্তরি 'শরীরস্থান' অধ্যায়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। শল্য (ENT), শালাক্য (Surgery), কায়াচিকিৎসা (General medicine), কিন্তু বাকী বিভাগগুলির

উল্লেখ নেই। আয়ুর্বেদে কিন্তু আটটি বিভাগের উল্লেখ আছে, এ থেকে ধারণা হতে পারে ধন্বতরি দিবদাস এবং সুশ্রুত আয়ুর্বেদকে আরও স্পেশালাইজড্ সাবজেক্ট করে নিয়েছিলেন। সুশ্রুত সংহিতা মুখ্যতঃ সার্জারির গ্রন্থ। প্রাথমিক শল্য-চিকিৎসা অথবা সার্জারির জন্য যে কটি বিভাগের প্রয়োজন, সেই কটিরই উল্লেখ আছে সুশ্রুত সংহিতায়। প্রাথমিক শিক্ষার পর, বিশদ শিক্ষালাভ করার সময়, যাকে আধুনিককালে পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশন বলে থাকি, উত্তরতন্ত্রম্ পাঠের প্রয়োজন। কারণ এই অধ্যায়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই মতকে যদি স্বীকার করে নিই, তাহলে স্বীকার করতে হবে সুশ্রুত সংহিতার উত্তরতন্ত্রম্ নাগার্জুনের পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। অনেকের অভিমত সুশ্রুত অপেক্ষাকৃত সহজ অপারেশন এবং সার্জারির বিষয় তাঁর সংহিতায় আলোচনা করে গেছেন। পরবর্তীকালে প্রথম নাগার্জুন উত্তরতন্ত্রম্ গ্রন্থে বিশদভাবে সার্জারির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। উত্তরতন্ত্রম্ পরবর্তীকালের গ্রন্থ তার প্রমাণস্বরূপ বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন সংহিতার পাঁচটি বিভাগের মধ্যে উত্তরতন্ত্রম্ কোন স্থান পায় নি। যদি সংহিতার কালে উত্তরতন্ত্রম্ সৃষ্টি হত, তাহলে পাঁচ সংহিতার মধ্যে স্থান হত। এঁদের মতে, উত্তরতন্ত্রম্ সুশ্রুত সংহিতার পরিশিষ্ট অথবা সাপ্লিমেণ্ট।

প্রথম নাগার্জুনকে নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব নামেও ডাকা হয়। বেল সাহেবের Buddhistic Records of the Western World, Vol. II গ্রন্থে বলা হয়েছে নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব ওষুধ তৈরির জাদুকর ছিলেন। কথিত আছে তিনি বিভিন্ন রকমের পাথর নরম করে কোন এক আশ্চর্যজনক তরল পদার্থ মিশিয়ে প্রস্তরখণ্ডকে স্বর্ণধাতুতে রূপান্তরিত করতে পারতেন।

সুশ্রুত সংহিতার সময়কাল থেকে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বহির্ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়, আর সে ইতিহাস জানতে হলে আমাদের যেতে হবে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার আঙ্গিনায়।

॥ ছয় ॥

মূল কাহিনীতে যাবার আগে কিছু আগের কথা বলা দরকার, তা নাহলে সমস্ত ঘটনাগুলিই পরম্পরাহীন হয়ে যাবে। প্রাচীন যুগের পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল অন্বেষণ করলে দেখা যায় ভারতবর্ষ, চীন ও মিশরে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছিল অসম্ভব রকমের। এ ছাড়া আমেরিকার ইঙ্কা সভ্যতা ও মায়া সভ্যতার উদয় হয়েছিল। অনেক পণ্ডিতদের অভিমত, গ্রহান্তর থেকে উন্নত ধরনের মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণ করে ইঙ্কা সভ্যতা এবং মায়া সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্যকে যথার্থ করে তোলার তাঁরা জন্যে নানারকম তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত সংবাদ পরিবেশন করেছেন। অনেকে সেসব কথা বিশ্বাস করেছেন, অনেকে করেননি।

আমার নিজস্ব বিশ্বাস, বর্তমান যুগে পৃথিবীর মানুষ যাকে তৃতীয় বিশ্ব বলে আখ্যা দেয়, প্রাচীন যুগে পৃথিবীর সেই অংশই ছিল প্রথম বিশ্ব। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে এশিয়া এবং চীন ছিল সবচেয়ে উন্নত, বিশেষ করে চীন, ভারতবর্ষ ও মিশর। আমেরিকা তখনও আবিষ্কৃত হয়নি এবং তথাকথিত কোন সভ্যতাও গড়ে ওঠেনি। ইউরোপেও কোন সভ্যতার বিকাশ হয়নি, রাশিয়া তো গড়ে উঠল সেদিন।

প্রাচীন যুগে চীন ও ভারত থেকে পশ্চিম জগতে ব্যবসায় বাণিজ্য হত জলপথে। ভারতের মানুষেরা কন্যাকুমারিকা অঞ্চল থেকে জলপথে পশ্চিম জগতে ব্যবসায় করতে যেতেন। এই সব মানুষের দলে ছিলেন ব্যবসায়ী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক। এঁরা জলপথে আফ্রিকা পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার তীরে উপস্থিত হন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে ব্যবসা করেন এবং সভ্যতাও গড়ে তোলেন। সেই সভ্যতার একটি অংশ মায়া সভ্যতা। মায়া সভ্যতা থেকে বর্তমানের দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ভাষার মধ্যে পূর্বাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে। যাঁরা প্রাচীন ব্রাজিল ভাষার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন, ব্রাজিলে চা-কে টি বলে না, বলে চা। আমাদের দেশেও চা বলা হয়। জামাকে শার্ট বলে না, কুর্তা বলে, পূর্বাঞ্চল দেশের লোকের ভাষাতেও কুর্তা ও কামিজ বলা হয়। এই ধরনের ভাষার সমন্বয় দেখে মনে হয়, ভারত বা চীন থেকে অথবা ভারত-চীন একযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতি বিস্তার করতেন।

ভারতের সঙ্গেও চীনের ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পে আদান প্রদান ছিল। দক্ষিণ ভারতের শিল্প চাতুর্য লক্ষ করলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। কন্যাকুমারিকার মন্দিরদ্বারে যে শিল্প অঙ্কিত, তা দেখলে মনে হয়, কোন ড্রাগন জাতীয় পশু হাতীর শুঁড় আকর্ষণ করে রেখেছে। এই ধরণের শিল্পকর্ম থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রাচীনকালে চীনের সঙ্গে ভারতের বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সংযোগ ছিল।

কোন্ দেশে সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল এ তথ্য সঠিকভাবে দেওয়া বর্তমানকালের পণ্ডিতদের পক্ষে আয়াস সাপেক্ষ। এই সভ্যতার ভারতেও বিকাশ ঘটতে পারে, চীন বা মিশরেও ঘটতে পারে, তবে তিন দেশের সভ্যতাই অতি প্রাচীন।

আমরা ভারতীয়, তাই ভারতের বিজ্ঞান উন্নতির কথা সবচেয়ে আগে বললে বোধহয় অপরাধ হবে না। আগে নিজের দেশের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের কথা কিছুটা জেনে নিই, তারপর শিখব অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের ইতিহাস।

॥ সাত ॥

আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার কথা চিন্তা করলেই প্রথম যে নামটি আমাদের মনে উদিত হয়, তা হল ধন্বন্তরি।

অনেকের ধারণা ধন্বন্তরি নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, নামটি পুরাণকারদের কাল্পনিক নাম। এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে। অনেক অনুসন্ধানের পর পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—পুরাণের যুগ যখন শেষ হয়েছে, ইতিহাসের যুগ যখন আরম্ভ হয়েছে, সেই সন্ধিক্ষণে খ্যাতনামা চিকিৎসক ধন্বন্তরির আবির্ভাব ঘটেছিল। ইনি কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন এবং তক্ষশীলায় এঁর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর সময়কাল আনুমানিক ছ' শো খৃষ্টপূর্ব। তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সময়কালে এক চিকিৎসক সম্মেলন ডাকা হয়, স্বয়ং ধন্বন্তরি সেই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন চিকিৎসকদের মনে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে। শিশু যখন ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের জরায়ুতে

অবস্থান করে, তখন তার শরীরের কোন্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্বাগ্রে বৃদ্ধি পায় ? হাত-পা, শরীর-পাকস্থলী না মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলী ?

এই প্রশ্নের উত্তরে ধন্বন্তরি বলেন, ভ্রূণের জন্মক্ষণের পর থেকেই শরীরের প্রত্যেকটি অংশ একই সঙ্গে, একই ভাবে যথাযথ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইজন্যে দশমাস দশদিন পরে নির্দিষ্ট সময়ে যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার শরীরের প্রত্যেকটি অংশই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

মহর্ষি চিকিৎসক ধন্বন্তরির সেই মন্তব্য এত অভ্রান্ত যে আজও বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পৌঁছেও বিশেষজ্ঞগণ এই মন্তব্যের চেয়ে নতুন ধরণের কোন মন্তব্য আবিষ্কার করতে পারেননি।

বেদের যুগকে অনেক পণ্ডিত পুরাণের যুগ বলে থাকেন, অনেকে বৈদিক যুগ বলে আলাদা একটি যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়ে রচিত হয়েছিল আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। বিচার করলে দেখা যায়, আয়ুর্বেদ একটি বৈজ্ঞানিক পুঁথি। এই গ্রন্থে লেখা আছে মানুষের কত রকমের রোগ আছে, আর সেইসব রোগে কী ধরণের চিকিৎসা প্রয়োজন, কোন্ কোন্ ওষুধ কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকটি ওষুধের ফরমূলা লেখা আছে, কতদিন খেতে হবে তাও লেখা আছে। স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা সম্পর্কে লেখা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আয়ুর্বেদ বোধ হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ।

ধন্বন্তরির সময়ে অথবা তার কিছু পূর্বে আবির্ভাব ঘটেছিল ঋষি ভরদ্বাজের। ঋষি ভরদ্বাজ বোধহয় প্রথম চিকিৎসক যিনি আয়ুর্বেদ মতানুসারে চিকিৎসা করেন। তাঁর পূর্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম চিকিৎসক হিসেবে চিহ্নিত, তবে তাঁদের নাম পুরাণের যুগে ধরে নিলেই বোধহয় বৈজ্ঞানিক সত্যের অপলাপ হবে না।

বৈদিক যুগের পর সংহিতার যুগ। যদিও সুশ্রুত ও চরকের ন্যায় মহাস্তম্ভ সৃষ্টি হয়েছিল চিকিৎসা ক্ষেত্রে, তবুও চরক সুশ্রুত-র পূর্বে আত্রেয়-পুনর্বসুর নাম না করলে ইতিহাসের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে। অনেকে বলেন, আত্রেয় এবং পুনর্বসু দুজন আলাদা লোক ছিলেন, অনেকে বলেন পুনর্বসু অত্রির সন্তান ছিলেন, সেইজন্যে তাঁর নামের আগে আত্রেয় কথাটা লিখতেন, যার অর্থ অত্রির সন্তান। আত্রেয় পুনর্বসু আনুমানিক সাত হাজার খৃষ্টপূর্বের মানুষ এবং তিনি সারাজীবন ধরে, পুনর্বসু সংহিতা রচনা করেন। সুশ্রুত সংহিতায় তিনি পুনর্বসুর নাম উল্লেখ করেছেন, তাই থেকে ধরে নেওয়া যায় পুনর্বসু সুশ্রুতর পূর্বে

বর্তমান ছিলেন।

সুশ্রুত সংহিতা একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অধিকাংশই শল্য চিকিৎসার বিষয় লিখিত। সুশ্রুত তাঁর গ্রন্থে শতাধিক অস্ত্রোপচারের যন্ত্র বর্ণনা দিয়েছেন এবং এইসব যন্ত্র ইস্পাতের তৈরি বলে লেখা আছে। এই যন্ত্রগুলি অত্যন্ত ধারালো, ঝকঝকে তকতকে এবং একটুও কোথাও মরচে পড়তে দেওয়া হত না। অপারেশন করার আগে যন্ত্র দিয়ে আগে একটা চুল কেটে দেখা হত কতখানি ধারালো আছে। অপারেশন করার পর যন্ত্রগুলিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, একটি ফানেলের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে যন্ত্রগুলি রেখে একটি কাঠের বাক্সে ভরে রাখা হত। সুশ্রুত-র বইতে আধুনিককালের যত অপারেশন হয়, তার অধিকাংশই বিবৃত আছে। রাইনোপ্লাস্টিকের মত অতি আধুনিক অপারেশনের কথা সুশ্রুত তাঁর বইতে লিখে গেছেন এবং তিনি নিজে এই সব অপারেশন করতেন। সুশ্রুত বলেছেন, আমাদের বুকে সতেরোটি (১৭) হাড় আছে, চরক বলেছেন চোদ্দটি হাড় (১৪) আছে। এই হাড় বলতে যদি আমরা পাঁজরা বুঝি, তাহলে অল্পবিস্তর দুজনের কথাই ঠিক না হলেও সত্যের কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানকালে আমরা দেখেছি, গলায় (Cervical) ছটি পাঁজরা আছে এবং বুকে বারোটি পাজরা আছে, সব মিলিয়ে তাহলে আঠারোটি পাঁজরার (১৮) হিসেব আমরা পাচ্ছি। সুশ্রুত বলেছেন সতেরোটি হাড় আছে। সম্ভবতঃ প্রথম সারভাইক্যাল রিবকে (পাঁজরা) তিনি মাথার খুলির হাড় বলে ভেবেছিলেন, সেইজন্যে সব মিলিয়ে সতেরোটি হাড় আছে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। চরক বুকের চোদ্দটি হাড়ের কথা বলেছেন। সম্ভবতঃ তিনি বুকের বারোটি পাঁজরা এবং গলার নীচের দুটি পাজরা মিলিয়ে মোট চোদ্দটি হাড় আছে বলে ধারণা করেছেন।

চরক ও সুশ্রুত সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। শুধু সে যুগেই বিখ্যাত ছিলেন না, বর্তমানকালেও বিখ্যাত রয়েছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় স্বীকার করা হয়েছে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র মিশরীয় এবং গ্রীস-এর চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। তাঁদের অভিমত, আলেকজাণ্ডার যখন ভারত জয় করে গ্রীসে ফিরে যান, তখন ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রীসে নিয়ে যান, তারপর গ্রীস থেকে মিশরে চিকিৎসা পদ্ধতি স্থানান্তরিত হয়।

সুশ্রুত সংহিতায় এত বৈজ্ঞানিকভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা বর্ণিত আছে, যে পড়লে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আজকের যুগে অত্যন্ত আধুনিকভাবে

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয় আলোচিত হয়, সে যুগেও ঠিক তেমনি হত।

চরক সংহিতার একাংশ তুলে ধরলে বোঝা যাবে, সে যুগেও কী আশ্চর্য ধরণের সম্মেলন হত।

চরক সংহিতার এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে :

সিম্পোসিয়াম এক :

বিষয়—বাত সম্পর্কে আলোচনা—

যাঁরা আলোচনা করবেন : ১। কুশ, সংকৃত্যের সন্তান ২। কুমারশিরা ভরদ্বাজ ৩। কঙ্কন্যা বাহিলকা থেকে ৪। বদিস ধামারগাভ ৫। বরিওভিদা ৬। মারিসি ৭। কাপ্য ৮। আত্রেয় পুনর্বসু।

সিম্পোসিয়াম দুই :

বিষয়—মানুষের উৎস সন্ধান এবং রোগের কারণ নির্ণয়—

সিম্পোসিয়াম তিন :

বিষয়—মানুষ কী ভাবে স্বাদ গ্রহণ করে এবং কত রকমের স্বাদ আছে—

এই ধরণের অনেক মিটিং প্রাচীন ভারতে অনুষ্ঠিত হত। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সে যুগে বিজ্ঞান কত উন্নত ধরনের ছিল।

চরক ও সুশ্রুত-র পর খ্যাতিমান চিকিৎসক হলেন জীবক। অনেক ঐতিহাসিকের মতে মহামতি জীবক মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র। অনেকের মতে, তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বিষয় কিছুই জানা যায় না। জীবক তক্ষশীলার আত্রেয় ঋষির কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যয়ন শেষে নিজে শাকেৎ নগরীতে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাকটিস শুরু করেন। এই সময়ে মহারাজা বিম্বিসারের অর্শ রোগ হয়। অর্শ রোগের জন্য তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করেন এবং আত্রেয়কে খবর দেন চিকিৎসার জন্যে।

আত্রেয় জীবককে পাঠিয়ে দেন বিম্বিসারের চিকিৎসার জন্য। জীবক ভেদনম (সার্জারী) চিকিৎসার দ্বারা বিম্বিসারকে নিরাময় করে তোলেন এবং তারপরে তিনি রাজচিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ জীবিত ছিলেন এবং রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। তথাগত বুদ্ধ অকস্মাৎ একদিন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। মহারাজ বিম্বিসার জীবককে নিয়ে যান মহাসঙ্ঘে চিকিৎসার জন্য। জীবকের চিকিৎসায় তথাগত বুদ্ধ পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই সময়ে জীবক বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে নিজে বৌদ্ধ হন এবং সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন।

জীবক চিকিৎসাশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতাকে নতুনভাবে এবং আধুনিকভাবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বর্তমানে আমরা যে চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা পাঠ করি, তা হল জীবক সম্পাদিত চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা। জীবক নিজেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। এই গ্রন্থে জীবক নিজে যে সব রোগের চিকিৎসা করেছেন, সেই সব বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থটির নাম জীবক চরিত।

জীবক কায় চিকিৎসা অর্থাৎ মেডিসিন এবং শল্য চিকিৎসা অর্থাৎ সার্জারির বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। অনেকের মতে তিনি ব্রেন সার্জারিও করতেন।

॥ আট ॥

বহির্ভারতের চিকিৎসাধারার ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম ও চীনদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্বেষণ করতে হয়। ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে বহির্ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের যোগাযোগ সংঘটিত হয় প্রধানতঃ বৌদ্ধ শ্রমণদের মাধ্যমে। তার আগে উল্লিখিত দেশসমূহে নিজস্ব ধারার এবং নিজস্ব মতের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল।

সর্বপ্রথম মিশরীর চিকিৎসকের নাম হিসেবে আমরা ইমোটেফ-এর নাম দেখতে পাই। তাঁর সময়কাল আনুমানিক তিন হাজার দুশ খৃষ্টপূর্ব। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ইমোটেফ্‌ শারীরবিদ্যা এবং নিদানশাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেই সময়ে রোগ নির্ধারণের পদ্ধতি এবং চিকিৎসাধারার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। সে যুগের চিকিৎসক যত পোস্টমর্টেম করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তত বোধহয় আর কোন দেশের চিকিৎসক পান নি। প্রাচীন মিশরের চিকিৎসক সাতশ মিলিয়ন মানুষের ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্ক প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অংশ বাদ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কারণ শরীরের এই সব অংশ বাদ দিয়ে 'মমি' তৈরি করা হত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এত পোস্টমর্টেম করা সত্ত্বেও কোন প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট পাওয়া যায় না। এই থেকেই প্রতীয়মান হয়, প্রাচীনকালে মিশরদেশে চিকিৎসাশাস্ত্র যত উন্নত ছিল,

পরবর্তীকালে ক্রমশঃ তা বিলীন হয়ে যায়। প্রাচীনকালে অধিকাংশ বিজ্ঞানসম্মত এবং অল্পাংশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসার পদ্ধতি ছিল, পরবর্তীকালে অধিকাংশই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে যে সময়ে চরক সংহিতার মত উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসাগ্রন্থ সংকলিত হয়, ঠিক সেই সময়ে মিশরীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশ অস্তমিত হতে শুরু করে। রবিনসন সাহেব সখেদে উক্তি করেছেন, যে সব মানুষ 'মমি' সৃষ্টির মত উন্নত ধরনের বিজ্ঞান জানতেন, তাঁরা ওষুধ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে কোন চিন্তাই করেন নি।

মিশরদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস ছেড়ে আমরা যদি প্রাচীন চীনদেশে যাই, তাহলে দেখতে পাব তিন হাজার খৃস্টপূর্বকালে সম্রাট শেন্ নাঙ্ একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর রচিত পেন্ সাও গ্রন্থে এক হাজার বিষের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের আধুনিক সংস্করণ আজও চীনদেশে পাওয়া যায় এবং এফিড্রিন ওষুধ গ্রন্থের মা হুয়াঙ্ নামক ওষুধ থেকে পৃথকীকরণ করা হয়। দু হাজার ছ'শ পঞ্চাশ খৃষ্টপূর্বে সম্রাট হোয়াঙ্ তাই শরীরের রক্ত চলাচল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা পড়লে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়। তাঁর বক্তব্য, শরীরের সর্বত্র রক্ত চলাচল করে হৃদপিণ্ডের পরিচালনায় এবং রক্ত চলাচল দেহের অভ্যন্তরে সদাসর্বদা বাহিত হয়, কোনদিন, কোন মুহূর্তে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয় না। হোয়াঙ্ তাই-এর ধারণা এত বিজ্ঞানসম্মত আজকের যুগের কার্ডিওলজিস্টরা এই বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলে অস্বীকার করতে পারেন না।

প্রাচীন চৈনিক বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস মানুষের স্বাস্থ্য গড়ে ওঠে মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, কাষ্ঠ এবং ধাতুর সমন্বয়ে। প্রাচীন চীনদেশে চাং চুঙ কিঙ্ ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক, তাঁর সময়কাল ১৯৫ খৃস্টাব্দ এবং হুয়া তু ছিলেন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক। হুয়া তু আনুমানিক ১১৫ থেকে ২০৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। হুয়া তুকে চীনদেশের সার্জারির জনক বলে অভিহিত করা হয়। তিনি বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করতেন এবং দেখা গেছে অপারেশন করার আগে, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রোগীকে বেহুঁস করে দেওয়া হত। চার্লস ক্রেটনের মতানুযায়ী প্রাচীন চীনদেশের চিকিৎসাশাস্ত্র, ভারতীয় পদ্ধতির চিকিৎসাধারার থেকে অনেক নিম্নস্তরের ছিল। প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে দেখা গেছে রিউমাটিজিন্, নিউরাইটিস্ প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক রোগের উপশম ঘটাবার জন্য ধাতু শলাকা ব্যবহৃত হত। সাধারণতঃ সোনা অথবা রূপোর ধারালো শলাকা যন্ত্রণাদায়ক স্থানে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

অতিরিক্ত যন্ত্রণা থাকলে বেশ কিছুদিন রেখে দেওয়া হত। অল্প যন্ত্রণায় কয়েক ঘণ্টা রাখা হত। এ ধরনের চিকিৎসা পরবর্তীকালেও করা হয়েছে এবং বর্তমানকালেও যন্ত্রণা উপশমের জন্য কাউন্টার ইরিট্যাণ্টস্ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত চীনদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ঘটে ভারতীয় পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। বৌদ্ধ শ্রমণদের কল্যাণে ভারতবর্ষ থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আলোর জ্যোতি তিব্বতে ছড়িয়ে যায় এবং সেখান থেকে চীনদেশের মধ্যে প্রতিভাত হয়।

প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থে অ্যাকিলিস্ মাকাওন প্রভৃতি চিকিৎসার যতটুকু উল্লেখ আছে, তাকে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। হিপোক্রাটিস গ্রীসের চিকিৎসার বিদ্যাকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেন। তাঁর পূর্বে গ্রীস দেশের চিকিৎসাবিষয়ক যে সব উল্লেখ আছে, তার কিছুটা কাল্পনিক কিছুটা বৈজ্ঞানিক।

ইম্পেড্কলেস্-এর মতানুযায়ী মানবদেহ সৃষ্টি হয়েছে অগ্নি, জল, মৃত্তিকা এবং বায়ুর সমন্বয়ে। ইম্পেড্কলেসের চিন্তাধারার উৎস থেকেই হিপোক্রাটিস-এর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জন্ম। ইম্পেডকলেস-এর চিন্তার মধ্যে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। হিপোক্রাটিস নিজের অধ্যাবসায়, নিজের অনুশীলনে, নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জীববিদ্যা এবং রোগবিদ্যাকে আলাদা করে ফেলেন, সেইজন্য গ্রীসদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান হিপোক্রাটিস-এর কাল থেকে শুরু হয় বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

হিপোক্রাটিস মুখ্যত সার্জন ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ফ্র্যাকচার, হেড ইনজুরি, পাইলস্, ফিসচুলা, রেকটাল প্রোল্যাপ্স-এর চিকিৎসার বিষয় আলোচিত আছে। তিনিই সর্বপ্রথম ফ্র্যাকচার এবং ডিসলোকেশনের পার্থক্য বিবৃত করেন। এমনকি হিপোক্রাটিস্ স্পাইন্যাল ফ্র্যাকচার পর্যন্ত ডায়াগনোসিস করে তার চিকিৎসাপদ্ধতি বিবৃত করেছিলেন। ফ্র্যাকচার বিষয়ক যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হিপোক্রাটিস করেছিলেন সেই একই চিকিৎসার বিধি আমরা ভারতীয় পদ্ধতিতে দেখতে পাই। ফ্র্যাকচারের পরই হিপোক্রাটিস-এর অবদান 'হেড ইনজুরি' অধ্যায়ে। মাথার আঘাতে কেবল ভেঙে যায় এ ধারণা দূর করে দেন হিপোক্রাটিস। ফ্র্যাকচার, ডিপ্রেসন এবং মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ প্রভৃতি মস্তিষ্ক আঘাতের বিভিন্ন দিক হিপোক্রাটিস-এর আলোচনায় দেখতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক আঘাতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিপোক্রাটিস ট্রিফাইন চিকিৎসার পথ অবলম্বন

করতেন। হিন্দু সার্জনদের মত হিপোক্রাটিস অ্যাম্পুটেশন এবং টিউমার অপারেশন করেন নি। সুশ্রুত সংহিতায় আমরা রক্তার্বুদ (ইউটেরাইন টিউমার) অপারেশনের উল্লেখ দেখতে পাই, কিন্তু 'হিপোক্রাটিস' সংকলনে সে ধরণের কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। হিপোক্রাটিসের গ্রন্থে এম্পাইমা রোগের বিবরণ পাওয়া যায় এবং তার চিকিৎসারও সুচারু বিধি বিবৃত আছে। দুটি পাঁজরার মাঝখানে শলাকা প্রবেশ করিয়ে প্লুরাল ক্যাভিটির মধ্যে যে পুঁজ জমা থাকে তা বার করে দেবার পদ্ধতি 'হিপোক্রাটিক' গ্রন্থে বিবৃত আছে।

অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত, হিপোক্রাটিস-এর সংকলন 'করপাস হিপোক্রাটিক্যাল' হিপোক্রাটিস-এর পরবর্তীকালে সংকলিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ান যুগে টলেমির অনুরোধে পণ্ডিতেরা প্রায় ষাট খণ্ড চিকিৎসাগ্রন্থের সংকলন করেন। যেগুলিকে পরবর্তীকালে হিপোক্রাটিস-এর সংকলন বলা হয়।

আলেকজান্দ্রিয়ান চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্ভব প্রাচীন হিন্দু মিশরীয় এবং গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমন্বয়ে। আলেকজান্দ্রিয়ান চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাল আনুমানিক তিনশ খৃষ্টপূর্ব। হিরোফিলাস এবং এরাসিষ্ট্রেটাস রচিত মানুষদেহের অ্যানাটমির বিবরণ প্রায় সকলেই জানেন। হিরোফিলাস অত্যন্ত সাহসী সার্জন ছিলেন এবং অপারেশন পদ্ধতিতে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তিনি অপারেশন করতে করতে যকৃত, প্লীহা কেটে বাদ দিয়ে দিতেন, কারণ তাঁর ধারণা ছিল এইসব গ্রন্থি মানুষের কাজে আসে না এবং সবই অপ্রয়োজনীয়। হিরোফিলাস রিটেশন অফ ইউরিনের চিকিৎসা করতেন এক ধরনের লম্বা ক্যাথিটার দিয়ে। তিনি আর এক ধরণের বিশেষ ক্যাথিটার আবিষ্কার করেছিলেন, যার দ্বারা মূত্রাশয়ের পাথর ভেঙে ফেলা যেত। মূত্রাশয়ের পাথর বেশি বড় হয়ে গেলে মূত্রনালী দিয়ে নামানো সম্ভব নয়, তখন এই যন্ত্র দিয়ে পাথর গুঁড়িয়ে ফেলা হত, তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে আসত। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সে যুগে খুব প্রচলিত ছিল। অলেকজাণ্ডারের ছেলে অ্যান্টিওকাস সিরিয়ার রাজা হবার পর তাঁর অভিভাবক ডায়াডোটাস ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অ্যান্টিওকাসকে সিংহাসনচ্যুত করে সেই স্থানে নিজেকে বসাবার সঙ্কল্প করেন ডায়াডোটাস্। অ্যান্টিওকাসের বয়স তখন মাত্র দশ বছর। অ্যান্টিওকাসের পেটের যন্ত্রণার কারণ হিসেবে ডায়াডোটোস্ বলেন মূত্রাশয়ে পাথর জন্মেছে। চিকিৎসকরা তাঁর ষড়যন্ত্রের সঙ্গী হয়ে একই কথা কলেন। ডায়াডোটাসের আদেশে অ্যান্টিওকাশের মূত্রাশয়ে যন্ত্র প্রবেশ করানো হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই হতভাগ্য অ্যান্টিওকাস মারা যায়।

প্রাচীন রোমক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে কাটো দি এলডার এবং সেলসাস্-এর নামোল্লেখ প্রয়োজন। কাটোর রাজত্বকাল ২৩৩ থেকে ১৪৯ খৃষ্টপূর্ব। কাটো গ্রীকদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করতেন এবং হিংসা পোষণ করতেন। আর্কাগাথাস্ বোধহয় সর্বপ্রথম গ্রীক চিকিৎসক যিনি রোমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু রোমবাসীরা তাঁকে মারধোর করে রোম থেকে তাড়িয়ে দেন।

কাটো দি এলডার কোন গ্রীক চিকিৎসককে তাঁর রাজ্যে চিকিৎসা করার অধিকার দেন নি ; তাঁদের তিনি উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কাটো সম্পূর্ণ নিজের পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন আর তার অধিকাংশই ছিল আন্দাজে। খানিকটা পাগলামি ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না।

তা সত্ত্বেও কাটোর নাম ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত। তাঁর পাগলামি থেকেই আমরা একটি রোগের নাম সর্বপ্রথম দেখতে পাই। তিনি কোন ঘা দেখতে পেলেই বাঁধাকপির পাতা থেঁতো করে লাগিয়ে দিতেন। যদি এই পদ্ধতিতে ক্ষতস্থান না সারত, তাহলে তিনি ঘোষণা করতেন, ওই ঘা সাধারণ ঘা নয়, ওই ঘা ক্যানসার ঘা। চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যানসার কথাটি আমরা কাটো দি এলডারের সময় থেকে জানতে পারি। সংহিতার কোথাও ক্যানসার নিয়ে আলোচনা করা হয় নি, অর্বুদ শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে যাকে টিউমার বলে পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণ চিহ্নিত করেছেন। সেলসাসের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর গ্রন্থ 'ডি-রা-মেডিকা' চরক সংহিতা এবং গ্রীকপদ্ধতির অনুকরণে লিখিত।

॥ আট ॥

চরক সুশ্রুত জীবকের সমসাময়িককালে অগ্নিবেশ ক্ষারণপাণি প্রভৃতি আরও মহান চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কথা বলতে গেলে ত কাহিনী শেষ করা দুরূহ হয়ে পড়বে, তাই জীবকের পরে আমরা আসব মহা-বিজ্ঞানী নাগার্জুনের জীবনকথায়।

নাগার্জুনের কথায় আসার পূর্বে চরক সংহিতায় আমরা একটা তালিকা দেখতে পাই। সে তালিকা এখানে দিলে পাঠক-পাঠিকার মনে ধারণা হবে, তখন চিকিৎসাশাস্ত্রকে কত বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করা হত এবং প্রায় আধুনিক-কালের মতই পাঠাভ্যাস করা হত।

চরক সংহিতায় দাঁত নখ নিয়ে আমাদের শরীরে ৩৬০ খণ্ড হাড় আছে বলেছেন। নীচে তালিকা পেশ করা হল ঃ

১। দন্ত—Teeth—৩২
২। দন্ত উলুখলা—Sockets—৩২
৩। নখ—Nails—২০
৪। অঙ্গুলি—Phalanges—৬০
৫। শলাকা—Long bones—২০
৬। অধিস্থান—Bases—৪
৭। পার্সনি—Heels—২
৮। গুলফ—Anklebones—৪
৯। মণিকা—Wrist bone—২
১০। অরত্নি—Boens of fore arms—৪
১১। জঙ্ঘাস্থি—Bones of legs—৪
১২। জানু—Bones of knee caps—২
১৩। জানু-কপালিকা—Elbow pans—২
১৪। উরুনালুকা—Hollow bones of thighs—২
১৫। বাহুনালুকা—Hollow bones of arms—২
১৬। অর্থস্থ—Shoulder—২
১৭। অর্থস্থ—ফলাকা—Shoulder blades—২
১৮। অক্ষক—Coller bones—২
১৯। যত্রু—Wind pipe—১
২০। তালুক—Palatal cavity—২
২১। শ্রোণি ফলাকা—Hip blades—২
২২। ভগস্থি—Pubic bone—১
২৩। প্রস্থস্থি—Back bones—৪৫
২৪। গ্রীবা—Neck bones—১৫
২৫। উরস—Breas bones—১৪
২৬। পারস্থক স্থলাকা—Rib sockets—২৪

২৭। স্থলাকারবুদা—Tuberdes of sockets—২৪
২৮। হন্বস্থি—Lower Jaw bones—১
২৯। হন্নমালা বন্ধন—Basal tie bones—২
৩০। নাসিকা ললাট—Nose cheek brow—১
৩১। শঙ্খ—Temples—২
৩২। শিরা কপাল—Cranial pan bones—৪

নাগার্জুন দুজন ছিলেন। দ্বিতীয় নাগার্জুন অগাধ পণ্ডিত ছিলেন এবং রসায়ণ শাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারা আবিষ্কার করেন, যার অনেকগুলি পদ্ধতি আজও সকলে স্বীকার করে নেন।

নাগার্জুন পণ্ডিত অন্ধ্র প্রদেশের কোদণ্ড গ্রামের মানুষ। কোদণ্ড গ্রাম বর্তমানের ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী, সমুদ্রতীরে অবস্থিত। নাগার্জুনের মেধা শিশুকাল থেকেই এত উন্নত ছিল যে একবার তিনি যা শুনতেন বা অধ্যয়ন করতেন, তা কখনও ভুলতেন না।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন খ্যাতির শিখরে। শুধু ভারতে নয়, বহির্ভারত থেকেও ছাত্ররা আসত নালন্দায় শিক্ষালাভের জন্যে। নাগার্জুনের শিশুকাল থেকে ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তিনি নালন্দায় গিয়ে শিক্ষালাভ করবেন।

নালন্দার ছাত্রসংখ্যা তখন প্রায় দশ হাজার। এখানে শুধু বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হত না। দৈনন্দিন জীবনে যত রকমের প্রয়োজন, সবই শিক্ষা দেওয়া হত নালন্দায়। কৃষিকার্য সম্পন্ন করার জন্যে যে ধরনের কুশলতা দরকার, সবই শিখিয়ে দেওয়া হত নালন্দায়। গৃহনির্মাণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও শিক্ষা দেওয়া হত নালন্দায়। প্রাত্যহিক কারিগরী বিদ্যা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত।

নালন্দায় ছাত্রদের পাঠগৃহ ছিল বিরাট বড়। প্রত্যেক ছাত্রের সামনে একটি করে প্রদীপ জ্বলত, প্রদীপের পেছনে বড় একখণ্ড অভ্র থাকত। অভ্র খণ্ডটি রিফ্লেকটরের কাজ করত। প্রদীপের আলো অভ্রখণ্ডের ওপর পড়ে আলোকরশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত বলে সমস্ত পাঠগৃহ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে উঠত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারগুলি প্রশস্ত ছিল এবং প্রত্যেক দ্বারে এক একদিন এক একজন অধ্যাপক পাহারা দিতেন। আলাদা দরোয়ান বলে কিছু ছিল না। সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে দেখলে দ্বাররক্ষী অধ্যাপক, তাঁকে নিয়ে যেতেন অধ্যক্ষের

নিকট। অধ্যক্ষ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতলে অবস্থান করতেন। অধ্যক্ষ আগন্তুকের পরিচয় জ্ঞাত হয়ে যদি নিশ্চিত হতেন, তাহলে তাঁর প্রবেশাধিকার দিতেন, অন্যথায় ফিরিয়ে দিতেন।

ছাত্রদের রান্না নিজেদের করে নিতে হত। এক একদিন এক একজন অধ্যাপকের ওপর দায়িত্ব পড়ত রন্ধনকার্য তত্ত্বাবধানের। একাধিক ছাত্র, অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে রন্ধনকার্য সমাপ্ত করত এবং প্রত্যেকটি ছাত্র পরিপাটি করে আহার করে, নিজের থালা, বাটি, গ্লাস মেজে, যেখানে আহার করত, সে স্থান পরিষ্কার করে নিজের আবাসকক্ষে শয়ন করতে যেত। এই ভাবে শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছাত্রকে তার দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হত। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশিক্ষাও দান করা হত।

বিভিন্ন রাজা মহারাজা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি ও অর্থ দান করতেন। সেই জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কৃষিকার্য করত। সেই সব জমি থেকে যে শস্য হত তাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের সারা বছরের খাদ্য সঞ্চয় করা হত। এই যে রাজা-মহারাজারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ ও জমি দান করতেন, তার পরিবর্তে তাঁরা কিন্তু কোন কিছুই চাইতেন না, এমন কি কোন দিন একটি ছাত্রকে ভরতি করারও অনুরোধ করেন নি। রাজশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি করতেন।

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নাগার্জুন অন্ধ্রপ্রদেশের কোদণ্ড গ্রাম থেকে নালন্দায় উপস্থিত হন বিদ্যাশিক্ষার জন্য। নালন্দায় অধ্যয়নকালেই নাগার্জুন মনস্থির করেন তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে নালন্দার শিক্ষকতা কার্যে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করবেন। সে যুগে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ না করলে নালন্দার অধ্যাপক হবার অধিকারী হওয়া যেত না। নাগার্জুন সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে প্রথমে চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি রসায়ণশাস্ত্রে পণ্ডিত হন। পারদ এবং অন্যান্য ধাতুর যে ওষধি ব্যবহার তা সর্বপ্রথম নির্ণয় করেন বিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ নাগার্জুন।

নালন্দার আধিপত্য সম্রাট হর্ষবর্ধন পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে নালন্দার খ্যাতি বিলীন হতে থাকে।

হারুণ-অল-রসিদের রাজসভা থেকে দুজন পণ্ডিতকে নালন্দায় পাঠানো হয়। পারস্য দেশ থেকে আগত এই দুই পণ্ডিত নালন্দায় পাঠকালে সুশ্রুত সংহিতা এবং চরক সংহিতা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করে হারুণ-অল-রসিদের সভায় নিয়ে যান।

রেঁনাসাসের সময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি পশ্চিম জগতে চলে গিয়ে নিজেদের বসবাস স্থায়ীভাবে শুরু করেন। এঁরা যখন পশ্চিম জগতে চলে যান, তখন সুশ্রুত সংহিতা এবং চরক সংহিতার বিভিন্ন সংস্করণ সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং পশ্চিম জগতে ক্রমশঃ বিজ্ঞানের বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি লাভ ঘটে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশঃ অবনতির পথে বিলীয়মান হতে শুরু করে। সবুক্তগীন যখন এদেশে আসেন তখন ছত্রিশজন ইউনানী প্রথায় অভিজ্ঞ চিকিৎসককে ভারতে আনেন। সবুক্তগীনের ধারণা ছিল, ভারতে কোন চিকিৎসক নেই এবং চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা নেই।

তারপর থেকে ইউনানী প্রথার উন্নতি ঘটতে থাকে এবং আয়ুর্বেদ প্রথার অবনতি ঘটে।

নালন্দা ক্রমশঃ ভগ্নদশায় রূপান্তরিত হয় এবং তুর্কীদের আক্রমণে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

।। নয় ।।

গ্রীক বা অন্যান্য দেশের সমাজে প্রবেশ করার আগে প্রাচীন ভারতে কি ধরণের চিকিৎসা হত সে-বিষয় কিছু আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না কারণ ইতিহাসের পদক্ষেপ অনুসরণ করলে দেখা যায় ভারতবর্ষই হল পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসার তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসকদের মনে চিকিৎসা-বিষয়ক যে চিন্তাধারা জাগ্রত হয়েছিল, তা এত বিজ্ঞানসম্মত যে, পরবর্তী-কালের পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ কোনভাবেই তা অস্বীকার করতে পারেননি।

সুশ্রুতের অপারেশন পদ্ধতি খুবই বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর অপারেশন পদ্ধতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখা হয়েছে এবং বর্তমান কালের বিশেষজ্ঞগণের অভিমত যে, সুশ্রুতের অপারেশন পদ্ধতি খুবই উন্নত ধরনের।

হার্নিয়া, ইণ্টেস্টীনাল অবস্ট্রাকশন, টিউমার প্রভৃতি রোগে সুশ্রুত অপারেশন করতেন। অপারেশনের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অ্যানেস্থেসিয়ার কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। খুব সম্ভব গাঁজা জাতীয় দ্রব্যের মাদকতার সময়ে

অপারেশন করা হত। যতদূর মনে হয়, সুশ্রুত-সংহিতায় শুধু সার্জারি-বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে, সেই জন্য অ্যানেস্থেসিয়ার পদ্ধতি বলা হয়নি।

অপারেশনের প্রথম স্তর, অর্থাৎ চর্মস্তর কাটা হত ধারালো স্ক্যাল-পেল দিয়ে। মাংসপেশী, স্নেহস্তর পার হয়ে পেটের মধ্যে একটু কেটে রুগ্ন অংশ বাইরে করে আনা হত। রুগ্ন অংশ কেটে বাদ দিয়ে সুস্থ অংশ প্রান্ত দুটি পাশাপাশি ধরে সেলাই করে দেওয়া হত। সেলাই করা হত বড় বড় কালো পিঁপড়ে দিয়ে। প্রান্ত দুটি একত্র করে পিঁপড়ে ধরত, সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়ে কামড়ে ধরত! যেই পিঁপড়ে কামড়াত, পিঁপড়ের কোমর থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হত। তার ফলে পিঁপড়ের ঠোঁট চেপে, ক্লিপের মত আটকে যেত। সেই অবস্থায় অন্ত্রাংশ পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন এবং মাংসপেশী, চামড়া সেলাই করে দেওয়া হত।

সুশ্রুত-র এই পদ্ধতিকে পরবর্তীকালে ইউরোপীয়ান বিশেষজ্ঞগণ গ্রহণ করেছিলেন। সুশ্রুত পিঁপড়ে ব্যবহার করেছিলেন সেলাই করার জন্যে, তার প্রধান কারণ জৈব পদার্থ দিয়ে সেলাই করতে পারলে শরীরের অভ্যন্তরে সেলাই হবার পর জৈব পদার্থ আপনা থেকে গলে যায় এবং রোগীর দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। পরবর্তীকালে চিকিৎসা বিশারদরা ছাগজাতীয় পশুর অন্ত্রকে সুতোর মত তৈরি করে সেলাই করতেন, যাকে বলা হয় catgut। সুশ্রুতের দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিপূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ছিল, তা শুধু সেলাইয়ের জন্য পিঁপড়ে ব্যবহার নয় আরও অনেক পদ্ধতি থেকে জানা যায়। পিঁপড়ে ব্যবহারের অন্তর্নিহিত যুক্তি, এমন কোন বস্তু দিয়ে সেলাই করা দরকার যা কিছুদিনের মধ্যে শরীরের অংশের সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানকালের চিকিৎসা বিশারদরাও একই ধরনের চিন্তা করে থাকেন, এবং সেই চিন্তাধারা থেকে 'ক্যাটগাট' ব্যবহারের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

ইউরোপের প্লাস্টিক-সার্জারির জন্মদাতা আমাদের দেশের নমস্য চিকিৎসক সুশ্রুত, এ-কথা জার্মান পণ্ডিত হার্সবাগ স্বীকার করে গেছেন। সুশ্রুত-সংহিতার সূত্র-স্থানম্ অধ্যায়ে ক্ষত কর্ণ-মূলের খানিকটা অংশ, শরীরে অন্য স্থানের সুস্থ চর্মখণ্ড দিয়ে আবৃত করার বিবৃতি আছে। সুশ্রুত এ-বিষয়ে স্থির ছিলেন যে, শরীরের সুস্থ অংশের চামড়া ক্ষত স্থানের ওপর স্থাপন করলে আপনা থেকেই জুড়ে যায় এবং ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

সুশ্রুত সংহিতায় রোগীর ঘরকে জীবাণুমুক্ত করার উপায় লিপিবদ্ধ আছে। শ্বেত সরিষা, নিম্ব পাতা, শাল গাছের আঠার মত রসের ধোঁয়া দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হত। এই চিন্তাধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে-যুগের চিকিৎসক বিশার-

দগণ জীবাণু বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং জানতেন জীবাণু দ্বারাই রোগের সৃষ্টি হয়।

অ্যাম্পুটেশন পদ্ধতির বিষয় যা লেখা আছে, আজকের যুগের বিশেষজ্ঞগণ সেই পদ্ধতিতেই কাজ করে থাকেন। আম্পুটেশন করার নির্ধারিত স্থান বেছে নেওয়া হত সুস্থ চামড়া এবং চামড়ার ওপর সুস্থ লোমকূপ পরীক্ষা করে। অ্যাম্পুটেশন করার পর সুস্থ চামড়া দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে দেওয়া হত, তার ওপর লাগিয়ে দেওয়া হত ঘৃত ও মধুর প্রলেপ।

হাত-পা ভেঙে গেলে পরীক্ষার যে রীতি সুশ্রুত সংহিতায় আছে, আজকের যুগেও তার কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে। হাত-পায়ের হাড়ের যে অংশ ভেঙে যায়, সে-অংশ ফুলে ওঠে। কিচকিচ শব্দ হয় (crepitation) এবং রোগী ব্যথা অনুভব করে। এই অংশকে সরাসরি টেনে মুখোমুখি বসিয়ে দেবার নির্দেশ সুশ্রুত-সংহিতায় আছে (Reduction) তারপর পাতলা বাঁশের অথবা বেতের স্পিলণ্টার তৈরি করে ভাঙা জায়গার দুপাশে লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলে ভগ্ন অস্থি আবার ঠিক হয়ে যায়। এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি পরবর্তীকালে ইউরোপীয় চিকিৎসাধারা গ্রহণ করে এবং আধুনিক-কালের প্লাস্টার ব্যবহারের আগে পর্যন্ত স্পিলণ্টার ব্যবহৃত হত, এখনও প্লাস্টারের অভাবে এই পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়।

হিন্দু সভ্যতার কালে রোগী-রোগিণীদের চিকিৎসার জন্য কোন নির্ধারিত হাস-পাতাল ছিল কিনা তার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ, রোগী রোগিণীদের গৃহেই রোগের চিকিৎসা হত। অনেকের অভিমত, রোগীর গৃহে চিকিৎসা হত সত্য, তার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে আশ্রমেও চিকিৎসা করা হত। এ সমস্তই অনুমান, ঐতিহাসিক সত্য আছে বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষের চিকিৎসাশাস্ত্রের আরও উন্নতি হয় বৌদ্ধযুগে। তক্ষশীলা তখন শুধু ভারতের নয়, সারা এশিয়া এবং ইউরোপের উজ্জ্বলতম শিক্ষাকেন্দ্র। চিকিৎসা-বিষয়ক অধ্যাপক ছিলেন ভিক্ষু আত্রেয়।

ভিক্ষু আত্রেয় একদিন পাঠগ্রহণ করছিলেন। অন্যান্য ছাত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যশাস্ত্রবিশারদ জীবকও উপস্থিত ছিলেন সেদিনের পাঠ-সময়ে। আত্রেয় মনো-যোগের সঙ্গে পড়াচ্ছিলেন, ছাত্ররা তন্ময় হয়ে শুনছিল, এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রাজা বিম্বিসারের পত্রদূত। আত্রেয় তাঁর দিকে তাকাতে, আভূমি প্রণাম করে দূত রাজার পত্র আত্রেয়-র পায়ের কাছে রাখল।

আত্রেয় পত্রলিপি তুলে নিলেন, ক্ষণিক চিন্তা করে পত্রখানি খুলে ধরলেন

চোখের সামনে। নৃপতি বিম্বিসার পত্র লিখেছেন। কাতর অনুনয় করেছেন পত্রের ছত্রে ছত্রে। পত্রখানিকে কল্পনা করলে দেখা যাবে নৃপতি বিম্বিসার চিকিৎসক আত্রেয়কে লিখছেন—

প্রণম্য চিকিৎসক আত্রেয়,

আমি অর্শরোগের যন্ত্রণায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। আপনি যদি দয়া করে আপনার কোন নবীন শিষ্যকে আমার চিকিৎসার জন্য পাঠান, আমি অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি। আশা করি আমার প্রার্থনা বিফলে যাবে না এবং যত শীঘ্র সম্ভব কাউকে পাঠাবেন। প্রণামান্তে।

যন্ত্রণাকাতর

বিম্বিসার

আত্রেয় পত্র পাঠ সমাপ্ত করে নিজের ছাত্রদের ওপর একবার নজর বোলালেন। নবীন চিকিৎসক জীবক শল্য চিকিৎসায় আশ্চর্য পারদর্শী। জীবককে পাঠিয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন।

—জীবক! আত্রেয় আহ্বান করলেন।

বিনীতভাবে জীবক দাঁড়িয়ে উঠলেন।

—তোমাকে একটি গুরু কাজের দায়িত্ব দেব।

—আপনার আশীর্বাদে শল্য-চিকিৎসার যাবতীয় পদ্ধতি আমার করায়ত্ত। আপনি যে আদেশ করবেন পালন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব।

—মহারাজ বিম্বিসার অর্শরোগে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তিনি একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন। আমার একান্ত ইচ্ছে, তুমি গিয়ে তাঁর চিকিৎসা কর।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য। জীবক অধ্যাপক আত্রেয়-র চিঠি নিয়ে বিম্বিসারের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। প্রথমে রাজা বিম্বিসারের মন ভেঙে গেল। এই নবীন চিকিৎসক তাঁর কি চিকিৎসা করবে? তবু রোগের যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়াবহ, মানুষকে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য করে দেয়। রাজা বিম্বিসার অর্শের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছেন না। বাধ্য হয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন নবীন চিকিৎসক জীবকের হাতে।

আশ্চর্য! অল্পকালের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন রাজা বিম্বিসার। তিনি এত খুশি হলেন যে, জীবককে আর ছাড়লেন না। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে জীবককে চিরকালের জন্য স্থান দিলেন তাঁর রাজসভায়।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে তথাগত-র উদাত্ত বাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। সেই উদাত্ত বাণী একদিন বিম্বিসারের রাজসভাকেও উদ্বেলিত করে তুলল। বুদ্ধদেব তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন বিম্বিসারের রাজসভায়। এত রূপ, এত জ্যোতি! চিকিৎসক-সম্রাট জীবক পরম বিস্ময়ে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তথাগত জীবকের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলেন—তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন জীবক।

জীবক নিরুত্তর।

—মানুষের দেহকে নীরোগ করে তুলতে, রোগ জরা মৃত্যুকে দূর করার জন্যে তোমার মত চিকিৎসককে আমার সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

সম্মোহিতপ্রায় জীবক মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আপনি যা আদেশ করবেন, তাই হবে তথাগত!

সেই মুহূর্তে গৌতম বুদ্ধের পাদস্পর্শ করে জীবক তাঁর অনুগামী হলেন। পরবর্তীকালে জীবক বৌদ্ধ-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে সম্মানিত। জীবক বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রেন সার্জন।

॥ দশ ॥

ক্রো-ম্যাগনন সময়ের মানুষের সঙ্গে বৌদ্ধ যুগের মানুষের আকাশপাতাল তফাৎ। ক্রো-ম্যাগনন পিরিয়ডের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। যা কিছু করত অজানা আশঙ্কায় করে বসত। তার নিজের পরিধির বাইরে আর কিছু সে জানত না, জানবার মত মানসিক ক্ষমতাও ছিল না।

বৈদিক যুগের মানুষ অনেক উন্নত ধরনের। সমাজকে শৃঙ্খলিত করার জন্য সমাজপতি বা ঋষিরা ধর্মের সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে দেবতারও সৃষ্টি হয়। ধর্ম ও ঈশ্বর সৃষ্টির প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে সুশৃঙ্খলিত ও সামাজিক জীবে পরিণত করে তোলা। বৈদিক যুগের মূলমন্ত্র পরস্পরকে ভালবাস, একের বিপদে

অন্যের সাহায্যদান এবং নিজের উন্নতিসাধন কর। আত্মচিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান।

বৈদিক যুগের পরিপূর্ণতার পরই নানা ব্যভিচার আরম্ভ হয়ে যায়। মানবিক চেতনার নিম্নগামী রূপ দেখে বিপ্লব শুরু হয়ে যায় এবং সর্বপ্রথম ধর্মবিপ্লবের সূচনা ঘটে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের সঙ্গে।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

শুধু ভারতবর্ষের মাটিতে নয় ইউরোপ এশিয়ার সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অভূতপূর্ব তথাগতের বাণী গ্রহণ করে পরম আদরে। মানুষ তখন অনেক উন্নত ধরণের। নিজের ভালমন্দ নিজের পাপপুণ্যের বিচার করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে অনির্বাণ জ্যোতির রূপে প্রজ্জ্বলিত। মানুষ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চাচ্ছে, নিজের মনের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোথাও তার উত্তর নেই। ঠিক এই মুহূর্তে আকাশ বাতাস ভরিয়ে উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—।

বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতের বুকে বিপ্লব সৃষ্টি করেনি, পৃথিবীর সমস্ত মানবকুলকে আরও উন্নত আরও পরিমার্জিত এবং জ্ঞানান্বেষী করে তোলার প্রেরণা সৃষ্টি করে। পরবর্তী যুগে ইউরোপের মাটিতে রেঁনাসাস্ ঘটেছিল তার বীজমন্ত্র ভারতের মাটিতে বৌদ্ধযুগে উচ্চারিত হয়েছিল বললে সত্যের অপলাপ হবে বলে মনে হয় না। বৌদ্ধশ্রমণেরা ভগবান বুদ্ধের বাণী পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিতরণ করার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বক্তব্য হল হিন্দু ধর্মীয় সন্ন্যাসীগণ শুধু ধর্মপ্রচার করেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের শ্রমণগণ ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানের বর্তিকা জ্বালবার চেষ্টা করেছেন এবং সেইজন্যই এত গভীরভাবে সার্থকতা লাভ করেন। আগেই বলেছি সাধারণ মানুষের মনে তখন বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা দাউ দাউ করে জ্বলছে। শুধু ধর্মের কথা তাদের কাছে জোলো লাগছে, পুরনো লাগছে। নতুন কিছু শোনার প্রত্যাশায় মানুষের মন উন্মুখ। বৌদ্ধশ্রমণের দল বহির্ভারতে ভ্রমণ করেছেন তথাগত বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণী প্রচার করবার জন্য তার সঙ্গে নিজের দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বহন করে নিয়ে গেছেন অন্য দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার জন্যে। শুধু ধর্মের কথা হলে সাধারণ মানুষ এত তন্ময় হয়ে গ্রহণ করত কি না সন্দেহ, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ছিল বিজ্ঞানের কথা। ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল বলেই বৌদ্ধধর্ম সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষকে এত গভীর ভাবে সম্মোহিত করতে

পেরেছিল। পরবর্তীকালে খৃস্টধর্মের মিশনারী সন্ন্যাসীরা একই পদ্ধতিতে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলেই খৃস্টধর্ম সাধারণ মানুষের এত সহজগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল।

বৈদিক যুগে চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতাল ছিল কি না সন্দেহ কারণ চরক বা সুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসা-কেন্দ্রের কোন উল্লেখ নেই। পোষ্টমর্টেম পরীক্ষা এবং মর্গের অস্তিত্ব ছিল এ সংবাদ আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আশু-মৃত-পরীক্ষার পদ্ধতির বিশ্লেষণ আছে। আশু-মৃত পরীক্ষার সহজ অর্থ করলে দাঁড়ায় সদ্য মারা যাওয়া মানুষকে পরীক্ষা করা। আশু-মৃতপরীক্ষার দ্বারা সঠিকভাবে বলে দেওয়া যেত কীভাবে, কখন রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। যে সব লোক রহস্যজনকভাবে মারা যেতেন, তাঁদের দেহ একটি ঘরে সংরক্ষিত করে রাখা হত। বিভিন্ন রকমের তেল ও তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়ে শবদেহগুলিকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা হত। পারদর্শী চিকিৎসক সদ্যমৃত দেহকে পরীক্ষা করে দেখতেন কী ভাবে মৃত্যু ঘটেছে। আত্মহত্যা, হত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু নির্ধারণ করার পর চিকিৎসক তাঁর বিশ্লেষণের তথ্য বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং বিচারক সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিচার করতেন।

কৌটিল্যের আশুমৃতপরীক্ষা বর্তমান যুগের পোস্টমর্টেম পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানকালের ক্রিমিন্যাল কোর্টের বিচারক একই পদ্ধতিতে বিচার করে থাকেন।

প্রাকবুদ্ধ যুগে মর্গের উল্লেখ থাকলেও চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতালের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধযুগে হাসপাতাল স্থাপনার কথা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই! ক্যাস্টেলানীর ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি সম্রাট অশোক, কনিষ্ক এবং হর্ষবর্ধনের সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন রকমের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব হাসপাতালে শ্রমণ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করতেন। তাঁরা রোগীদের দু'ভাগে ভাগ করে নিতেন। যাঁদের চিকিৎসা করলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁদের পরিপূর্ণভাবে চিকিৎসা করতেন। যাঁদের চিকিৎসা করলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই তাঁদের অনর্থক হাসপাতালে ভরতি করতেন না। ওই একই ইতিহাস থেকে জানা যায় সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরে পাঁচশো খৃস্টপূর্ব সময়ে একটি সুন্দর হাসপাতাল ছিল।

বৌদ্ধশ্রমণেরা বিভিন্ন দেশে একই সময়ে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা দেশে ভ্রমণ করেন। সিংহল-তিব্বত-গ্রীস-এশিয়ামাইনর-মিশর প্রভৃতি দেশে শ্রমণেরা বৌদ্ধ-

ধর্ম প্রচার করেন। তার সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতির চিকিৎসাধারাও প্রবর্তন করেন। প্রাচীন গ্রীস দেশের পাইথাগোরাস পুষ্পকে অনেক বিশেষজ্ঞ ভারতের পদ্মপুষ্প বলে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে বৌদ্ধশ্রমণেরা যখন গ্রীস-দেশে যান তখন 'উৎপলম' পুষ্প সঙ্গে নিয়ে যান। অনেকের মতে, গ্রীক সিমনোইরা বৌদ্ধশ্রমণ ছাড়া আর কেউ নন। মোট কথা, বৌদ্ধশ্রমণদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বহির্ভারতের সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

সপ্তম শতাব্দী থেকে আরব দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি ঘটে। হারুণ-অল-রশিদ ৭৮৬ থেকে ৮৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি নানাদেশের চিকিৎসাশাস্ত্র অনূদিত করিয়ে আরব চিকিৎসা-শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ভারতবর্ষের সমাজে তখন অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা রচিত হয়েছে। ভাগবৎ বৌদ্ধ এই দুটি গ্রন্থ সংকলিত করেন। তিনি পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। এই সময়ে 'নিদানশাস্ত্র' অর্থাৎ প্যাথোলজিরও চর্চা বিস্তারলাভ করে। বাংলাদেশের পণ্ডিত ইন্দু করের পুত্র মাধব কর দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটির নাম 'নিদানশাস্ত্রম'। এই গ্রন্থে তিনি প্যাথোলজি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্বিতীয়টির নাম 'রত্নমালা'। এই তিন গ্রন্থে যাবতীয় ওষুধের গুণাগুণ লিপিবদ্ধ করেন। হারুণ-অল-রশিদের আদেশে দুজন পণ্ডিত ভারতে আসেন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষালাভের জন্যে, হারুন-অল-রশিদের আদেশে এঁরা চরক সংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা এবং 'নিদানশাস্ত্রম' আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করে নিজের দেশে নিয়ে যান। ঠিক একই পদ্ধতিতে মিশরীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আরবীয় অনুবাদ ঘটে হারুণ-অল-রশিদের রাজত্বকালে। সে যুগে অ্যাভিসিনা এবং অ্যালেবুকাস আরবদেশের বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন। সম্ভবতঃ এঁরাই অধিকাংশ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সপ্তম শতাব্দীর সময় থেকে আরবের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে জটামনসা-তিল-আদা প্রভৃতি নানা আয়ুর্বেদীয় ওষধি ভারতবর্ষ থেকে আরবে রপ্তানি হওয়া শুরু হয়েছিল।

তারপরের যুগ ভারতবর্ষের অন্ধকারের যুগ। মুহম্মদ গজনীর ক্রমাগতঃ আক্রমণে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান বিপন্ন হয়ে পড়ল। মুহম্মদ ঘোরী সবুক্তগীন-এর সঙ্গে অনেক ইউনানী প্রথার চিকিৎসক ভারতবর্ষে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। মুসলমান রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বুকে ক্রমশঃ ইউনানী চিকিৎসার বিস্তার লাভ ঘটে এবং বৈদিক-বৌদ্ধ প্রথার চিকিৎসার অবলুপ্তি ঘটতে শুরু করে।

ইতিহাসের পূর্বাকাশে ঘন মেঘের ঘনঘটা পশ্চিমাকাশে নতুন সূর্যের অভ্যুদয়। ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র ক্রমশঃ বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নতুনভাবে উদিত হল ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন সূর্য। সূচিত হল চিকিৎসাশাস্ত্রের নব্যযুগ।

॥ এগারো ॥

গ্যালেনের মৃত্যুর প্রায় বারোশো বছর পরে ইটালীর ভিঞ্চি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক শিল্পী! চিকিৎসক নন, বিজ্ঞানী নন, একজন শিল্পী, যাঁর রক্তের মধ্যে ছিল ছবি আঁকার দুরন্ত নেশা।

১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ইটালীর ফ্লোরেন্সের কাছে ভিঞ্চিগ্রামে এই মনীষির জন্ম হয়।

নাম লিওনার্ড।

বাবা ছিলেন গ্রামের এক সরকারী কর্মচারী এবং মা গ্রামের সরাইখানার পরিচারিকা। লিওনার্ড বাঁ হাতে লেখাপড়া করতেন, ছবি আঁকতেন। একজন শিল্পীর কথা বিজ্ঞানের কথা বলতে বলতে কেন এসে গেল সেকথা সকলেরই মনে হতে পারে, তাই এই জীবনীর উপস্থাপনা।

সে যুগে পাশ্চাত্য দেশে শব ব্যবচ্ছেদ করা আইনবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু লিওনার্ড সেই নিষেধাজ্ঞা না মেনে গোপনে শব ব্যবচ্ছেদ করে মাংশপেশী দেখতে কেমন, তার ছবি এঁকেছিলেন নিখুঁতভাবে, মাংসপেশী সংকুচিত করলে কেমন দেখায়, আবার প্রসারিত করলে কেমন হয়, এ বিষয়ে পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে ছবি এঁকেছিলেন লিওনার্ড। মাংসপেশী সংকুচিত করলে প্রত্যেকটি হাড়ের যে অবস্থা হয় তারও ছবি আঁকেন লিওনার্ড। লিওনার্ড ছবি এঁকে এও প্রমাণিত করেছিলেন যে, মস্তিষ্কের চারপাশে ফাঁপা জায়গা আছে এবং সেই জায়গায় জলভরা আছে। তিনি একথাও বলেছিলেন, চোখের ওপরে, কপালের ভেতর, নাকের দুপাশ, ফাঁপা। লিওনার্ড এগুলো অনেকটা খেয়ালের বশেই আঁকতেন এবং তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না বলেই কেউ তাঁর এই ছবিগুলোর প্রতি তেমন নজর দেননি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় লিওনার্ড যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেগুলো এত নিঁখুত যে আজও কেউ তার কোন ব্যতিক্রম আবিষ্কার করতে পারেন নি। লিওনার্ড যদিও

এই ছবিগুলোর জন্য বিখ্যাত নন, তাঁর অমর চিত্র শেষভোজ এবং মোনালি আজও সারা বিশ্বে সমাদৃত।

লিওনার্ড নামের সঙ্গে তিনি তাঁর-গ্রামের নামও যোগ করে নিজের না রেখেছিলেন লিওনার্ড দ্য ভিঞ্চি। লিওনার্ড দেহত্যাগ করেন ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে।

আঁদ্রে ভেসেলিও জন্মেছিলেন ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে, বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রোসেলসএ। তাঁর বাবা ছিলেন স্পেন দেশের সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর ঔষ প্রস্তুতকারক। ভেসেলিও কিন্তু ওসবের ধার ধারতেন না। তিনি কোথায় ইঁদু আছে ধর, আর ধরেই তাকে চিরে ফেলে দেখ তার মধ্যে কি আছে। কোথা আরশোলা আছে দেখ, আর তাকে ধরে চেরো। এই ধরণের খেলাতে বাড়ি লোক বিরক্ত হয়। ছেলেটিকে মারধোর করে, কিন্তু এই অবাধ্য একরোখ ছেলেকে কিছুতেই বাগে আনা গেল না।

ডাক্তারী পড়ার সময়েই আঁদ্রে অধ্যাপকের মতামতের ওপর প্রতিবা করলেন। সে যুগের অধ্যাপকরা গ্যালেনের মতামত বেদবাক্যের মত মানতেন এব সেই অনুসারেই পড়াতেন। আঁদ্রে প্রতিবাদ করে বললেন—গ্যালেন মহামতি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনিও অনেক জায়গায় ভুল কথা বলেছেন

—তিনি ভুল বলেছেন, এ কথা প্রতিপন্ন করতে হলে নিজের সঠিক মত আগে পেশ করা দরকার।

—ঠিক।

মনে মনে সাব্যস্ত করলেন আঁদ্রে। মানুষের দেহের মধ্যে কি আছে দেখতে হবে। লিওনার্ড দ্য-ভিঞ্চি ছবি এঁকে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন, কিন্তু তিনি বিজ্ঞানী নয় বলেই কেউ তাঁর ছবিগুলোর ওপর গুরুত্ব দেননি, কিন্তু আঁদ্রে খুব যত্ন করে ছবিগুলো দেখলেন এবং তাঁর মনে হল, এই পথেই কাজ করলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

আঁদ্রে এবং তার এক বন্ধু ঠিক করলেন কবরখানা থেকে মৃতদেহ চুরি করে এনে শরীরের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে হবে।

দুই বন্ধু শহরের উপকণ্ঠে কবরস্থানে গিয়ে বসে থাকেন এবং শিয়াল কুকুরে খুঁড়ে যে হাড় বার করে খায়, তাই দেখেন দুজনে, এমনি ভাবে দিনের পর দিন দুই বন্ধু পড়েন আর তাঁদের নোটবুকে সব লিখে নেন। এমনিভাবে কাজ করতে করতে একদিন ফেরার সময় হঠাৎ দেখলেন একজন মানুষকে গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলতে! দুজনেই আনন্দে আত্মহারা। দুজনেই স্তব্ধ। কিন্তু সাহস করে দিনের

আলোতে কিছু করলেন না, রাতের অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাত গভীর হ্যতে দুই বন্ধু মৃতদেহটাকে গাছ হতে নামিয়ে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলেন। জোরালো আলো জ্বালাতে ভয় পেলেন, লোকেরা জানতে পারবে। মোমবাতির আলোয় খুব সন্তর্পণে দুই বন্ধু শরীরের ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে নিয়ে তার বর্ণনা লিখে নিলেন। এইভাবে দিনের পর দিন পরীক্ষা করে এক অ্যানাটমীর বই লিখলেন। এঁদের বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর। এই বইতে গ্যালনের মতবাদকে খণ্ডন করে নিজের সঠিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন। বন্ধু-বান্ধবরা উপদেশ দিলেন—এ বইতে শব ব্যবচ্ছেদের কথা লেখা আছে। শব-ব্যবচ্ছেদ আইন্ বিরুদ্ধ, সরাসরি শব-ব্যবচ্ছেদের কথা লিখলে তুমি হয়ত বিপদে পড়ে যাবে।

আঁদ্রে কথার যুক্তি মানলেন। তিনি ব্যবচ্ছেদের কথা বাদ দিয়ে বই লিখলেন এবং বইটি দেখতে দেখতে খুব সুনাম অর্জন করল এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেল।

আঁদ্রে ভেসেলিয়ঁ ইতালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর অ্যানাটমীর অধ্যাপক হলেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠায় ছাত্রদের পড়াতেন। তিনি যা দেখেছেন, তিনি যা পড়েছেন, তারই বিশদ ব্যাখ্যা করতেন ক্লাশে এবং ছাত্ররাও বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিত।

আঁদ্রে ভেসেলিয়ঁ লিখিত পুস্তক 'অন দি স্ট্রাকচার অফ হিউম্যান বডি' বইটি তখন বাজারে ভীষণ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বইটিতে সুন্দর সুন্দর ছবি আছে আর সেগুলি এঁকেছেন জ্যান স্টিফেন ভ্যান ক্যালসার।

দ্বিতীয় সংস্করণে আঁদ্রে সরাসরি গ্যালেনের মতামত খারিজ করে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন, গ্যালেন বলেছেন, শরীরের রক্ত সোজাসুজি ডান থেকে বাম দিকে যায় একথা স্বীকার করতে পারি না। আমি দেখেছি, হৃদপিণ্ডের মাঝখানে একটি পার্টিশন আছে এবং কোন মতেই ডান দিকের রক্ত সরাসরি বাঁ দিকে যায় না। মাঝখানের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে অন্যদিকে চলে যায়।

এই মতবাদের জন্য আঁদ্রেকে বহু কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় এবং বহু নিন্দাবাদ আরম্ভ হয়। আঁদ্রে সখেদে বলেন, আমি জানতাম, আমাকে এ সমালোচনা শুনতে হবে। কিন্তু একদিন আসবে যখন পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করবে আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণভাবে সত্য।

আঁদ্রে মনের দুঃখে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

॥ বারো ॥

শরীরের মধ্যে কীভাবে রক্ত চলাচল হয়, আজ প্রায় সকলের কাছেই সোজা কিন্তু বহুদিন ধরেই লোকের ধারণা ছিল, বুকের মাঝখানে একটা ছাকনি আছে, সেই ছাকনির ভেতর দিয়ে রক্ত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যায় এবং ছাকনির ভেতর দিয়ে যাবার সময় রক্ত পরিষ্কার হয়ে যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে বহু জ্ঞানীগুণী রক্ত চলাচলের আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রিয়ালডো কলম্বাস, মাইকেল সরিভিটাস, হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস এবং আন্দ্রেঁ সিসালপিনো। ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হারভে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত আসে শরীরের নানা জায়গা থেকে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যায় ফুসফুসে। সেখানে ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেনের সাহায্যে রক্ত পরিষ্কৃত হয়, তারপর আবার ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডে। হৃৎপিণ্ড পাম্প করে সেই রক্ত শরীরের মধ্যে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেয়, তারপর আবার ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডে। এইভাবে ক্রমাগত পাম্প করে চলেছে হৃৎপিণ্ড।

উলিয়াম হারভের জন্ম, দক্ষিণ ইংলণ্ডের ফোকস্টোন গ্রামে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে। ক্যাণ্টারবেরী এবং কেমব্রিজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে পাডুয়ায় গমন করেন মেডিসিন শিক্ষা গ্রহণের জন্য। পাডুয়ায় হারভের মাষ্টারমশায় ছিলেন হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস, যিনি অ্যানাটমি ও ফিজিওলজিতে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। হারভে পাডুয়া থেকে ইটালিতে যান এবং গ্রেট ইটালিয়ান ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে হারভে ইটালি থেকে ডাক্তারী পাশ করে আবার পাডুয়ায় ফিরে এলেন। সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে হারভে চাকরি নিলেন এবং রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান-এর লেকচারার হলেন। কিছুদিন পরে উইলিয়াম হারভে স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস এবং প্রথম চার্লস-এর চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। এই সময় রাজসভা থেকে হারভেকে একটি অদ্ভুত ধরণের কাজ দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে কাউকে ডাইনী বা ডাইনীর সহচরী বলে সন্দেহ করলে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হত হারভের কাছে। হারভের ওপর নির্দেশ ছিল, যাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের গায়ে কোন পোড়া বা ঘায়ের দাগ আছে কিনা লক্ষ্য করা। দাগ থাকলে তাকে ডাইনী বলে ঘোষণা করা হত। হারভে যতদিন পরীক্ষা করেছেন, একজনের গায়েও কোন কাটা দাগ দেখতে

পান নি বলে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। হারভের সময়ে একজনকেও ডাইনীর অপরাধে শাস্তি পেতে হয় নি।

হারভে তাঁর চিকিৎসাকার্যের মধ্যেই রক্ত চলাচল কি করে হয়, সে বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে বিভিন্ন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা শুরু করলেন। শূকর, ভেড়া, কুকুর, ব্যাঙ, সাপ, বাণ মাছ, ছোট ছোট মাছ, কাঁকড়া, শাঁখ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখলেন, রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে আর্টারির (Artary) ভেতর দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর আবার ভেন্ (Vein)-এর ভেতর দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে।

হারভে আবিষ্কার করলেন, হৃৎপিণ্ড একটি মাংসপেশীর গ্রন্থি। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চারটে খোপ আছে। ওপরের খোপ দুটির নাম অরিকূল (Auricle), নীচের খোপ দুটির নাম ভেন্ট্রিকূল্ (Ventricle), হৃৎপিণ্ড যখন স্ফীত হয় (Diastole), তখন ডানদিকের অরিকূলে রক্ত আসে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আর বামদিকের অরিকূলে রক্ত আসে ফুসফুস থেকে। বাম অরিকূল থেকে রক্ত ডান অরিকূলে যেতে পারে না, মাঝখানে পার্টিশন আছে। অরিকূল থেকে রক্ত ভেন্ট্রিকূলে চলে যায়। অরিকূল এবং ভেন্ট্রিকূলের মাঝখানে ভালবের পার্টিশন আছে। রক্ত একবার পার্টিশনের এপারে চলে এলে আর ওপারে ফিরে যেতে পারে না। রক্ত অরিকূল থেকে ভেন্ট্রীকূল-এ আসে। আবার যেই হৃৎপিণ্ডের সংকোচন (Systole) ঘটে, বাম ভেন্ট্রীকূল থেকে রক্ত এয়োর্টার (Aorta) মধ্যে দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আর ডান ভেন্ট্রীকূল থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে চলে যায়। হারভে আবিষ্কার করেন, আর্টারীর মাঝে মাঝে ভালব আছে, সেইজন্যে আর্টারীর মধ্যে রক্ত প্রবেশ করলে, সে রক্ত পেছন দিকে আর ফিরে আসতে পারে না, সে রক্তকে সামনের দিকেই যেতে হয় এবং ভেনের ভেতর দিয়ে আবার অরিকলে ফিরে আসে।

হারভের আবিষ্কারের খানিকটা বাকি থেকে গিয়েছিল, কারণ হারভের কাছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। শিরা-উপশিরাগুলি ক্ষুদ্র হতে হতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শেষ সীমায় এসে যেখানে ভেনের সঙ্গে আর্টারীর যুক্ত হয়, (Capillaries), সেই জায়গায় কি হয় সে কথা হারভে আবিষ্কার করতে পারেন নি। হারভে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারেন নি। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ফুসফুসে গিয়ে কী হয়, এ কথা হারভে বুঝতে পারেন নি। হারভেরও ধারণা ছিল,

অ্যারিসটটল-এর মত, সে রক্ত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে ঠাণ্ডা হয়, তারপর ঠাণ্ডা রক্ত হৃপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে।

হারভের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী একটা ধারণা ছিল, খুব মিহি একটা ছাঁকনি আছে বুকের মাঝখানে। সেই ছাকনির ডান দিক থেকে যখন বাঁ দিকে রক্ত যায়, তখন রক্ত পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কোন ভাইটাল স্পিরিট (pneuma) এই রক্ত পরিচালনা করে থাকে। গ্যালেন (Galen)-এর সময় থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বিচিত্র চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেছিলেন কি জন্যে, সে কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

হারভেও এক সময়ে বলেছিলেন, আমি ফ্রাকাস্টোরোর মত প্রথমে ভেবেছিলাম, হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি নির্ধারণ করেন স্বয়ং ভগবান।

উইলিয়াম হারভে প্রথম জেমস এবং প্রথম চার্লস-এর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময় ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। হারভে প্রথম চার্লস-এর সঙ্গে লণ্ডন ছেড়ে অক্সফোর্ডে পালিয়ে যান, এই সময়ে হারভের লণ্ডনের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর গবেষণার কাগজপত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়।

কথিত আছে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এজহিল যুদ্ধের সময় তিনি একটি ঘরের খাটের তলায় বসে বই পড়ছিলেন। যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষ চলে যায় তখন খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে আহত মানুষদের চিকিৎসা করেন।

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লস-এর মৃত্যুদণ্ড হবার পর উইলিয়াম হারভে লণ্ডনে ফিরে আসেন এবং তারপর সারা জীবন লণ্ডনেই ছিলেন। উইলিয়াম হারভে প্রাইভেট প্রাকটিসে অসাধারণ নাম করেছিলেন। ফ্রান্সিস বেকন-এর মত খ্যাতিমান লোকও হারভের রোগী ছিলেন।

উইলিয়াম হারভে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রক্ত চলাচল বিষয়ক গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত করেন। গ্রন্থটির বিষয় কিন্তু বহু আগেই হারভে 'রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান'-এ বক্তৃতা দেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করায় দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় হারভে বলেছিলেন, আমি আরও গবেষণা করে আরও প্রমাণাদি গ্রন্থে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলাম।

১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সকলে একসঙ্গে এক মতে উইলিয়াম হারভেকে রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান-এর প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত করেন, কিন্তু তিনি প্রবীণ বয়সের অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়াম হারভে দেহত্যাগ করেন।

।। তেরো ।।

—ম্যারি, ম্যারিয়ান, শিগগীর আয়, দেখে যা জল শুধু জল নয়। জলের মধ্যে কত ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা কিলবিল করছে।

নিজের তৈরি যন্ত্র থেকে চোখ তুলে মেয়েকে ডাকলেন অ্যানটনি ভ্যান লিউ এনহক।

ম্যারিয়ান কন্যা হলেও সে মাতৃসমা। সে পরম স্নেহে আধ পাগল বাবার পাশে এসে দাঁড়াল, তারপর বাবার তৈরি যন্ত্রের ওপর চোখ রাখল। সত্যিই জলের মধ্যে হাজার হাজার পোকা কিলবিল করছে। ম্যারিয়ান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। চোখ মুছে ভাল করে পরিষ্কার করে আবার দেখল, সত্যিই জলের মধ্যে পোকা কিলবিল করছে।

হল্যাণ্ডের ডেল্‌ফ্‌ শহর ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর। লিউ এনহকের বাবা ছিলেন ঝুড়ি আর মদের ব্যবসায়ী। মা ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠালেন, কিন্তু লিউ -এনহক লেখাপড়া করলেন না। বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গেলেন আমস্টার্ডাম শহরে শুকনো ফলের ব্যবসায় করতে। সেখানে বছর ছয়েক কাটিয়ে বাইশ বছর বয়সে আবার ফিরে এলেন ডেলফ-শহরে। এবার নিজেই ব্যবসায় শুরু করলেন। বিয়ে করলেন এবং ডেলফ শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কাজ নেন। এই সময়ে তিনি শুনেছিলেন, ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে কোন কিছু দেখলে সেগুলো নাকি অনেক বড় দেখায়। দিনের পর দিন লিউ এনহক কাঁচ ঘষে চলেছেন আর একটার পর একটা রেখে নীচের পদার্থ কত বড় দেখায় লক্ষ্য করে করে গেছেন। লক্ষ্য বলব না, তপস্যা বলাই উচিত। একদিন নয়, দু দিন নয়, কুড়ি বছর ধরে এই তপস্যায় মগ্ন ছিলেন লিউ এনহক।

কুড়ি বছর পরে তিনি যখন যন্ত্র থেকে মুখ তুলে তাকালেন, তখন তাঁর পাশে একমাত্র মেয়ে ম্যারিয়ান বর্তমান। আর সবাই কে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না।

লিউ এনহক লেখাপড়া জানতেন না বললেও অত্যুক্তি হবে না। সামান্য ডাচ ভাষা জানতেন। অন্য ভাষা জানতেন না। ইউরোপে তখন ল্যাতিন ভাষার প্রচলন। লিউ এনহক চলিত ডাচ ভাষায় একটা চিঠি লিখলেন বৃটেনের রয়্যাল সোসাইটিকে। সেই সঙ্গে চিঠি লিখলেন রেগিয়ন দ্যা গ্রাফ। তিনি রয়্যাল

সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি লিখলেন, লিউ এনহক যে যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তার ক্ষমতা ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে লক্ষ গুণ। আমি এর ভেতর ডিম্বাশয়ের শেষ দেখেছি! আপনারা ভ্যান লিউ এনহককে লিখুন তাঁর-আবিষ্কৃত যন্ত্রের বিষয় বিশদভাবে জানাতে।

চিঠি পড়ে সোসাইটির অধিকাংশ সদস্য বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু সব সদস্য সমান নন। কিছু সদস্য ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নিলেন না। তাঁরা সম্পাদককে অনুরোধ করলেন, লিউ এনহকের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করতে বললেন এবং তাঁর আবিষ্কারের বিষয় আরও বিশদ ভাবে লিখে জানাতে।

লিউ এনহক সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তিনি যখনই যা পেতেন সেই বিষয়ে চিঠি লিখে জানাতেন সোসাইটিকে। লিউ এনহক প্রায় তিনশ আটান্নটি চিঠি লিখেছিলেন রয়্যাল সোসাইটিকে। সোসাইটিও তার প্রত্যেকটির উত্তর দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করে আবিষ্কারের পথে এগিয়ে যেতে বলেছেন।

ডেলফ-এর লোকেরা কিন্তু লিউ এনহককে পাগল বলে ভাবতেন। কি যে করে লোকটা, কোন সময়ে জল দিচ্ছে, কোন সময়ে গোঁফ ছিঁড়ে, কোন সময়ে চুল ছিঁড়ে যন্ত্রের নীচে ফেলছে আর দেখছে। খেলনা যন্তরটা আঁকড়ে বসে থাকে সবসময়ে। কাউকে ছুঁতে দেবে না, কাউকে নিয়ে যেতে দেবে না। এস, চোখ লাগিয়ে দেখ, তারপর চলে যাও। একমাত্র ম্যারিয়ান বিশ্বাস করত তার বাবা এক বিরাট পণ্ডিত মানুষ। অসাধারণ মানুষ। তিনি যে যন্ত্র তৈরি করেছেন, তার কদর হয়ত এখনকার মানুষ দিতে পারবে না, কিন্তু ভবিষ্যত কালের মানুষ বুঝতে পারবে, তার বাবা কী অসাধারণ যন্ত্র আবিষ্কার করে গেছেন।

—দেখে যা। বৃষ্টির জলে কত ক্ষুদে ক্ষুদে জন্তু।

বাবার কথায় ম্যারিয়ান এসে যন্ত্রের কাঁচের ওপর চোখ রাখল। সত্যিই—ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা জলের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

লিউ এনহক চিন্তা করতে লাগলেন এগুলো এলো কোত্থেকে? আকাশ থেকে না মাটি থেকে অথবা ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেছেন।

একটা গ্লাস পরিষ্কার করে বৃষ্টির জল ভরলেন, তারপর সেই জল পরীক্ষা করলেন। এবার দেখলেন ক্ষুদে প্রাণীগুলো অনেক কম। এবার একটা পোর্সিলিনের বাটি বৃষ্টির জলে পরিষ্কার করে অনেক উঁচুতে বৃষ্টির জল ধরলেন, তারপর পরীক্ষা করলেন লিউ এনহক। এবার কোন পোকাই দেখতে পেলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন, এই ক্ষুদে পোকা বা জন্তুগুলো বৃষ্টির জলে থাকে না। থাকে

মাটিতে। মাটির জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে গেলে এই ক্ষুদে জন্তুগুলো জলের সঙ্গে মিশে যায়।

লিউ এনহক শিক্ষিত বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি কি দেখতে চান তিনি নিজেই জানেন না। কেন দেখতে চান তাও জানেন না, শুধু দেখেই চলেছেন। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর—'। কোন সময়ে মাটি, কোন সময়ে জল, কোন সময়ে কুয়োর জল, কোন সময়ে নর্দমার জল।

হঠাৎ খেয়াল—লঙ্কা ভিজিয়ে তাকে বেটে জল দিয়ে গুলে নিয়ে যন্ত্রের তলায় রেখে পরীক্ষা করলেন।

এতদিন দেখছিলেন, জল কেমন দেখায়, মাটি কেমন দেখায়, চুল দাড়ি কেমন দেখায় কিন্তু সেদিন দেখলেন ভেজানো লঙ্কা বাটায় হাজার হাজার জন্তু।

আবার ক্ষুদে জন্তুগুলোর কথা মাথার মধ্যে গজিয়ে উঠল। অনেকদিন চিঠি লেখা হয়নি সোসাইটিকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি দেখেছেন সে বিষয়ে যথাযথ লিখলেন। তিনি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না, সেই জন্যে কোন অলঙ্কার বা অতিশয়োক্তি করতে পারেন নি।

লিউ এনহকের বিরাট চিঠি সোসাইটিতে ইংরিজীতে তর্জমা করা হল এবং সমস্ত সদস্যদের পড়ে শোনানো হল। কয়েকজন সদস্য লিউ এনহকের বক্তব্যকে অবিশ্বাস করে বললেন—এ হতেই পারে না। এক ফোঁটা জলে এত ক্ষুদে পোকা কখনও থাকতে পারে না।

সোসাইটির প্রবীন সদস্যবৃন্দ এবং সম্পাদক বললেন—লিউ এনহক লেখাপড়া জানেন না একথা সত্য, কিন্তু এতদিন ধরে চিঠিতে যে সব কথা লিখেছেন, তার একটিও তো মিথ্যে হয়নি। অকারণে এই তথ্যই বা অবিশ্বাস করব কেন?

সোসাইটির কর্তৃপক্ষ লিউ এনহককে লিখলেন আরও বিশদভাবে তথ্য পরিবেশন করার জন্যে। লিউ এনহক চিঠির উত্তরে বিশদভাবে সমস্ত কথা লিখলেন এবং ডেলফ-এর নাগরিক, গীর্জার-পাদরি, আইনজ্ঞ, শিক্ষক সকলেই এই ক্ষুদে পোকা দেখেছেন এবং প্রয়োজন হলে তারা সাক্ষী দেবেন।

সোসাইটির কর্তৃপক্ষ লিউ এনহকের পদ্ধতিতে যন্ত্র তৈরী করলেন, মরিচ বাটার জল পরীক্ষা করে দেখলেন, লিউ এনহক সব কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলেছেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর এই রিপোর্ট পেশ করলেন সোসাইটির মিটিংএ। সদস্যরা চেয়ার ছেড়ে ভীড় করে সেই যন্ত্রের কাঁচে চোখ লাগালেন। যাঁরা

যাঁরা অবিশ্বাস করেছিলেন তাঁরাও চোখ রাখলেন এবং বিনা প্রতিবাদে লিউ এনহকের তথ্য মেনে নিলেন।

ডেলফ-এর অশিক্ষিত ফল বিক্রেতাকে তিন বছর পরে রয়্যাল সোসাইটির মাননীয় সদস্য পদে মনোনীত করে, রৌপ্যাধারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে দিলেন। অ্যানটনি ভ্যান লিউ এনহক রয়্যাল সোসাইটির সম্মানিত সদস্য হলেন।

লিউ এনহক অভিভূত হয়ে চিঠি লিখলেন—আমি যতদিন জীবিত থাকব, আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব।

রয়্যাল সোসাইটি লিউ এনহককে অনুরোধ করলেন, তাঁর তৈরি একটা যন্ত্র পাঠিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু লিউ এনহক সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি লিখলেন—যাঁর ইচ্ছা এসে দেখে যান, কিন্তু আমি কোন কিছুই পাঠাতে পারব না।

অগত্যা সোসাইটির অন্যতম প্রবীন সদস্য ডক্টর মলিনেঁ এলেন ডেলফ-এ লিউ এনহকের গৃহে। তিনি দেখলেন মন্তব্য করলেন—আপনার যন্ত্রটি আমাদের চেয়েও সুন্দর।

—এর চেয়েও আরও একটা ভাল যন্ত্র আছে। সেটা আমি আর ম্যারিয়ান ছাড়া আর কাউকে ছুঁতে দিই না।

ডক্টর মলিনেঁ প্রথম যন্ত্রটিতে চোখ রাখলেন ; কিন্তু দ্বিতীয় যন্ত্রটি শুধু দেখে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন।

লিউ এনহকের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের নাম দেওয়া হল মাইক্রোস্কোপ।

রাশিয়ার সম্রাট পিটার দি গ্রেট তাকে সম্মান জানানোর জন্য ডেলফ-এ এসেছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী তাঁর মাইক্রোস্কোপ দেখার জন্যে ডেলফ শহরে এলেন। ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমী তাঁকে মাননীয় সদস্যপদে মনোনীত করে সম্মানিত করেন।

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ৯১ বছর বয়সে লিউ এনহক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর বিদায় নেবার সময় এসে গেছে। শেষ পত্র দুটি রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। সেই চিঠি দুটির উত্তর শুনে যাওয়ার সময় হয়নি তাঁর। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অগাষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

চোদ্দ

নবযুগের বিশ্বাস, নবযুগের বিজ্ঞানের সূচনা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের মাটিতে। মহামতি গ্যালিলিও ইউরোপের বুকে চিন্তার স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। পিশা সহরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের পনেরোই ফেব্রুয়ারী গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্যালিলিও যখন পিশা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান তখন মনে মনে ইচ্ছে ছিল তিনি ডাক্তার হবেন। কিন্তু পড়তে পড়তে দেখলেন অঙ্কশাস্ত্র ও ফিজিক্স পড়তে ভাল লাগছে। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি পিশা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের বক্তৃতা দিয়ে সকলকে অবাক করে দিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলেন অ্যারিস্টটল-এর চিন্তাধারা ভ্রান্ত। তিনি তাঁর তৈরি দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করলেন গ্রহ ও তারার পার্থক্য। তারার আলো প্রদীপের শিখার মত জ্বল জ্বল করে, গ্রহের আলো সূর্যের কিরণে আলোকিত বলেই স্থির। তিনি অ্যারিস্টটল-এর মতকে নস্যাৎ করে দিলেন অতি সামান্য একটা পরীক্ষার মাধ্যমে। অ্যারিস্টটল-এর ধারণা উঁচু স্থান থেকে কোন পদার্থ ফেলে দিলে পৃথিবীর ওপর যখন পড়ে, তখন তার গতিবেগ নির্ভর করে বস্তুর ওজনের ওপর। ভারী বস্তু জোরে পড়ে, হাল্কা বস্তু ধীরে পড়ে। গ্যালিলিও পিশার বিখ্যাত হেলান গম্বুজের ওপর থেকে তিনটি বিভিন্ন ওজনের বস্তু একই সময়ে একই গতিতে ফেলে দিয়ে দেখলেন, একই সময়ে পৃথিবীর বুকে পড়ছে। অবশ্য বাতাসের প্রতিবন্ধকতাকে বাদ দিয়ে সময়ের হিসাব ধরা হয়েছিল। তিনি প্রমাণ করেছিলেন জুপিটার গ্রহের চারটি উপগ্রহ আছে। বর্তমানে আমরা জানি, জুপিটারের বারোটি উপগ্রহ আছে। গ্যালিলিও শনিগ্রহের বলয় প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তিনি অ্যারিস্টটল-এর বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানলেন। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, চাঁদ সমান। কিন্তু গ্যালিলিও প্রমাণ করে দিলেন চাঁদের উপরিভাগ পৃথিবীর মতই এবড়ো খেবড়ো। কোথাও পাহাড়, কোথাও খাদ আবার কোথাও সমতলভূমি। তিনি প্রমাণ করলেন, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করার জন্য তাঁকে বহুরকমের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, তবু তাঁর ঘোষণায় তিনি অটল ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি সূর্যের উপরিভাগ

পরীক্ষা শুরু করেন। অনেকের বিশ্বাস, তাঁর শেষ জীবনের অন্ধত্বের কারণ বার বার সূর্যের দিকে দূরবীক্ষণের মাধ্যমে তাকানো। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তবু তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যান। তিনি ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন।

গ্যালিলিও পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূচনা করেন বললে বোধহয় ভুল হবে না। অতীতের বিশ্বাস, কুসংস্কারের বুকে সাহসের সঙ্গে প্রথম বৈজ্ঞানিক আক্রমণ করেন মহামতি গ্যালিলিও।

এই সময়ে ডাচ দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সকলে অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। যতদূর জানা যায় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে হান্স লিপারশে নামক জনৈক ডাচ চশমা প্রস্তুতকারক আকস্মিকভাবে একটি টেলিস্কোপ তৈরি করে ফেলেন। তিনি চোখের কাছে একটি চশমার লেন্স ধরেন, আর একটু দূরে আর একটা ধরেন। দু-হাতে দুটো লেন্স ধরে তার মধ্য দিয়ে দেখতে গিয়ে আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। অনেক দূরের গীর্জাটা খুব কাছের মনে হচ্ছে। লিপারশে একটা ফাঁপা নলের দু-দিকে দুটো লেন্স লাগালেন। একটি চোখের দিকে, নাম দিলেন আইপিস, অপরটি দূরের দিকে, যার নাম দিলেন অবজেকট গ্লাস। যন্ত্রটির নাম দিলেন টেলিস্কোপ। স্কোপ কথাটি স্কোপোস কথা থেকে সৃষ্ট। গ্রীক ভাষায় স্কোপোস কথার অর্থ পর্যবেক্ষক।

লিপারশে নির্মিত টেলিস্কোপ মহামতি গ্যালিলিওর নজরে আসে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও লেখেন, 'আমার কানে আসে একজন ডাচম্যান এমন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছেন, যার ভেতর দিয়ে দেখলে অনেক দূরের বস্তু খুব কাছের বলে মনে হয়। আমি ভাবতে লাগলাম, ওই ধরনের একটা যন্ত্র কি করে তৈরি করা যায়।'

গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র লিপারশে আবিষ্কৃত যন্ত্রের অনুকরণে তৈরি। ডাচদেশের মানুষের আবিষ্কারকে সকলে শ্রদ্ধা করতেন বলেই ১৬৬০ খৃস্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি ভ্যান অ্যাণ্টন, লিউ এনহকের চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। পর পর চিঠি আসতে লাগল। একটি নয়, দুটি নয়, প্রায় চারশো চিঠি এসে পৌছল। প্রত্যেকটি চিঠি ডাচ ভাষায় লেখা, কারণ পত্রলেখক আর কোন ভাষা জানেন না। সব চিঠির ইংরিজী তর্জমা ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশনস-এ প্রকাশিত করা হল আর সেই সব আশ্চর্য চিঠি পড়ে বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়নের ঢেউ জেগে উঠল।

জল শুধু জল নয়। পত্রলেখক তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জলের ফোঁটা পরীক্ষা করে দেখেছেন। একবিন্দু জলের মধ্যে হাজার হাজার ক্ষুদে জানোয়ার অথবা অ্যানিম্যালকিউলস অথবা জীবন্ত পরমাণু দেখতে পেয়েছেন।

ডাচদেশের ডেল্ফট শহরে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ভ্যান অ্যাণ্টন লিউ এনহক-এর জন্ম। লেন্স-এর দোকানে কাজ করার সময় নানারকম লেন্স পরস্পর লাগিয়ে বহু দিনের চেষ্টায় যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করলেন, তার নাম দিলেন মাইক্রোস্কোপ।

লিউএনহক-এর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নব্যযুগ আরম্ভ হল। লিউ এনহক শুধু অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি, তার ব্যবহারও পরিপূর্ণভাবে করে গেছেন। তাঁকে পৃথিবীর মানুষ জীবাণুতত্ত্বের পিতা, সম্মানে ভূষিত করেছে। তিনি তাঁর পরীক্ষায় জানিয়েছেন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু দেখা যায়, যা সাধারণ চোখে দেখা কোনদিনই সম্ভব হত না।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে লিউ এনহক তাঁর আবিষ্কৃত মাইক্রোস্কোপের নীচে একটি ব্যাঙাচির ল্যাজ ধরে পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন ল্যাজের মধ্যে বহু শিরা-উপশিরার অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি তাঁর আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইতালির খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ মারসেলা ম্যাল-পিঘি শিরা উপশিরার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। লিউ এনহক একের পর এক আবিষ্কার করে গেছেন, তিনি জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি এক কোষ-বিশিষ্ট কীটাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটির সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

লিউ এনহক শারীরতত্ত্বের অনেকগুলো বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবের শুক্রকীট আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি রক্তের লোহিত কণিকার নিখুঁত তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন। তাঁর মতানুযায়ী মানুষ এবং স্তন্যপায়ী জন্তুর লোহিত কণিকা গোল, ব্যাঙ এবং মাছের লোহিত কণিকা ডিম্বাকৃতি।

রয়াল সোসাইটির আর একজন সভ্য, রবার্ট হুক লিউ এনহকের চিঠিগুলি খুব মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেন। তিনি লিউ এনহক-এর মাইক্রোস্কোপের ওপর খুবই আকৃষ্ট হন এবং লিউ এনহক-এর মাইক্রোসস্কোপে অনেকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজন করেন। তিনি কম্পাউণ্ড মাইক্রোসস্কোপ তৈরি করেন এবং এই মাইক্রোসস্কোপের সাহায্যে রবার্ট হুক কোষের আকৃতি দেখতে পান।

॥ পনেরো ॥

মাইক্রোসস্কোপ ব্যবহারে এই সময় আর একজন বৈজ্ঞানিক স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন। তাঁর নাম মারসেলো ম্যালপিঘি। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাঙের দেহ পরীক্ষা করে শিরা উপশিরার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। শরীরের স্বাভাবিক রং চামড়ার কোন স্তরে বিদ্যমান, তাও তিনি আবিষ্কার করেন। চামড়ার যে স্তরে শরীরের রং থাকে সেই স্তরকে আজও চিকিৎসকরা ম্যালপিঘির সম্মানার্থে ম্যালপিঘিয়ান স্তর বলে থাকেন। ম্যালপিঘি শরীরের নানা তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি মস্তিস্কের গ্রে ম্যাটারএর বিন্যাস আবিষ্কার করেছিলেন। কিডনী, লিভার, স্পলীন-এর বিভিন্ন স্তর আবিষ্কার করেন। ম্যালপিঘি দ্বাদশ ইনসেণ্ট পোপ-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ম্যালপিঘির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার তথ্য কথা লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির প্রবন্ধগুচ্ছ থেকে পাওয়া যায়। রয়াল সোসাইটি তাঁকে ১৬৬৮ খৃস্টাব্দে ফেলো হিসেবে মনোনীত করেন।

জান সোয়ামারডাম আর একজন ডাচদেশীয় বৈজ্ঞানিক যিনি কীট-তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। সোয়ামারডাম চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু কোনদিন তিনি প্রাকটিশ করেননি। সারা জীবন তিনি পাগলের মত কীট ধরেছেন, তাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করেছেন, আর এলো-মেলোভাবে খাতায় লিখে রেখেছেন। মৌমাছির শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন, মাছি, জোঁক প্রভৃতি ক্ষুদে প্রাণীর দেহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনকালে এসব কথা কেউ জানতে পারেনি। সোয়ামারডাম ১৬৩৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৮০ খৃস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

সোয়ামারডামের মৃত্যুর অনেক বছর পরে ডাচ চিকিৎসক হারমান বোরহাভে সোয়ামারডামের বিভিন্ন প্রবন্ধ সংগ্রহ করেন এবং ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে সমস্ত প্রবন্ধ 'দি বাইবেল অফ নেচার' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সোয়ামারডাম নিজে নিজে অনেক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। ছোট্ট ছুরি, ফরসেপস, কাঁচি দিয়ে তৈরি করেছিলেন, যা দিয়ে মৌমাছি প্রভৃতি ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করতেন।

গ্যালিলিও বোধহয় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন পৃথিবীর

আদিকাল থেকে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর মেয়েদের বনের মধ্যে বন্দী করে রাখা হত, সেইসব মেয়েদের চোখের জল ঝরণা হয়ে বেরিয়ে আসত। স্প্যালানজানির অস্থির মন শান্ত হয়নি বরং বিশ্বাস করেনি বাবার অবিশ্বাস্য কৈফিয়ত। অবশ্য কোন তর্ক করেনি সে বাবার সঙ্গে, নিঃশব্দে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

একদিন ল্যাজারো বনের মধ্যে প্রকৃতির আশ্চর্য ব্যাপারের কারণ খুঁজছিল। এমন সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সৌম্য ভদ্রলোক। এক গাল পাকা দাড়িতে আরও সুন্দর লাগছিল। ভদ্রলোক ল্যাজারোকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কে?

—ল্যাজারো। ল্যাজারো স্প্যালানজানি।

—তোমার বাবা মিঃ স্প্যালানজানি? তাঁকে খুব ভালভাবে চিনি। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ল্যাজারোর পাশে বসে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে একা একা কি করছ?

—আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন।

—কি তোমার প্রশ্ন?

—এই যে পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা এল কোত্থেকে?

—তোমার বাবা কি বলেন?

—তিনি এড়িয়ে যান।

—গির্জার পুরোহিতরা?

—তাঁরা বলেন, এ সব ঈশ্বরের সৃষ্টি।

—সে কথা বিশ্বাস করতে দোষ কি?

—কি করব বলুন? ও কথায় আমার মন সায় দেয় না। আমার নিজের বিশ্বাস এ সবের উত্তর কোথাও না কোথাও লুকোন আছে। তাই খুঁজতে এখানে এসে বসে থাকি।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি পড়?

—আইন।

—আইন কেন?

—বাবা যে আইন ছাড়া কিছু পড়তে দিতে চান না।

ভদ্রলোক শুধু বললেন—এসো আমার সঙ্গে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ল্যাজারো স্প্যালানজানি তার বাড়িতে এল। স্পালানজানির

বাবা আগন্তুককে দেখে বিস্মিত এবং সশ্রদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি! আপনি?

—হ্যাঁ। আমি এসেছি আপনার ছেলের বিষয়ে দু' একটা কথা বলতে।

ল্যাজারোর পিতা করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন—আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। ছেলেমানুষ ভেবে ওকে ক্ষমা করুন মিঃ ভ্যালিসনীয়ারি।

ল্যাজারো স্প্যালানজানির বুকের ভেতরটা ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। বিজ্ঞানী ভ্যালিসিনিয়ারির নাম তখন ইটালীর ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত।

ভ্যালিসিনিয়ারি ল্যাজারোর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার বাবার সঙ্গে একটু গোপন কথা আছে।

ল্যাজারো কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ল্যাজারো বেরিয়ে যাবার পর ভ্যালিসিনিয়ারি ল্যাজারোর বাবাকে বললেন—ছেলের ভবিষ্যৎ এভাবে নষ্ট করছেন কেন?

—তার মানে?

—আপনার ছেলের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্তা ঘুমিয়ে আছে। আইন পড়িয়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন কেন?

—ও পারবে? আপনি বলছেন?

—বলছি মিঃ স্প্যালানজানি। আপনি যদি আমার উপদেশ শোনেন, দেখবেন আপনার ছেলে একদিন গ্যালিলিওর মত বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে।

—বেশ! আপনার কথাই শিরোধার্য।

ঈশ্বরের দূত হয়ে যেন মিঃ ভ্যালিসিনিয়ারি স্প্যালানজানির জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আইন শাস্ত্র থেকে বিজ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ল্যাজারো স্প্যালানজানি! লিউ এনহক আবিষ্কৃত মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ল্যাজারো দিনরাত বসে থাকেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে জীবাণুর অস্তিত্ব দেখতে পান দিনের পর দিন। এ তথ্য নতুন কিছু নয়। লিউ এনহক নিজেই ঘোষণা করে গেছেন—জলের মধ্যে জীবাণু আছে তার সেই তথ্য পৃথিবীর সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু জীবাণু আসে কোত্থেকে? এসব জীবাণুর কি কাজ? এসব প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি লিউ এনহক। তার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ল্যাজারো ল্যাবরেটরীতে অস্থিরভাবে গবেষণা করেন, আর ভাবেন কই কোন সমাধানই তো পাচ্ছি না। তাহলে কি জীবাণু ঈশ্বরের সৃষ্টি?

ইউরোপের বুকে সে সময়ে জ্ঞানের বিপ্লব চলেছে। সনাতনপন্থী মানুষের

ধারণা, ঈশ্বরই সব! ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছুই ঘটতে পারে না। বিপরীতপন্থী মানুষের দল বলতেন, ওসব বুজরুকি! আসলে গীর্জার ক্ষমতা আটকে রাখার জন্যেই ও ধরণের মতবাদ ছড়ানো হয়।

ল্যাজারো স্প্যালানজানি অস্থির ভাবে গবেষণা করেন আর নিজের ব্যর্থতার কথা ভাবেন। যতদূর চিন্তা করেন গভীর অন্ধকার। কোথাও কোন আশার আলো দেখতে পান না।

এমন সময় আকস্মিকভাবে ফ্রানসেস্কো রেডি লিখিত একটি পুস্তক ল্যাজারো স্প্যালানজানির হাতে এসে পড়ে। রেডি প্রমাণ করেছিলেন, মাছি থেকে মরা সাপে ম্যাগট পোকা হয়। মাছি ম্যাগটের ডিম বহন করে আনে আর তা থেকে ম্যাগট জন্মায়।

ল্যাজারোর মাথায় বিদ্যুতের মত চিন্তা খেলে গেল। জীবাণুর ডিম আছে। অথবা মা-বাবা আছে। জীবন থেকেই জীবাণুর জন্ম ঘটে।

প্রায় একই সময়ে নীডহাম নামের একজন গোঁড়া ক্যাথলিক ইংলণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, জীবাণু মাংসের রস থেকে সৃষ্টি হয়। তিনি খানিকটা মাংস উত্তপ্ত অবস্থায় উনুন থেকে নামিয়ে জারের মুখে ছিপি এঁটে দিলেন। কয়েকদিন পরে দেখা গেল মাংসের ওপর জীবাণু সৃষ্টি হয়েছে। নীড্হাম ঘোষণা করলেন মাংসের জুস থেকে জীবাণু সৃষ্টি হচ্ছে।

ইটালীতে বসে ল্যাজারো নীডহামের পরীক্ষার ফলাফল পড়লেন। কিন্তু তাঁর মন এই উপসংহারে সায় দিল না। তাঁর অবিশ্বাসী মনে নীডহামের পরীক্ষার ফল কোন কিছুই সাড়া জাগাতে পারল না। তাঁর মনে হল, এই পরীক্ষার মধ্যে কোথাও একটা বিরাট ফাঁক আছে। —কিন্তু জীবাণু এল কোত্থেকে? ল্যাজারো স্প্যালানজানি চিন্তা করে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, হয় নীডহাম ভালভাবে ছিপি বন্ধ করেন নি নইলে মাংসখণ্ড ঠিকভাবে সিদ্ধ করেন নি।

ল্যাজারো স্প্যালানজানি মাংস সেদ্ধ করে জারে পুরে জারের মুখ আগুনে পুড়িয়ে সীল করে দিলেন। কয়েকদিন পরে পরীক্ষা করে দেখলেন, মাংসের ওপরে জীবাণু জন্মায়নি। ল্যাজারো ঘোষণা করলেন, নীডহামের সিদ্ধান্ত ভুল। জার-গুলির মুখ ভালভাবে না লাগানোর জন্য এবং মাংস ভাল করে সেদ্ধ না করার জন্য জীবাণু বাইরের বাতাস থেকে জারের মধ্যে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করেছে।

নীডহাম প্রতিবাদে জানালেন, ল্যাজারো অতিরিক্তভাবে গরম করার জন্যে ঐশ্বরিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এই ঐশ্বরিক শক্তি হল ভেজিটেটিভ ফোর্স।

ল্যাজারো প্রতিবাদের উত্তর দেবার জন্যে আবার পরীক্ষা নিরীক্ষায় বসলেন। পরপর অনেকগুলি জার সাজিয়ে কতকগুলিতে নীডহামের পদ্ধতিতে মাংসপিণ্ড রাখলেন এবং ছিপি বন্ধ করলেন। বাকিগুলি নিজের পদ্ধতিতে সীল করে দিলেন। জারগুলি দশ মিনিট থেকে শুরু করে দু ঘণ্টা পর্যন্ত গরম করলেন তারপর ঠাণ্ডা করতে দিলেন।

কয়েকদিন পরে দেখলেন ছিপি আঁটা জারগুলিতে জীবাণু সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সীল করা জারগুলিতে জীবাণু সৃষ্টি হয়নি। ল্যাজারো ঘোষণা করলেন, অতিরিক্ত সেদ্ধ করেও ছিপি আঁটা জারে জীবাণু সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু অল্প সময়ের জন্য সেদ্ধ করে সীলকরা জারে জীবাণু সৃষ্টি হয়নি। এই থেকে প্রমাণিত হয় ছিপি আঁটা জারে বাতাস প্রবেশ করছে। আর বাতাসের সঙ্গে জীবাণুও প্রবেশ করছে। ছিপি আঁটা জারে বাতাস প্রবেশ করছে, তার প্রমাণ কোথা? নীডহাম শেষ প্রতিবাদ জানালেন। এই প্রতিবাদকে খণ্ডন করার জন্যে ল্যাজারো আবার পরীক্ষা শুরু করলেন। অনেক রকমের পরীক্ষার পর সামান্য একটি পরীক্ষায় সফল হলেন। একটি আগুনের শিখা ছিপি আঁটা বোতলের মুখের কাছে ধরে দেখলেন শিখাটি বোতলের ভেতর দিকে যাচ্ছে। ল্যাজারোর পরীক্ষা সকলে মেনে নিলেন। নীডহামের পরাজয় ঘটল। ল্যাজারো স্প্যালানজানির জয় সর্বত্র।

ল্যাজারো স্প্যালানজানির কাছে নানা অভিনন্দনপত্র আসতে শুরু করল। অস্ট্রিয়ার রানী ম্যারিয়া থেরেসা ল্যাজারোকে জানালেন, তিনি যদি লোমবাডি শহরের প্যাভিয়া ইউনিভারসিটির ন্যাচারাল হিস্ট্রির পদ নেন, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন। প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি অতি প্রাচীন, কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ন্যাচারাল হিস্ট্রি ক্যাবিনেটের প্রাচীন মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও ল্যাজারোকে নিতে হবে।

ল্যাজারো সেই পদ গ্রহণ করলেন, দেখতে দেখতে প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি আবার জমজমাট হয়ে উঠল। ইউনিভারসিটিকে দাঁড় করিয়ে ল্যাজারো স্প্যালানজানি দেশ ভ্রমণে বার হলেন আর সেই দেশভ্রমণই তাঁর জীবনের কাল হল।

স্প্যালানজানি যখন দেশ ভ্রমণ করছিলেন, তখন স্ক্যাণ্ডিয়ানোর জনৈক নাগরিক ক্যানন ভল্টা ল্যাজারোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তুললেন। ল্যাজারো স্প্যালানজানির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি প্যাভিয়া ইনস্টিটিউটের মিউজিয়াম

থেকে বহু মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে স্ক্যাণ্ডিয়ানোর বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

দেশভ্রমণ বাতিল করে ল্যাজারো স্প্যালানজানি ফিরে এলেন। মামলা দীর্ঘদিন চলল, পরিশেষে তিনি জয়লাভ করলেন। কিন্তু ভগ্নহৃদয় এবং স্বাস্থ্য আর ভাল হল না।

১৭৯৯ খৃস্টাব্দে ল্যাজারো স্প্যালানজানি দেহত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি শতাব্দীর অবসান ঘটল।

॥ সতেরো ॥

এডওয়ার্ড জেনারের জন্ম ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে। এডওয়ার্ডের বাবা ছিলেন এক ধর্মযাজক। এডওয়ার্ড জেনার একুশ বছর বয়সে লণ্ডনে সেণ্ট জর্জেস হাসপাতালে কাজ শিখতে যান এবং সেখানে খ্যাতনামা চিকিৎসক জন হাণ্টারের ছাত্র হিসেবে কাজ করতে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবেন। ডাঃ হাণ্টার একজন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কোন তথ্যই নিজে বিচার না করে স্বীকার করতে রাজি হতেন না। এই কারণে নানারকমের মারাত্মক রোগের জীবাণু নিজের শরীরে প্রবেশ করিয়ে অল্পকালের মধ্যেই স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েন। তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি। মৃত্যুর আগে জেনারকে বলেন—নিজের গ্রামে গিয়ে প্রাকটিশ কর।

এডওয়ার্ড ফিরে এসে প্রাকটিশ শুরু করলেন এবং যতদিন মাষ্টারমশায় বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর সঙ্গে চিঠি পত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

এডওয়ার্ডের মাথায় একটা কথা প্রায়ই ঘুরপাক খেত। তিনি গ্রামের লোকদের মুখে শুনতেন যার গো-বসন্ত হয়েছে তার নাকি বসন্ত হয় না। এই কথাটা তিনি গুরু হাণ্টারকে লিখেছিলেন, উত্তরে হাণ্টার লিখেছিলেন—হতাশ হবে না। তুমি যা বিশ্বাস কর, পরীক্ষা করে দেখ, একদিন না একদিন সফল হবে।

১৪ই মে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ।

ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার—ডাক্তারখানায় বসে রোগী দেখছিলেন। এমন সময় গোয়ালিনী সারা নেমস হাতের একটা ফোস্কা নিয়ে এসে ডাক্তারবাবুকে বলল—ডাক্তারবাবু দেখুন তো এটা কী হয়েছে?

জেনার লক্ষ্য করে বললেন—এটা বসন্ত হয়েছে।

গোয়ালিনী প্রতিবাদের কণ্ঠে বলল—তা কি করে হবে? আমার তো গো-বসন্ত হয়ে গেছে।

হাজার হাজার বিদ্যুতের ঝলক জেনারের মস্তিষ্কে। এতদিন তিনি অন্ধকারে ঘুরছিলেন, এবার তিনি আলোর সন্ধান পেয়েছেন।

সেই সময়ে জন্ ফিপস্ নামের একটি দশ বছরের ছেলে চেম্বারে বসেছিল। জেনার তার মা বাবাকে বললেন—আপনারা যদি অনুমতি দেন ফিপ্সের শরীরে নেমসের পুঁজ ঢুকিয়ে দেব।

ফিপসের মা বাবা কিছুক্ষণ পরামর্শ করলেন, তারপর অনুমতি দিলেন।

১৪ই মে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ।

ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার নেমসের ক্ষত থেকে খানিকটা পুঁজ নিয়ে ফিপসের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন। ফিপসের হাতের চামড়া ছুরি দিয়ে চিরে সারার পুঁজ ঢুকিয়ে দিলেন জেনার। তিনি দেখবেন সত্যিই গো বসন্ত বসন্তরোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে কি না।

একমাস পরে জেনার জনের শরীরে আসল বসন্তের বীজ ঢুকিয়ে দিলেন। জনের বসন্ত হল না। আবার একমাস পরে বসন্তের বীজ ঢোকালেন। এবারও কোন রোগ হল না। একের পর এক রোগীকে গো বসন্তের টীকা দিলেন ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার আর প্রত্যেকের বেলাতেই দেখা গেল তাদের বসন্ত রোগ হয়নি। জেনার স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে গো বসন্তের টীকা দিলে শরীরে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মায় এবং তাঁদের বসন্ত রোগ হয় না।

সাতাশ জন রোগীর ইতিবৃত্ত নথিভুক্ত করে ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন। রয়্যাল কলেজ এই ইতিবৃত্ত মানলেন না এবং জেনারকে এ ধরণের কাজ করতে নিষেধ করলেন।

জেনার ভ্রূক্ষেপ করলেন না, তিনি তাঁর রিপোর্ট প্রকাশ করে দিলেন। এই রিপোর্ট পড়ে শত্রু মিত্র সকলেই জেনারকে অপমান করলেন, কেউ বা ব্যঙ্গ-চিত্র বার করলেন, কেউ বা বিদ্রূপ করে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। জেনার কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল, অনড়। তিনি যা সত্য বলে জেনেছেন, তা থেকে কখনও বিচ্যুত হবেন না। এমন কি নিজের সন্তানকেও তিনি বসন্তের টিকা দিয়ে বসন্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

অবশেষে সারা দেশের লোক বুঝতে পারলেন, জেনারের আবিষ্কৃত টীকা দিয়েই বসন্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

১৮০২ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার জেনারকে দশহাজার পাউণ্ড সাহায্য দিলেন রিসার্চ করার জন্যে। ১৮০৬ সালে দিলেন কুড়ি হাজার পাউণ্ড। সরকার তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করলেন। নেপোলিয়ন তাঁকে প্রশংসাপূর্ণ চিঠি দিলেন। রাশিয়ার জার দিলেন সোনার আংটি। বিভিন্ন দেশ থেকে মূল্যবান উপঢৌকন এল তাঁর কাছে, তাঁর এই আবিষ্কারের জন্যে। ল্যাটিন ভাষায় গরুকে বলা হয় ভেক্কা, সেইজন্য জেনারের আবিষ্কৃত ওষুধের নাম দেওয়া হল ভ্যাকসিন।

স্যার এডওয়ার্ড জেনার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেহত্যাগ করেন। তাঁর নশ্বর দেহ বিলীন হয়ে গেলেও আজও তিনি টীকা আবিষ্কারের জন্য অমর।

॥ আঠারো ॥

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্টেথোস্কোপ ব্যবহারের আবিষ্কারক ডাক্তার রেনে-থিয়োফাইল হায়াসিনথে লেনেক। ফরাসী বিপ্লবের একটি রেজিমেণ্টের লেনেক প্রায় আকস্মিক-ভাবে চিকিৎসকদের অতি প্রয়োজনীয় স্টেথোস্কোপ আবিস্কার করে ফেলেছিলেন।

স্টেথোস্কোপ ব্যবহারের পূর্বে, চিকিৎসকরা রোগী রোগিণীদের হৃদপিণ্ড, ফুস-ফুস প্রভৃতি অংশ পরীক্ষা করতেন হাত আর কান দিয়ে। হৃদপিণ্ড বা ফুসফুসের-ওপর হাত রেখে পরীক্ষা করে সেই অংশের পরীক্ষা করতেন অথবা সরাসরি ওই অঙ্গের ওপর কান রেখে হৃদপিণ্ডের কাজ শুনতেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লেনেক কি করে স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করলেন, সে বিষয়ে নিজেই লিখেছেন—আমি একটি রোগিণী দেখতে গিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং অল্পবয়স্কা। তাঁর উপসর্গের কথা শুনে মনে হল তিনি হৃদপিণ্ডের অসুখে ভুগছেন। আগে আমরা হৃদপিণ্ডের ওপর হাত রেখে শব্দ অনুভব করতাম অথবা বুকের ওপর সরাসরি কান রেখে শব্দ শুনতাম, কিন্তু রোগিণীর বয়স বিবেচনা করে তাঁর বুকের ওপর কান রাখতে সংকোচ বোধ করলাম। কি উপায়ে রোগিণীর হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করা যায় ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ আমার খেয়াল হল ছোটবেলায় কাঠের বরগার এক প্রান্তে কান লাগালে, অন্য প্রান্তে একটি পিন বাজালে পিনের শব্দ পরিষ্কারভাবে শোনা যায়। ভাবলাম, এই ধরনের

কোন উপায় বার করতে পারলে হয়ত রোগিণীর পরীক্ষা ভালভাবে হতে পারে।

'আমি একটা লম্বা কাগজ নিলাম, সেটাকে পাকিয়ে পাইপের মত করলাম। তারপর সেই কাগজের পাইপ রোগিণীর বুকের ওপর লাগিয়ে অন্যদিকে কান লাগিয়ে শুনতে পেলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম, আনন্দে আমার বুক নেচে উঠল। বুঝতে পারলাম, সরাসরি কান লাগিয়ে যত পরিষ্কার শোনা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার কাগজের চোঙার মাধ্যমে শোনা যায়।'

রেঁনে থিয়োফাইল-হায়াসিনথে লেনেক বারো ইঞ্চি লম্বা কাঠের অথবা বাঁশের চোঙা দিয়ে রোগী দেখার প্রবর্তন করলেন। তিনি এই যন্ত্রের নাম দিলেন স্টেথোস্কোপ। গ্রীক ভাষায় স্টেথো কথার অর্থ বুক এবং স্কোপ কথাটি এসেছে গ্রীক স্কোপোস কথা থেকে যার অর্থ পর্যবেক্ষক। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লেনেক তাঁর প্রবন্ধে ষ্টেথোস্কোপ ব্যবহারের কথা লেখেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক চিকিৎসক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য ষ্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে থাকেন এবং ষ্টেথোস্কোপ চিকিৎসকের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের অন্যতম হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। লেনেক ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে চিকিৎসাশাস্ত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। লেনেক-এর ষ্টেথোস্কোপ আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত করেছিল একথা অনস্বীকার্য। ঠিক একই সময়ে ডাক্তার উইলিয়াম বোম্যাণ্ট মানুষের পাকস্থলীর হজমের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করে দেখেন।

উইলিয়াম বোম্যাণ্ট আমেরিকার সীমান্তরক্ষী সৈনিকদের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে থাকতেন এবং কেউ আহত হয়ে পড়লে যথাযথ চিকিৎসা করতেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ছয় জুনে আলেকসিস সেণ্ট মারটিন নামের একজন যুবক বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে পড়েন। ডাক্তার বোম্যাণ্ট ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যে অকুস্থলে পৌছে যান এবং দেখেন মারটিনের পেট বন্দুকের গুলতে ফুটো হয়ে গেছে। আর সেই ফুটো দিয়ে পাকস্থলির খানিকটা বেরিয়ে আসে। ডাক্তার বোম্যাণ্ট সাধ্যমত চিকিৎসা করে রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। সেণ্ট মারটিন সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু পাকস্থলীর ফুটোটা একই ভাবে রয়ে গেল। ফুটোর ভেতর দিয়ে পাকস্থলীর ক্ষতটা পরিষ্কার ভাবে দেখা যেতে লাগল। বোম্যাণ্ট-এর কথানুযায়ী ক্ষতটির ব্যাস আড়াই ইঞ্চি। ডাক্তার বোম্যাণ্ট ফুটোর ভেতর দিয়ে

পাকস্থলীর ভেতরের অংশ পরিষ্কারভাবে দেখতেন, পাকস্থলীর অংশ নড়ছে তাও দেখতেন। হঠাৎ একদিন ডাক্তার বোম্যাণ্টের মাথায় এল ওই ফুটো দিয়ে যদি খাবার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত হজমের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাবে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পয়লা আগষ্ট বেলা বারোটার সময় রান্না করা খানিকটা গরুর মাংস, শূয়োরের মাংস, এক টুকরো পাউরুটি খানিকটা বাঁধাকপি সেদ্ধ একটা সিল্কের সুতোয় বেঁধে গর্ত দিয়ে পাকস্থলীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। বেলা একটার সময়, মানে ঠিক এক ঘণ্টা পরে, সুতো ধরে টেনে বার করে পরীক্ষা করে দেখলেন কপি এবং পাউরুটি অর্ধেকটা হজম হয়েছে। মাংসের টুকরো অবিকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি আবার খাবারগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেলা দুটোর সময়, আবার খাবার বার করে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন কপি, পাঁউরুটির টুকরো, শুয়োরের মাংস এবং সেদ্ধ গোমাংস সম্পূর্ণ হজম হয়ে গেছে এবং সুতো থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বোম্যাণ্ট একটি ছোট বই লেখেন, 'অবজারভেশনস অব দি গ্যাসট্রিক জুস অ্যাণ্ড দি ফিজিওলজি অফ ডাইজেশন'। সেদিন বইখানি ছাপানোর জন্য কোন প্রকাশক পাওয়া যায়নি এবং বোম্যাণ্ট নিজের খরচে প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের মধ্যে পাকস্থলীর রসক্ষরণের বিষয় লেখা ছিল এবং বর্তমান যুগের শারীরতত্ত্ব বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা এই পুস্তকের তথ্যের ওপর নির্ভর করে লিখিত। সম্ভবতঃ বোম্যাণ্ট-এর লেখা পুস্তকই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম একক লিখিত পাকস্থলীর রসক্ষরণের তথ্যবহুল পুস্তক।

সমসাময়িক সময়ে প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির কার্যকারিতাও আবিষ্কৃত হয়েছিল। ফরাসী চিকিৎসক ক্লড বার্নার্ড সেণ্ট জুলিয়ান নগরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শারীরতত্ত্ববিদ্ ফ্রাঙ্কোইস ম্যাগেনডি-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ শেষ করেন। দশ বছর পরে বার্নার্ড ডক্টর অফ সায়ান্স হন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাগেডি অবসর গ্রহণ করলে ডক্টর বার্ণার্ড শারীরবিদ্যার অধ্যাপক পদে ভূষিত হন।

ডাক্তার বার্ণার্ড প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির কার্যকারিতা আবিষ্কার করেন। যকৃতের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য আবিষ্কার করেন। লিভারের মধ্যে গ্লুকোস থেকে গ্লাইকোজেন সৃষ্টিও বার্নার্ড আবিষ্কার করেন, তবে তিনি সঠিক কোন নাম দিতে পারেননি। তিনি নামকরণ করেছিলেন 'ইণ্টারনাল সিক্রিশন'। বার্নার্ড

আরও একটি জটিল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। শিরা-উপশিরার স্থিতিস্থাপকতা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। ভেসোডায়লেটর নার্ভস উত্তেজিত হলে রক্তশিরার স্ফীতি ঘটে এবং ভেসোকনস্ট্রিক্টর নার্ভস-এর উত্তেজনায় রক্তশিরার সংকোচন ঘটে। ডাক্তার বার্নার্ড জীবিতকালে বহু সম্মানের অধিকারী হন এবং ফ্রেঞ্চ বাওলজিকাল সোসাইটির প্রথম সভাপতি পদে ভূষিত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটলে প্যারিস শহরে বিরাট শোকযাত্রা বার হয় এবং বহু জনসাধারণ অশ্রু বিসর্জন করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোকে বিকশিত হতে সুরু করল। এতদিন চিকিৎসাবিজ্ঞান খানিকটা আন্দাজে, খানিকটা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে চালিত হত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পুরোভাগে একসঙ্গে অনেকগুলি আবিষ্কার ঘটে যাওয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের গতি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর পুরোভাগে আর একটি আশ্চর্যজনক প্রগতি ঘটে চিকিৎসাজগতে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বোস্টন শহরের বোস্টন সোসাইটি ফর মেডিকেল ইমপ্রুভমেণ্ট সভায় চিকিৎসক, কবি, প্রাবন্ধিক ডাক্তার অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'চিকিৎসক এবং সেবিকাগণ অসাবধানতার জন্য একজন রোগিণী থেকে আর একজন রোগিণীর দেহে রোগ সংক্রামিত করে দেন। তার কারণ কি? তার প্রধানতম কারণ চিকিৎসক এবং সেবিকাগণ রোগিণীদের পরীক্ষা করার আগে নিজেদের হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলেন না, ফলে রোগের সৃষ্টি হয়।

পেনসিলভানিয়া ইউনিভারসিটির প্রসূতিবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার চার্লস মিগ হোমস-এর মন্তব্যের প্রতিবাদ করে জানালেন, এ ধরনের মন্তব্য চিকিৎসক এবং সেবিকাদের পক্ষে অপমানজনক। ব্যক্তিগত কারণে সমস্ত চিকিৎসক ও সেবিকাদের নামে অপবাদ ছড়ানো হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। ডাক্তার হোমস তার উত্তরে আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধে লিখলেন, প্রসবের পর আঁতুড় থাকাকালীন সময়ে শিশু এবং প্রসূতির যে জ্বর হয়, তার প্রধানতম কারণ চিকিৎসকের স্বাস্থ্যজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা। তিনি এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন, সেণ্ডেরীন নামের জনৈক প্রসূতিবিজ্ঞান বিশারদ প্রত্যেকবার রোগিণী পরীক্ষার আগে 'ক্লোরাইড অফ লাইম' দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। তার ফলে তাঁর রোগিণীদের ভেতর মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম।

রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যতম নায়ক, যাঁকে হোমস সেণ্ডেরীন নামে ঘোষণা

করেছিলেন, তাঁর প্রকৃত নাম ইগর্নাজ ফিলিপ সেমেলউইস। ফিলিপ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারির বুডাপেষ্ট-এ জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনাতে ডাক্তারী পাস করেন। ডাক্তারী পাস করার পর তিনি ভিয়েনার একটি হাসপাতালের সহকারী চিকিৎসক হন। এই হাসপাতালে দুটি বিভাগ ছিল, একটি বিভাগে মেডিকেল ছাত্ররা শিক্ষালাভ করত। অন্যটিতে নার্সিং শিক্ষা দেওয়া হত। প্রথম বিভাগে ছ' বছরের ভেতর প্রতি হাজার রোগিণীর ভেতর নিরানব্বই জনের মৃত্যু ঘটত আর দ্বিতীয় বিভাগে ঘটত তেত্রিশ জনের। ফিলিপ পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে পরীক্ষা করে দেখলেন, ছাত্র বা নার্সেরা পর পর রোগিণীদের প্রসব হবার পূর্বে বা পরে পরীক্ষা করেন। কিন্তু নিজেদের হাত পরিষ্কার করেন না। তিনি প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে ক্লোরাইড অফ লাইম দিয়ে হাত ধোবার রীতি প্রবর্তন করলেন। ফলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেল এবং মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে মাত্র বারোজনে নেমে এল।

ফিলিপ অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন বলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা হল না। তিনি সব ছেড়ে দিয়ে বুডাপেস্ট-এ ফিরে গেলেন কিন্তু সেখানেও বনিবনা হল না। সব জায়গা থেকে আঘাত আসার জন্য তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেল এবং ইগর্নাজ ফিলিপ পাগল হয়ে গেলেন। ১৮৬৫ সালে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হল এবং পরীক্ষায় দেখা গেল যে রোগের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন সেই বিষাক্ত রোগের জীবাণু দ্বারা তিনি আক্রান্ত। চিকিৎসা করেও কোন লাভ হল না। তিনি অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

॥ উনিশ ॥

চিকিৎসাজগতের উন্নতি সাধনে উনবিংশ শতাব্দীর তপস্যা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল উচ্চারিত। ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে কোন ওষুধ আকস্মিক-ভাবে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। কোন ওষুধ হয়ত দীর্ঘকালের সাধনায় আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু হয়েছে। মানুষকে অমর করে তোলার সংগ্রাম অনলস ভাবে করে গেছেন নমস্য ব্যক্তিরা, আজও করছেন ভবিষ্যতেও করবেন।

১৮৪৬ সালের ১৬ই অকটোবর ব্যাধি বিদায় প্রসঙ্গের একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিন ম্যাসাচুটেসএ 'ইথার ডে' উৎসব পালিত হয়েছিল। সেদিন জনসাধারণকে প্রকাশ্যভাবে দেখানো হয়েছিল, ইথার দিয়ে কীভাবে অপারেশনের যন্ত্রণা লোপ করে ফেলা যায়। বোষ্টন শহরের ম্যাসাচুটেস জেনারেল হাসপাতালে সালফিউরিক ইথারের প্রক্রিয়া প্রকাশ্যভাবে দেখানো হয়েছিল।

'ইথার ডে' প্রবর্তনের আগে রোগী রোগিণীকে অপারেশন করা সমস্যাপূর্ণ ছিল। আফিংএর জল খাইয়ে বেহুঁশ করে রোগীকে অপারেশন করা হত, অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে সুরাপান করিয়ে অপারেশনের কাজ সারা হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীরা অতিরিক্ত রকমের বেহুঁশ হয়ে পড়ত এবং মৃত্যু ঘটত। মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি ছিল বলেই, সার্জনরা বেহুঁশ করতে চাইতেন না, বিনা অ্যানেস্থেসিয়াতেই অপারেশন করে দিতেন। কয়েকজন মিলে রোগীকে চেপে ধরতেন, যাতে নড়তে না পারে, আর ইত্যবসরে সার্জন অপারেশন করে ফেলতেন। এই অবস্থাতে কোন সার্জনই নিখুঁতভাবে অপারেশন করতে পারেন না এবং দীর্ঘস্থায়ী কোন অপারেশনও সম্ভবপর হয় না। আজকের যুগে তিন চার ঘণ্টা ধরে সার্জনরা যে সমস্ত অপারেশন নির্বিঘ্নে করে থাকেন, সে যুগে সে ধরনের অপারেশন করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না।

ইথার অ্যানেস্থেটিকস রূপে ব্যবহৃত হবার আগে থেকেই পরিচিত ছিল। চিকিৎসক এবং রসায়নবিদরা অন্যভাবে ইথারের ব্যবহার করতেন কিন্তু ইথার যে এত সুন্দর এবং নিরাপদ অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি।

হারভার্ড মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা যখন আনন্দ উৎসব করতেন, তখন নানা রকম আনন্দের মধ্যে নেশা করাও একধরণের আনন্দ ছিল। ছাত্রদের

মধ্যে অনেকে ল্যাবোরেটরী থেকে ইথারের শিশি লুকিয়ে এনে, ইথার শুঁকে নেশা করতেন। ডাক্তার চার্লস থমাস জ্যাকসন, হারভার্ড মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি, প্রায়ই ছেলেদের উৎসবে উপস্থিত থাকতেন এবং লক্ষ করতেন যে সব ছাত্ররা ইথার শুঁকে নেশা করেন, তাঁরা সাময়িকভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান। ডাক্তার জ্যাকসন সালফিউরিক ইথার নিয়ে গবেষণা স্বরু করেন এবং অ্যানেস্থেসিয়ার কাজে কতটা লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ে কাজ স্বরু করেন। এই সময়ে ডাক্তার উইলিয়াম টি জি মর্টন নামক জনৈক ডেন্টিস্ট রোগীদের বেহুঁশ করে দাঁত তোলার একটি ওষুধের খোঁজ করছিলেন। ডাক্তার উইলিয়ামের পার্টনার এবং বন্ধু ডাক্তার হোরেস ওয়েলস নাইট্রাস অক্সাইড যাকে সাধারণ ভাষায় লাফিংগ্যাস বলা হয়, তাই দিয়ে রোগীদের অজ্ঞান করে দাঁত তুলতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় লাফিংগ্যাস ব্যবহার করার সময় একটি রোগী মারা যায়, ফলে ডাক্তার হোরেস প্র্যাকটিস ছেড়ে দেন। মর্টন সেইজন্যে অন্য একটি ওষুধের সন্ধান করছিলেন, যা দিয়ে ব্যাথার উপশম ঘটে এবং অনায়াসে রোগীর দাঁত তোলা সম্ভব হয়।

ডাক্তার মর্টন ইথারের কথা শুনে ভাবতে লাগলেন ইথার দিয়ে রোগীকে বেহুঁশ করা যায় কি না। তিনি ম্যাসাচুটেস জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র সার্জন ডাক্তার জন কলিনস ওয়ারেন এর কাছে গিয়ে দরবার করে জানালেন, একটি রোগীকে যদি অপারেশন করার সময় ইথার দিয়ে বেহুঁশ করার সুযোগ দেন, তাহলে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অনেক বোঝাবার পর ডাক্তার ওয়ালেস মত দিলেন। স্থির হল ১৮৪৮ সালের ১৬ই অকটোবর যে রোগীর অপারেশন করবেন, তাকে ইথার দিয়ে বেহুঁশ করা হবে।

অবশেষে দিন এল। যথাসময়ে পেশেণ্টকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসা হল। ডাক্তার জন কলিনস, ওয়ারেন এবং দেশের যত প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক সবাই এসেছেন অপারেশন থিয়েটারে। প্রকাশ্যভাবে সেদিন ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, একটী আশ্চর্যজনক ওষুধের প্রতিক্রিয়া সেদিন দেখানো হবে। এই অত্যাশ্চর্য ওষুধটির দ্বারা, যে কোন রোগী বা রোগিণীকে কোনরকম যন্ত্রণা অনুভব করতে না দিয়ে অপারেশন করা সম্ভব হবে।

সময় পার হয়ে গেল। সকলেই উপস্থিত হয়েছেন, অনুপস্থিত কেবল ডাক্তার মর্টন। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পরেও যখন ডাক্তার মর্টন এলেন না, তখন ডাক্তার ওয়ারেন বিদ্রূপভাবে বললেন—তিনি বোধহয় অন্য কোথাও ব্যস্ত আছেন।

আর অপেক্ষা না করে ডাক্তার ওয়ারেন অপারেশন করতে যাবেন, ঠিক সেই সময়ে ডাক্তার মর্টন ঘরে ঢুকলেন। ডাক্তার ওয়ারেন ডাক্তার মর্টনের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে রূঢ় স্বরে বললেন—এই নিন আপনার পেশেণ্ট রেডি।

ডাক্তার কয়েক মিনিট ধরে পেশেণ্টকে ইথার শোঁকাবার পরই, পেশেণ্ট বেহুঁশ হয়ে পড়ল, এবং ডাক্তার মর্টন মৃদু হেসে পরিহাস ছলে বললেন—নিন স্যার, আপনার পেশেণ্ট রেডি।

ওয়ারেন অপারেশন করা সুরু করলেন। নির্বাক বিস্ময়ে দর্শক-মণ্ডলী সেই আশ্চর্য অপারেশনের দৃশ্য অবলোকন করলেন। পেশেণ্ট-এর কাঁধের কাছে একটি টিউমার ছিল। সেই টিউমার অপারেশন করলেন ডাক্তার ওয়ারেন। সেদিন যদি পেশেণ্টএর মৃত্যু ঘটত, তাহলে ইথার আবিষ্কার হয়ত আরও এক শতাব্দী পেছিয়ে যেত। কিন্তু সেদিনের অপারেশন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হল। ধীরে ধীরে রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। সকলের প্রশ্নের উত্তরে রোগী একবাক্যে স্বীকার করলেন, না—তিনি কোন যন্ত্রণা উপলব্ধি করেননি। ডাক্তার ওয়ারেন সকলকে জানিয়ে দিলেন—ডাক্তার মর্টন মোটেই বুজরুকি করেন নি। ইথার দিয়ে অজ্ঞান করা রীতিমত একটি আবিষ্কার।

চার্লস থমাস জ্যাকসন এবং উইলিয়াম মর্টন একসঙ্গে ইথারকে পেটেণ্ট করার চেষ্টা করলেন। নাম দিলেন লেথিডন। তাঁরা ঠিক করলেন, যে সমস্ত চিকিৎসক ইথার দিয়ে অজ্ঞান করা পেশেণ্টএর অপারেশন দেখবেন, তাঁদের অনেক টাকা দর্শণমূল্য দিতে হবে। টাকা দিলে অপারেশন দেখবার জন্য পারমিট দেওয়া হবে এবং সেই পারমিট পেলে, অপারেশন দেখবার সুযোগ ঘটবে। কিছুদিন পরেই সমস্ত চিকিৎসক জানতে পারলেন, নতুন লেথিডন ওষুধ সালফিউরিক ইথার ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্যাকসন এবং মর্টন দুজনেই দাবী করলেন, ইথারের প্রথম আবিষ্কারক হিসাবে। জ্যাকসন ও মর্টন এর মধ্যে মনোমালিন্য হবার দরুণ দুজনে আলাদা হয়ে গেলেন। দুজনেই পৃথকভাবে দাবী জানালেন ইথারের ব্যবহার তিনিই প্রথম অ্যানেস্থেটিক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। একই সময়ে ডাক্তার হোরেস ওয়েলস, যিনি নাইট্রাশ অকসাইড ব্যবহার করতেন, তিনি দাবী করলেন তিনি এনেস্থেটিক ব্যবহারের প্রথম অবিষ্কারক।

ডাক্তার মর্টন ১৮৪৯ সালে আবেদন করলেন, তাঁর আবিষ্কারের জন্য তাঁকে যেন পুরস্কার দেওয়া হয়। আমেরিকান কংগ্রেস আবেদন নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক করলেন, ঠিক সেই সময় জ্যাকসনের আবেদনও পৌঁছে গেল।

হোরেস ওয়েলস তখন মারা গেছেন, তবু তাঁর নামও উঠল। কয়েক বছর ধরে এই সমস্যার সমালোচনা চলল, অবশেষে কংগ্রেস স্থির করলেন মর্টনকে এক লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় একজন সিনেটর প্রতিবাদ করে জানালেন জর্জিয়ার ডাক্তার ক্রফোর্ড লং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একটি অপারেশনে ইথার ব্যবহার করেছেন। ডাক্তার লং-এর পেশেণ্ট জেমস ভেনাবেল শপথ নিয়ে ১৮৪৯ সালে ঘোষণা করলেন যে ইথার শুঁকে তারা আনন্দ উপভোগ করতেন এবং ভেনাবেলও ইথার শুঁকতে ভালবাসতেন। ভেনাবেল-এর পিঠের ওপর দুটো টিউমার ছিল এবং প্রায়ই তিনি ডাক্তার লংকে অপারেশন করে দিতে বলতেন। অত্যধিক যন্ত্রণা পাবার ভয়েই বার বার অপারেশনের দিন পেছিয়ে দেওয়া হত। শেষ পর্যন্ত ১৮৪২ সালের প্রথম দিকে একটা দিন সাব্যস্ত হল। অপারেশনের কিছুক্ষণ আগে থেকে ভেনাবেল ইথার শুঁকতে শুরু করেন তারপর কি ঘটে তিনি জানেন না। জ্ঞান হবার পর টিউমার দুটো দেখানোর পর তিনি বিশ্বাস করেন, তায় অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের সময় তিনি বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করেননি।

ভেনাবেল-এর শপথ বাক্য ঘোষণার পর কংগ্রেস পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। মর্টন তাঁর আবিষ্কারের জন্য শুধু একটী অনরারি ডিগ্রী ও একটি সোনার মেডেল ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডমি অফ সায়ান্স থেকে পেলেন। ডাক্তার মর্টন গভীর হতাশ্বাসে ১৮৬৮ সালে দেহত্যাগ করলেন।

প্রকৃতপক্ষে কে ইথার অ্যানেস্থেটিক হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেছেন সে সংবাদ রহস্যের মধ্যেই থেকে গেছে। যাই হোক ইথার ব্যবহারের কথা দেখতে দেখতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। বৃটিশ সার্জন জেমস সিম, জেমস সিম্পসন প্রভৃতি বিজ্ঞানেও অ্যানেস্থেসিয়ার ব্যবহার আরম্ভ করলেন।

১৮৪৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর ডাক্তার সিম্পসন ঘোষণা করলেন, ফরাসী কেমিস্ট জিন ব্যাপটিস-অ্যান্দ্রে ডুমা কর্তৃক আবিষ্কৃত ক্লোরোথারসও ইথারের মতই নিরাপদ অ্যানেস্থেটিক। ডাক্তার সিম্পসন ক্লোরোফরম শুঁকিয়ে ব্যথাবিহীন প্রসব করাতেন। ডাক্তার সিম্পসনকে ধর্মযাজকগণ নানারকম বিরূপ সমালোচনা করতে শুরু করলেন। পাদ্রীরা ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন ডাঃ সিম্পসন ধর্মদ্রোহী। বাইবেলে বর্ণিত আছে ঈশ্বর নারীকে ব্যথা দান করেন সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য। সিম্পসন ১৮৪৭ সালে পাদ্রীদের এই অভিযোগের উত্তর দেন, কিন্তু কিছুতেই ধর্মযাজকদের ক্ষান্ত করতে পারলেন না।

১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে কুইন ভিকটোরিয়ার সপ্তম সন্তান রাজকুমার লিওপোল্ড জন্মগ্রহণ করলেন। রানী ভিকটোরিয়া প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, যন্ত্রণা কমিয়ে দেবার কাতর প্রার্থনা করলেন। চিকিৎসক উপায়ান্তর না পেয়ে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে রানীকে বেহুঁশ করে সন্তান ভূমিষ্ঠ করালেন। আশ্চর্যের বিষয় যেদিন থেকে রানী ভিকটোরিয়াকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে সন্তান প্রসব করানো হল, সেদিন থেকে ধর্মযাজকরা একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে সারা বিশ্বে অ্যানেস্থেসিয়ার প্রচলন বহাল হ'লো—হওয়া শুরু হল।

॥ কুড়ি ॥

একটি আশ্চর্য চরিত্র, যে চরিত্রের অনুকরণ হতে পারে না, যে চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

জার্মানীর ছোট্ট শহর উল্স্টিন্। গ্রাম্য চিকিৎসক রবার্ট কক। ঘোড়ায় চড়ে শহরে গ্রামে গঞ্জে প্রাকটিশ করে বেড়ান। কোনদিন বাড়িতে ফেরেন আবার দু তিন দিন দেখাই নেই। স্ত্রী এমি ফ্রাজ স্বামীর প্রত্যাশায় বসে থাকেন আর উৎকণ্ঠায় রাত কাটান। এমি ফ্রাজ বিয়ের পর অবশ্য এমি কক। তিনি দিনরাত ভাবেন কী করে স্বামীকে ঘরে বেঁধে রাখা যায়।

বিয়ের সাতাশ বছর পার হয়ে আটাশ বছর আসছে। এমি ঠিক করলেন আটাশতম বিবাহবার্ষিকীর রাতে স্বামীকে একটি মাইক্রোস্কোপ উপহার দেবেন। মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে অন্ততঃ কিছুক্ষণ সে ঘরে থাকবে। স্বামীকে ঘরে বেঁধে রাখার আর কোন উপায় মাথায় এল না শ্রীমতি এমি ককের।

১৮৭৩ সালে স্ত্রী মাইক্রোস্কোপটি দিলেন স্বামীকে আর সেই মুহূর্ত থেকে বিজ্ঞান জগতে কী অসাধারণ অধ্যায় রচনার সূত্রপাত করলেন, সেকথা স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না ভদ্রমহিলা।

রবার্ট কক ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। রবার্টের বাবা রবার্টকে গোটিঁক্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান ডাক্তারী পড়বার জন্যে। ডাক্তারী পাস করার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হ্যানোভার ও হালবুর্গ হাসপাতালে কিছুদিন কাজ করার পর সেনাদলে যোগ দেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর উপাধি নিয়ে

উপস্থিত হলেন। অধ্যাপক কন-এর উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় বহু বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের ছাত্র উপস্থিত হলেন কক্এর বক্তৃতা শুনতে। প্রফেসর কন্ বক্তৃতামঞ্চে উঠে রবার্ট কক্এর পরিচয় দেবার সময় বললেন—রবার্ট কক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন, তিনি একজন গ্রাম্য চিকিৎসক, কিন্তু নিজের নিষ্ঠায় ও অধ্যবসায়ে তিনি যা আবিষ্কার করেছেন, তা নিশ্চিতভাবে যুগান্তকারী।

নবীন আবিষ্কারক রবার্ট কক, প্রবীণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভিরকাও। ডঃ ভিরকাও তখন শুধু প্রবীণ নন, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। নতুন চিন্তাধারা মস্তিষ্কে ধরে রাখার ক্ষমতা আর তাঁর নেই। তিনি খুব সুস্থ মনে রবার্টের আবিষ্কার স্বীকার করে নিতে পারলেন না।

রবার্ট দমলেন না। তিনি নতুন নতুন জীবাণু আবিষ্কারে মন দিলেন। যক্ষ্মা রোগ কেন হয় তার খোঁজ আরম্ভ করলেন রবার্ট কক। তিনি একটি রোগীর মৃতদেহ পেলেন যে যক্ষ্মা রোগে সদ্য মারা গিয়েছে। তার দুটো ফুসফুসই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে যক্ষ্মার আক্রমণে। রবার্ট কক সেই রোগীর ফুসফুসের অংশ কেটে নিয়ে পরীক্ষাগারে ঢুকলেন। নানারকম রং দিয়ে স্লাইডগুলো রং করতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত মেথিলিন ব্লু রং দিয়ে রং করে যক্ষ্মার জীবাণু দেখতে পেলেন। লম্বা লম্বা, রডের মত জীবাণু।

আবার গবেষণা, আবার অনুসন্ধান। অবশেষে ১৮৮২ সালের ২৪শে মার্চ বার্লিনে ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটিতে রবার্ট কক্এর বক্তৃতা পড়া হল। অধ্যাপক ভিরকাও নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। রবার্ট কক্এর জয়বার্তা সর্বত্র। অখ্যাত গ্রাম্য-চিকিৎসক রবার্ট। অখ্যাত গ্রাম্য-চিকিৎসক রবার্ট কক বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন ১৮৮২ সালের ২৪শে মার্চ।

এরপর রবার্ট কক আবিষ্কার করেন কলেরা রোগের জীবাণু। এই জীবাণুগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে কমার (,) মত দেখায় বলে এর নাম হল কমা জীবাণু। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন কলেরার জীবাণু নিয়ে গবেষণা করার জন্যে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে আসেন প্লেগ কমিশনের নেতা হয়ে। ১৯০৫ সালে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাফল্যের জন্য রবার্ট কক নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১০ সালের ২৮শে মে বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক রবার্ট কক দেহত্যাগ করেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।

স্ত্রীর উপহার একটি মাইক্রোস্কোপ পৃথিবীর বিজ্ঞান ইতিহাসে কী অমর অধ্যায় সৃষ্টি করে গেল।

॥ একুশ ॥

পল আর্লিক।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী নাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে নব্যযুগের সূচনা করলেন পল আর্লিক। বর্তমানকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে পদ্ধতিকে বলা হয় কেমোথেরাপি, তারই আদি জনক পল আর্লিক।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পল আর্লিক জার্মানীর সাইলেশিয়া প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। পলের বাবার একটি সরাইখানা ছিল, কিন্তু তিনি তা ভালভাবে চালাতে পারতেন না। পলের মা সব দেখাশোনা করতেন এবং ছেলের পড়ার তদারকি করতেন।

আর্লিক স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ব্রেসলো ইউনিভারসিটিতে ভরতি হলেন। সেখানে কিছুদিন পড়ে চলে গেলেন স্ট্রামবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে আবার ফ্রাইবার্গ ইউনিভারসিটিতে।

অস্থিরমতি পল আর্লিক সবসময়ে নতুন কিছু করার জন্যে পাগল। রবার্ট কক-এর অ্যানথ্রাক্স বিষয়ে বক্তৃতা শুনে ভাবলেন কেউ করেনি এমন কিছু করতে হবে। এনিলিন রং নিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরণের কোষ রঙ করতে লাগলেন। পল আর্লিক এ কথাও অনুধাবন করেছিলেন শুধু রং করলেই হবে না, লেখাপড়াও করতে হবে। তিনি ব্রেসলো ইউনিভারসিটি থেকে এম. ডি. পাস করে আবার কোষ রং করার কাজে লাগলেন। এবার কাজ নয়, গবেষণা। তিনি নিজেকে পুরোপুরি গবেষণায় ডুবিয়ে দিলেন।

রক্তের মধ্যে শ্বেতকণিকা আছে। পল্ আর্লিক এই কণিকাগুলির শ্রেণী বিভাগ আবিষ্কার করলেন। কোন শ্বেতকণিকা অ্যাসিড রঙে রঙীন হয়ে ওঠে, কোনও শ্বেতকণিকা বেসিক রঙে রঙীন হয় আবার কোন শ্রেণীর শ্বেতকণিকা নিউট্রাল রঙের রঙীন হয়। এই প্রভেদ অনুসারে ইয়োসিনোফিল, বেসোফিল এবং নিউট্রোফিল শ্রেণীর শ্বেতকণিকা আবিষ্কৃত হল। এ আবিষ্কার একেবারে মৌলিক আবিষ্কার।

১৮৮২ সালের রবার্ট কক এর বিখ্যাত যক্ষ্মারোগের জীবাণু সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে পল আর্লিক যক্ষার জীবাণু রঙ করলেন। রঙ করে শুকোতে দেবার সময় ভুলক্রমে চুল্লীর আগুন গরম হয়ে ওঠে। পরদিন পরীক্ষা করে দেখলেন জীবাণু

উলস্টিনে এসে প্রাকটিশ শুরু করলেন আর লাগামছাড়া প্রাকটিশ থেকে সরিয়ে আনার জন্যেই এমি উপহার দিলেন মাইক্রোস্কোপ।

মাইক্রোস্কোপ পেয়ে ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন কক। দিনরাত চোখে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে বসে থাকেন। এমিও খুশি। স্বামীকে এবার অনেকক্ষণ কাছে পাওয়া যাবে। রবার্ট কক কিন্তু ক্রমশঃই কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মাইক্রোস্কোপের মধ্যে কি দেখেন তিনিই জানেন কিন্তু স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন এ কথা এমি মনেপ্রাণে অনুভব করতে লাগলেন। রবার্ট যখনই সুযোগ পান, তখনই বিভিন্ন পশুর রক্ত পরীক্ষা করে দেখেন মাইক্রোস্কোপের নীচে।

এমি চিন্তায় পড়লেন। রোগীর সংখ্যা কমতে লাগল, সংসার চলা দায় হয়ে উঠল। রবার্টের ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি রক্ত পরীক্ষা করেই চলেছেন। একদিন অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত একটি ভেড়ার রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। রক্তের মধ্যে ছোট ছোট কালো কালো রঙের মত পদার্থ দেখতে পাচ্ছেন।

রবার্ট ছুটলেন। তাজা ভেড়ার রক্ত সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলেন। কই! নেই তো! সেই কালো কালো রঙের মত পদার্থ নেই।

এই রঙগুলিই কি তাহলে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু, না অন্য কিছু? দেখতে হবে। নিজের কাছেই নিজে কৈফিয়ৎ দিলেন, তারপর এমিকে ডেকে বললেন— আমাকে রিসার্চ ল্যাবোরেটরী করে দাও।

ছোট ছেলে আবদার করলে মা যেমন আদর করে সেই আবদার পূরণ করেন, তেমনি আদর করে এমি কক চেম্বারের একপাশে কাঠের পার্টিশান করে ছোট্ট একটা ছেলেভুলোন রিসার্চ ল্যাবোরেটরী করে দিলেন।

গৃহলক্ষ্মী নিজের অজান্তে আর এক মহাকীর্তি করে বসলেন। সেই ছোট্ট ল্যাবোরেটরীতে যে রিসার্চের শুরু তার শেষ হয়েছিল পৃথিবীর দিক দিগন্তে ছড়িয়ে যাবার পর।

রবার্ট কক একবার নয়, দুবার নয়, বার বার অ্যানথ্রাক্স রোগে মরা ইদুরের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন সবকটা স্লাইডেই কালো রঙ পাওয়া যাচ্ছে, তারপর ভাবতে লাগলেন এই জীবাণু সুস্থ ইদুরের খায়ে ঢুকিয়ে দিলে অ্যানথ্রাক্স রোগ হয় কি না। তাঁর অপরিণত সস্তা ল্যাবোরেটরীতে গোটা কয়েক কাঠি চেঁচে ছুলে পরিষ্কার করে অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত পশুর রক্ত মিশিয়ে দিলেন, তারপর রাতভোর জেগে সকালবেলায় সুস্থ ইদুরের লেজ কেটে, সেই রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন কাঠির রক্ত।

পরদিন সকালে অবাক বিস্ময়ে রবার্ট কক দেখলেন ইঁদুরগুলো মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। রবার্ট এক একটি করে ইঁদুরের রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন, প্রত্যেকটি প্রাণীর রক্তের মধ্যে রয়েছে কালো রঙ। ইঁদুরের প্লীহা কেটে পরীক্ষা করে দেখলেন, তারও মধ্যে কালো রঙ রয়েছে। এই রঙের আকারের জীবাণু-গুলিই তাহলে অ্যানথ্রাক্স রোগ সৃষ্টি করে।

আরও প্রমাণ চাই। চিকিৎসক রবার্ট কক পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন। এই জীবাণুগুলি কি জীবিত? না মৃত? জীবিত হলে এদের আবার কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যেতে পারে। তিনি কসাইখানা থেকে সদ্য কাটা বলদের চোখ এনে, তাতে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু স্পর্শ করিয়ে কিছুটা তরল পদার্থের মধ্যে রেখে অন্য একটি স্লাইড চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা করে দেখলেন অ্যানথ্রাক্স জীবাণু রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে আরও অনেক রকমের জীবাণু দেখা যাচ্ছে। রবার্ট বুঝতে পারে ভালভাবে যত্ন না নেওয়ার জন্যে বাতাস থেকে আরও অনেক রকমের জীবাণু পাত্রের মধ্যে মিশে গেছে।

শুধু অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুর চাষ কিভাবে করা যায়? রবার্ট দিনরাত ভাবেন। এমি ক্রমশঃ স্বামী সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন, যা হোক করে সংসার চলবে, ও যেভাবে রিসার্চ করছে করুক। রবার্ট কক অক্ষিগোলকের তরল পদার্থ আর অ্যান্থ্রাকস রোগে মরে যাওয়া একটা ইঁদুরের প্লীহা একটা কাঁচের ছোট বাটির মধ্যে রাখলেন, তারপর বাটির মুখ কাঁচের স্লাইড চাপা দিয়ে মোম দিয়ে এঁটে দিলেন। এইভাবে রাখার জন্যে বাইরের বাতাস অক্ষিগোলকের তরল পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারবে না।

এবার তিনি সফল হলেন। দুদিন পরে মাইক্রোস্কোপের তলায় পরীক্ষা করে রবার্ট দেখলেন শুধু অ্যানথ্রাকস রোগের জীবাণু রয়েছে। রবার্ট কক শুধু এইটুকুর জন্যেই অমর হয়ে গেলেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরীতে জীবাণু সৃষ্টির পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। সেই তরল পদার্থ সুস্থ ইঁদুরের লেজ কেটে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং লক্ষ্য করলেন সব কটি ইঁদুরই অ্যানথ্রাক্সে মারা গেছে। একবার নয়, দুবার নয় বার বার পরীক্ষা করলেন কক, বার বারই একই ফল পেলেন। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রবার্ট কক বার্লিনে অধ্যাপক কনের কাছে চিঠি লিখলেন। চিঠি পেয়ে প্রফেসর কন্ রবার্ট কককে বার্লিনে আসার জন্যে লিখলেন।

রবার্ট কক অধ্যাপকের চিঠি পেয়ে তাঁর যৎসামান্য সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বার্লিনে

গুলো আরও ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। সেকথা তিনি ককেকে লিখে পাঠালেন এবং রবার্ট কক পলের পরীক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে সঠিক আবিষ্কার বলে অভিমত প্রকাশ করলেন।

পল কী করবেন নিজেই ঠিক করতে পারেন না। একবার এ কাজ করেন, একবার চুপচাপ বসে থাকেন আবার ও কাজ করেন। এর মধ্যে তাঁর যক্ষারোগ হল এবং মিশরে চেঞ্জে গিয়ে সারিয়ে নিয়ে এলেন।

রবার্ট কক পল আর্লিককে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ককের বিজ্ঞানাগারে তখন ডিপথেরিয়া এবং টিটেনাস রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিনের গবেষণা চলছিল। কক এর এক সহকারী বেরিং একদিন পল আর্লিককে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কি করে এই ভ্যাকসিন তৈরি করা যায় বল দেখি ?

আর্লিক সরল বিশ্বাসে বললেন—এতো খুব সহজ। অল্প অল্প ডিপথেরিয়া রোগের বিষ ঘোড়ার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দাও। কিছুদিন পরে সেই ঘোড়ার রক্তের সিরাম থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন পাবে।

বেরিং পদ্ধতিটি চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দিলেন এবং অর্থকরী লেনদেন এর সময়েও এক পয়সাও দেননি পলকে।

১৮৯৬ খৃস্টাব্দে পল আর্লিক জার্মানের জাতীয় সিরাম ইনস্টিটিউটের সর্বময় কর্তা হন। এই সময়ে তিনি নিজের ইচ্ছে মত কাজ করতে পারতেন। আবার রঙ নিয়ে গবেষণা। অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষার পর আবিষ্কার করলেন এক রকমের রঙ। যার নাম ট্রাইপটান রেড। এই রঙ স্লিপিং সিকনেস রোগের জীবাণু বধ করে। ঘুমরোগ আফ্রিকায় হত এবং হাজার হাজার লোক এই রোগে মারা যেতেন। পলের আবিষ্কৃত ওষুধে সেই রোগ সেরে উঠতে লাগল এবং সকলে পল আর্লিকের ওষুধের নাম দিল ম্যাজিক বুলেট।

ঘুমরোগের ওষুধ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পল আর্লিকের ভাগ্যলক্ষীও সুপ্রসন্ন হলেন। ফাউ স্পেয়ার নাম্নী এক ধনী বিধবা প্রচুর টাকা দান করলেন আর্লিককে নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণার জন্যে।

আর্লিক সেই-টাকার কিছু অংশ দিয়ে গবেষণাগার তৈরি করলেন, বাকী টাকায় দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

পল আর্লিক এবার কাজ আরম্ভ করলেন আর্সেনিক নামক এক ভয়ঙ্কর বিষ নিয়ে। আর্সেনিক থেকে বিভিন্ন ধরণের কম্পাউণ্ড তৈরি করেন আর তাঁর গুণাগুণ

দেখেন। একটিও কম্পাউণ্ড তিনি ফেলে দিতেন না। কাজ হোক আর নাই হোক কম্পাউণ্ডের নম্বর দিয়ে তুলে রাখতেন। তাঁর এক সহকারী লক্ষ্য করলেন ৪১৮ নম্বর কম্পাউণ্ড ঘুমরোগে ভাল ফল দিচ্ছে।

এখানেই থামলেন না পল আর্লিক। আরও কম্পাউণ্ড তৈরি করে চললেন। প্রায় দু বছর পরে পলের জাপানী সহকারী ডাঃ হাতা দেখলেন ৬০৬ নম্বর কম্পাউণ্ড উপদংশ (সিফিলিস) রোগে খুব ভাল ফল দিচ্ছে। পল আর্লিক নিজে দেখলেন তারপর নতুন ভাবে গবেষণা শুরু করলেন। একাধিক গবেষণায় যখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তখন এই গবেষণার ফলাফল ১৯১০ সালের ১৯শে এপ্রিল ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী চমকে উঠল। একটি ওষুধে একটি রোগ সেরে যায়।

১৯০৮ সালে পল আর্লিক নোবেল প্রাইজ পান শ্বেত কণিকার স্বভাধর্মের মৌলিক গবেষণার জন্যে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দান করেন কিন্তু পল আর্লিক নির্বিকার ভাবে নিজের গবেষণা করে যান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক দেহত্যাগ করেন ১৯১৫ খৃস্টাব্দে।

॥ বাইশ ॥

উত্তর ইতালীর স্ক্যাণ্ডিয়ানো শহর। ছোট্ট শহর, বনজঙ্গলে ঘেরা। একটা পাগলামত ছেলে প্রায়ই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। কোন সময়ে নিজের মনে প্রাণখুলে বেসুরো সুরে গান জুড়ে দিত, আবার কোন সময়ে নানারকম খেলায় মেতে থাকত।

ছেলেটির খেলা কিন্তু খুবই নিষ্ঠুর ধরনের। হয়ত ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, খপ করে একটা ধরে ফেলল, তারপর একহাতে চেপে ধরে, অন্য হাত দিয়ে ডানাটা ছিঁড়ে ফেলল। ছেঁড়া ডানা আবার জোড়া লাগাবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন পারল না তখন ছুড়ে ফেলে দিয়ে, আবার একটা ধরবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফড়িং দেখতে কেমন, বনের সবুজ কি সুন্দর। পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হয়, একটা ছবি দেখছি, এসব তার খেয়ালও হত না। সে শুধু জানতে চায়। কি জানতে চায় সে নিজেও জানে না।

এ কাহিনী আজকের নয়। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে ছেলেটির জন্ম হয় স্ক্যাণ্ডিয়ানো শহরে। তার নাম ল্যাজারো স্প্যালানজানি (Lazzaro Spallanzani)। স্প্যালানজানির বাবা ছিলেন স্ক্যাণ্ডিয়ানো শহরের একজন নামকরা উকিল। তাঁর মনের গোপন বাসনা ছিল, ছেলেও তাঁর মত উকিল হোক। ছেলেকে তিনি সেই মত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। স্কুলের ছুটি হলেই ল্যাজারো চলে যেত সেই জঙ্গলে। সেখানে বসে চুপচাপ নানান কথা ভাবত। প্রকৃতির আদি রহস্য সে উদ্ধার করবেই, এমনি একটা চিন্তা সব সময়েই খেলত। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবত, এগুলো এল কোত্থেকে! আগ্নেয়গিরিই বা হয় কি করে? ওই যে ঝরঝরিয়ে ঝরনাধারা ঝরছে, ওটাই বা হল কোত্থেকে?

একদিন ল্যাজারো সাহস করে তার বাবাকে বলল—বাবা, আমার সঙ্গে বনে বেড়াতে যাবে?

—চল। ছেলের আবদার রাখতে বাবাও বেরিয়ে পড়লেন বনের দিকে।

বনে এসে ল্যাজারো জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বাবা, ওই যে ঝরনা, ওটা হল কোত্থেকে?

শিশুমনকে প্রবোধ দেবার জন্যেই ওর বাবা উত্তর দিলেন—রূপ-কথায় পড়োনি? আদিকালে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর মেয়েদের বনের মধ্যে বন্দী করে রাখা হত, সেই সব মেয়েদের চোখের জল ঝরনা হয়ে বেরিয়ে আসত।

বাবার কথা শুনে ল্যাজারোর হাসি পায়। সে মনে মনে ভাবে, বাবা তাকে ছোট ছেলে পেয়েছেন, যে আবোলতাবোল একটা কথা বলে দিলেই হল! মনে মনে একটু বিশ্বাস করল না, কিন্তু সাহস করে কিছু বললও না। চুপ করে থাকল।

ল্যাজারোর বাবা বুঝতে পারলেন, ছেলে এই গল্প শুনে সন্তুষ্ট নয়। অকালপক্ক ভেবে, ছেলেকে গম্ভীর হয়ে বললেন—আজেবাজে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কাল থেকেই পড়তে বসবে।

কোন কথা না বলে ল্যাজারো নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে এল।

পরদিন থেকে বাবার কথামতই পড়তে বসে গেল। সে সকলকে দেখাতে লাগল আইন পড়তে তার খুব ভাল লাগে, কিন্তু গোপনে গোপনে সে গণিতশাস্ত্র, গ্রীক, ফরাসী ভাষা পড়ে নিল। লজিকও পড়তে লাগল। পড়াশুনার শেষে ছুটি পেলেই বনে গিয়ে বসে আর ভাবে এই গাছ, পাহাড়, ফুল, জীব এল কী করে? কে এইসব তৈরি করেছে?

এমন সময় একজনের সঙ্গে ল্যাজারোর দেখা হয়ে গেল।

একদিন ল্যাজারো বনের মধ্যে বসে প্রকৃতির আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ খুঁজছিল, এমন সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোককে দেখতে সৌম্য। একগাল পাকা দাড়িতে আরও সুন্দর লাগছিল। ভদ্রলোক ল্যাজারোকে দেখতে পেয়ে, গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

—ল্যাজারো। ল্যাজারো স্প্যালানজানি।

—ও, তোমার বাবা মিঃ স্প্যালানজানি? যিনি মস্তবড় উকিল। আচ্ছা! আমি তাঁকে খুব ভালভাবে চিনি।

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ল্যাজারোর পাশে বসে আবার ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে একা একা কি করছ?

ল্যাজারো ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তাঁকে দেখে মনে হল, হয়ত তিনি উত্তর দিতেও পারেন। তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সামনের একটা গাছের দিকে তাকিয়ে ল্যাজারো জিজ্ঞাসা করল—আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন। ল্যাজারোর পাশে বসে মিষ্টিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি তোমার প্রশ্ন?

—আচ্ছা বলতে পারেন, এই যে বনে এত পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা এল কোত্থেকে? ওই যে ঝরণা, ওটাই বা হল কোত্থেকে?

—তোমার বাবা কি বলেন!

—তিনি এড়িয়ে যান।

—গির্জার পুরোহিত কি বলেছেন?

—তিনি বলেছেন, এ সব সৃষ্টি ঈশ্বর করেছেন।

—কথাটা বিশ্বাস করতে দোষ কি?

—কি করব বলুন? ল্যাজারো মাথা নেড়ে জবাব দিল—ও কথায় আমার মন সায় দেয় না। আমার মনে হয়, এর উত্তর কোথাও না কোথাও লুকোন আছে। তাই খুঁজতে এখানে এসে বসে থাকি।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি পড়?

—আইন!

—কেন? আইন কেন?

—কি করব? বাবা যে আইন ছাড়া কিছু পড়তে দিতে চান না।

ভদ্রলোক একবার ল্যাজারোর দিকে তাকিয়ে বললেন—এসো আমার সঙ্গে।

বিহ্বল ল্যাজারো ভদ্রলোকের পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

বাড়িতে ঢুকতেই ল্যাজারোর বাবা আগন্তুককে দেখে বিস্মিত হলেন এবং সশ্রদ্ধ কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন।

ল্যাজারো আরও ঘাবড়ে গেল। ভদ্রলোকের দিকে ভয়ে তাকাল একবার। ভদ্রলোক ল্যাজারোর বাবাকে গম্ভীর হয়ে বললেন—তোমার কাছে এসেছি তোমার ছেলের বিষয়ে কথা বলতে।

ল্যাজারোর বাবা হাতজোড় করে বললেন—আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। ও সব সময়ে এমন পাকা কথা জিজ্ঞেস করে যে পিত্তি জ্বলে যায়। ছেলেমানুষ ভেবে ওকে ক্ষমা করুন মিঃ ভ্যালিসনীয়ারি (Vallisnieri)।

ল্যাজারো ভয়ে শুকিয়ে গেল। বিজ্ঞানী ভ্যালিসনীয়ারির নাম তখন ইটালীর সকলেই জানে। প্রত্যেকে ওই নামটি পরম শ্রদ্ধা করে। ল্যাজারো কি করবে ভেবে পেল না।

ভ্যালিসনীয়ারি ল্যাজারোর দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি একটু এখান থেকে যাও। তোমার বাবার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা আছে।

ল্যাজারো একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বিদায় নিল।

ল্যাজারো ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ভ্যালিসনীয়ারি ল্যাজারোর বাবাকে বললেন—এভাবে ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ কেন?

কথাটার অর্থ ঠিক ভাবে ধরতে না পেরে ল্যাজারোর বাবা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—তোমার ছেলে একজন বৈজ্ঞানিক! ওকে এভাবে আইন পড়িয়ে সময় নষ্ট করাচ্ছো কেন?

—ও পারবে ওই সব জটিল তত্ত্বের কথা বুঝতে?

—পারবে। দৃঢ়কণ্ঠে ভ্যালিসনীয়ারি জবাব দিলেন—আমি ওর প্রশ্ন শুনেছি। একমাত্র বৈজ্ঞানিকের মন না হলে, এসব প্রশ্ন মনে জাগে না!

—আপনি বলছেন?

—আমি বলছি স্প্যালানজানি, তোমার ছেলেকে বিজ্ঞান পড়তে দাও। দেখবে, একদিন ও সারা স্ক্যাণ্ডিয়ানোর গর্ব হয়ে উঠবে। তোমার ছেলে গ্যালিলিওর মত বৈজ্ঞানিক হবে!

—বেশ। আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

ল্যাজারো স্প্যালানজানির জীবনগতি বদলে গেল। যে ছেলে আইন পড়ছিল, সে রেগিও ইউনিভারসিটিতে বিজ্ঞান পড়তে চলে গেল। বদ্ধ স্ক্যাণ্ডিয়ানো থেকে উন্মুক্ত ইওরোপীয় সভ্যতার মধ্যে এসে পড়ল। চোখ চেয়ে ল্যাজারো চারদিকের সমাজ দেখতে পেল। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে সে সময়ে একটা বিপ্লব চলেছে। একদল সনাতন বিশ্বাস অনুযায়ী বলে চলেছে, ঈশ্বরই সব। ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই থাকত না, কিছুই থাকবে না। এমত মতবাদ ধর্মযাজকেরাই বেশী প্রচার করতেন। বিপরীত দলের লোকেরা বলতেন—ও সব বুজরুকি। আসলে গির্জায় ক্ষমতা আটকে রাখার জন্যেই এই সব ভাঁওতা দিয়ে সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে।

এই ধরনের মতবাদ যখন সারা ইওরোপে, তখন ল্যাজোরো নিজের সাধনায় মগ্ন। লিউএনহক আবিষ্কৃত মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ল্যাজারো দিনরাত বসে আছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে অনেক রকমের জীবাণু দেখতে পায় সে। এটা নতুন কিছু নয়! লিউএনহক নিজেই বলে গেছেন, জলে জীবাণু আছে। কিন্তু এইসব জীবাণু আসছে কোত্থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর লিউএনহক দিতে পারেন নি। অবশ্য দেবার আগেই মৃত্যু তাঁকে ডেকে নেয়। ল্যাজারো নিজের ল্যাবোরেটরীতে অস্থিরভাবে কাজ করে আর ভাবে, কই কোথাও তো কিছু পাচ্ছি না! তাহলে কি ভগবান পৃথিবীর প্রথম ছয় দিনে মানুষ জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছিলেন? ভগবান কি তাহলে পৃথিবীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

অস্থিরভাবে কাজ করে আর এইসব কথা ভাবে। হঠাৎ একদিন রাতে একটি বই পেল ল্যাজারো, আর সেই বই পড়ে চোখ খুলে গেল। বইটি লিখেছেন রেডি (Redi) নামক জনৈক অখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি বইতে বলেছেন, মাছি জাতীয় পোকার মা-বাবা আছে। তিনি দুটো কাঁচের জারে খানিকটা করে মাংস ভরে একটি জারে ঢাকনা দিয়ে দিলেন, অপরটি খোলা রইল। খোলা জার দিয়ে মাছি, ম্যাগট প্রভৃতি পোকা যাতায়াত করতে লাগল। বন্ধ জারে কিছুই যাতায়াত করতে পারল না। কিছুদিন পরে দেখা গেল খোলা জারগুলিতে মাছি জন্মেছে, কিন্তু বন্ধ জারগুলোতে কিছুই জন্মায় নি।

ল্যাজারো বইটা পড়ে বলল—রেডি আমার গুরু। তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমি বলছি, মাছির মত জীবাণুদেরও বাবা-মা আছে। তারা আকাশ থেকে সৃষ্টি হয় না। ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেন নি। তাদের নিশ্চয়ই একটা বংশের ধারা আছে।

ঠিক সেই সময়ে নিড্‌হাম নামে একজন গোঁড়া ক্যাথলিক ভদ্রলোক ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। নিড্‌হাম পরীক্ষা করে দেখেছেন জীবাণুগুলো মাংসের রস থেকে তৈরী হয়। তিনি খানিকটা মাংস গরম অবস্থায় উনুন থেকে নামিয়ে জারের মধ্যে পুরে, জারের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। জারটিকে আগে ভাল করে গরম করে নিয়েছিলেন, যাতে কোন রকমের জীবাণু বাঁচতে না পারে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল জারের মধ্যে মাংসের ওপর জীবাণু সৃষ্টি হয়েছে। নিড্‌হাম ঘোষণা করলেন, মাংসের জুস (juice) থেকে জীবাণু সৃষ্টি হয়। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন এবং কাগজে সেই পরীক্ষার ফল নিয়ে আলোড়ন শুরু হল।

রয়্যাল সোসাইটি এবং ইওরোপের শিক্ষিত সমাজ নিড্‌হামের পরীক্ষা নিয়ে রীতিমত আলোচনা শুরু করে দিলেন। এ তো আর গল্পকথা নয়। রীতিমত পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেওয়া। মাংসের রস থেকে জীবাণু সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর আছেন।

ইটালীতে বসে ল্যাজারো নিড্‌হামের পরীক্ষা পড়ল। পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল। অবিশ্বাসের ঢেউ মনের মধ্যে খেলা করে গেল। স্ক্যাণ্ডিয়ানোর বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝরনার বিষয়ে বাবার কাছ থেকে কৈফিয়ত শুনে মন যে রকম অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি অবিশ্বাসী হয়ে উঠল।

—বাজে কথা! নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে ল্যাজারো বলল—মাংস থেকে, কি

বাদাম থেকে, কি ঈশ্বর থেকে জীবাণু সৃষ্টি হয়, সব বাজে কথা। এই পরীক্ষার মধ্যে কোথাও একটা বিরাট ফাঁক আছে।

ল্যাজারো সোজা হয়ে বসল। নিজের বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ণ করে তুলল। নিড্‌হ্যামকে মনের মত জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

ল্যাবরেটরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ল্যাজারো অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল টেনে ভাবতে লাগল, কি করে গরম মাংসতে জীবাণু তৈরী হল ?

হয় নিড্‌হ্যাম ভাল করে মাংস সেদ্ধ করে নি, আর নইলে জারে ছিপি ভাল করে আটকায় নি। আচ্ছা, ব্যাপারটা দেখা যাক।

এই প্রথম ল্যাজারো সত্যিকারের আবিস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করল। এর আগে সে শুধু অন্য জ্ঞানী গুণীর বিশ্বাস এবং পরীক্ষার ফলকে নাকচ করেই ক্ষান্ত হত। এবার আর নিড্‌হ্যামকে কোন কথা লিখল না। তার বদলে, জামার হাত গুটিয়ে, শান্ত মনে, কাজের টেবিলে বসে পড়ল।

নিড্‌হ্যামের মতই ল্যাজারো মাংসের রস যোগাড় করল, তারপর জারে পুরে ফোটাতে লাগল। নিড্‌হ্যাম নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ গরম করে নি। কোন কোন জীবাণু বা পোকার ডিম গরমে বাঁচে। দেখা যাক।

পুরো একঘণ্টা ল্যাজারো জারটিকে সেদ্ধ করল। তারপর জারের মুখের দিকটা আগুনে গলিয়ে পুরো সীল করে দিল। নিজের মনেই বলল—ছিপি দিলে কোথাও ফাঁক থেকে যেতে পারে।

জারটিকে ঠাণ্ডা করতে দিয়ে ল্যাজারো ল্যাবোরেটরী থেকে বেরিয়ে গেল সময় কাটাবার জন্য। দুদিন পরে ফিরে এসে দেখল, জারে একটিও জীবাণু জন্মায় নি।

পরদিনই ল্যাজারো ঘোষণা করল, নিড্‌হ্যামের ধারণা সম্পূর্ণ বাজে কথা। আসলে উনি জারগুলোকে ভাল করে সেদ্ধ করেন নি, আর জারের মুখগুলোকে ভাল করে লাগান নি। ফলে বাইরের হাওয়া থেকে জীবাণু জারের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

নিড্‌হ্যাম তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন, ল্যাজারো একঘণ্টা ধরে ফুটিয়েছে, তার ফলে ঈশ্বরের যে শক্তি ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে।

নিড্‌হ্যামের রিপোর্ট পড়ে ল্যাজারো ক্ষেপে উঠল। সে নিজের মনেই বলল—আচ্ছা! এবার মজা দেখাচ্ছি। ভেজিটেটিভ্ ফোর্স সত্যি কিনা এবার হাতে হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

ল্যাজারো পর পর অনেকগুলো জার তৈরি করল। অর্ধেকগুলোতে নিড্‌হ্যামের মত ফ্লাস্কের ছিপি এঁটে বন্ধ করল, বাকী অর্ধেক নিজের পদ্ধতিতে গরম করে কাঁচের মুখ গলিয়ে সীল করে দিল। তারপর পর পর সাজিয়ে ফেলল জারগুলো। প্রত্যেকটি গরম করতে শুরু করে দিল। দশ মিনিট থেকে আরম্ভ করে, দুঘণ্টা পর্যন্ত গরম করল জারগুলো। তারপর ঠাণ্ডা করতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন ফিরে এসে জারগুলোকে পরীক্ষা করতে শুরু করল। পরীক্ষা করতে করতে মুখে জয়ের হাসি ফুটে উঠল। গর্বের সঙ্গে বলল—নিড্‌হ্যাম তোমার চিন্তা সম্পূর্ণ মিথ্যে!

ল্যাজারো তার পরীক্ষায় প্রমাণ করল, দশ মিনিট বা দুঘণ্টায় কোন আলাদা ফল ফলছে না। যে জারের মাংসের রস দশ মিনিট ফোটানো হয়েছে, অথচ কাঁচ গলিয়ে মুখ সীল করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে জীবাণুর চিহ্ন নেই, আবার যে জারগুলি দুঘণ্টা গরম করা হয়েছে, কিন্তু ছিপি এঁটে মুখ বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলিতে জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে। এ থেকে কী প্রমাণ হচ্ছে! নিড্‌হ্যামের কথানুযায়ী ভেজিটেটিভ্ ফোর্স-এর জোরে মাংস থেকে জীবাণু তৈরী হচ্ছে। একথা ভুল। আসলে জীবাণু আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই তারা বংশবৃদ্ধি করছে। কাঁচের মুখ গলিয়ে বন্ধ করে দেবার জন্য জারে ঢোকবার পথ না পেয়ে তারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে নি। ছিপি এঁটে দেবার জন্যে হাওয়া ঢুকেছে এবং তাতে জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করেছে।

ল্যাজারোর পরীক্ষা ক্রমশঃ সারা ইওরোপে সাড়া জাগিয়ে তুলল। দেখতে দেখতে দুটো মতের লোক তৈরী হয়ে গেল। একপক্ষ ল্যাজারোকে সমর্থন জানাল, অন্যপক্ষ নিড্‌হ্যামের দিকে গেল।

নিড্‌হ্যামও চুপচাপ বসে ছিলেন না। তিনিও জানালেন ল্যাজারোর পরীক্ষা ঠিক নয়। আমি বলছি ঈশ্বরের শক্তি আছে। তা আমরা হয়ত দেখতে পাই না বা বুঝতে পারি না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। তা যদি না থাকত, তাহলো সেদ্ধ মাংস রস থেকে কী করে জীবাণু সৃষ্টি হয়।

ল্যাজারো দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল অক্সিজেনের জন্য!

—অক্সিজেন! বাতাস! সেটা বোতলের মধ্যে ঢুকছে কিনা তার প্রমাণ আছে?

এবার থমকে গেল ল্যাজারো। সত্যিই তো! বাতাস বোতলে ঢুকছে এটা ভেবে নেওয়াই হয়েছিল কিন্তু কোন পরীক্ষায় প্রমাণ হয়নি। ল্যাজারো গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—প্রমাণ আমার হাতে নেই, তবে শীঘ্রই দিতে পারব।

আবার ল্যাবোরেটরী। আবার অস্থিরভাবে পায়চারি। ল্যাজারো নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ভাবতে লাগলো। কীভাবে—কীভাবে প্রমাণ করা যায় বাতাস বোতলের মধ্যে ঢুকছে ? ঢুকছে, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। নিড্‌হ্যামের ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়েও জোরাল বিশ্বাস আমার। কিন্তু—কিন্তু—।

ভাবতে ভাবতে একদিন অন্যমনস্কভাবে একটা জার কানের ওপর চেপে ধরেই শুনতে পেল সোঁ সোঁ শব্দ। অবাক্ হয়ে আবার কানে চেপে ধরল, আবার সেই শব্দ। একটা জার ফাটিয়ে ফাটা জারটা কানে চেপে ধরতে আবার সেই সোঁ সোঁ শব্দ। আনন্দে ল্যাজারোর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই বাতাসের শব্দ। বাতাস বোতলের মধ্যে থেকে কানে ধাক্কা মারছে আবার বোতলে ফিরে যাচ্ছে, তাই এই শব্দ। কিন্তু বোতলে ঢুকছে কিনা তার প্রমাণ কোথায় ?

প্রমাণ অতি সামান্য একটা পরীক্ষা করেই পাওয়া গেল। আজকের দিনে আমরা বলতে পারছি সহজ পরীক্ষা, কিন্তু সে যুগে বলা এত সহজ ছিল না। সে যুগের লোক বিজ্ঞান বিশ্বাসই করত না। বিজ্ঞানের কথা কিছু বলতে গেলে নাস্তিক বলে মেরে ফেলা হত। সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একা ল্যাজারো লড়াই করে চলেছিল। তার পরীক্ষা যদি মিথ্যে হয়, মৃত্যুই হবে একমাত্র শাস্তি।

ল্যাজারো একদিন একটা প্রদীপের শিখার দিকে তাকিয়ে দেখল শিখাটা নড়ছে। রোজই নড়ে, রোজই ল্যাজারো দেখে, কিন্তু সেদিনের দেখার মধ্যে যেন কিছু বিশেষত্ব ছিল। ল্যাজারো লক্ষ্য করল শিখাটা নড়ছে তার কারণ বাতাস যাতায়াত করছে। বোতলের মুখে অমনি একটা শিখা ধরলেই বাতাস বোতল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কি বোতলে ঢুকছে বোঝা যাবে। স্প্যালানজানি ল্যাজারো বোতলের মুখে শিখাটা ধরতেই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিখা বোতলের ভেতরের দিকে যাচ্ছে।

এরপর নিড্‌হ্যামের বলার কিছু রইল না। ল্যাজারোর জয় সর্বত্র। ল্যাজারো স্প্যালানজানির নাম সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ল্যাজারো স্প্যালানজানি প্রমাণ করে দেখালেন, পৃথিবীর যত জীবন, জীবন থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের জীবনই হোক আর জীবাণুই হোক। আমাদের মতই জীবাণুর জীবনেও জন্ম-মৃত্যু আছে। বয়স আছে। তাদের আলাদা সংসার আছে। এই জীবাণু আবার সব এক নয়। কোনটা বিন্দুর মত দেখতে, কোনটা দাঁড়ির মত, কোনটা আবার পাকানো পাকানো। বিন্দু জীবাণু থেকে বিন্দু জীবাণু সৃষ্টি হয়। লম্বা থেকে লম্বা

জীবণু হয়, আবার পাকানো থেকে পাকানো জীবাণু হয়। বিন্দু থেকে লম্বা বা লম্বা থেকে পাকানো জীবাণু কখনও হয় না।

ল্যাজারোর নাম ছড়িয়ে পড়তে নানাদিক থেকে অভিনন্দনপত্র আসতে লাগল। অস্ট্রীয়ার রাণী ম্যারিয়া থেরেসা ল্যাজারোকে একটি চিঠি লিখে জানালেন তিনি যদি লোমবার্ডি (Lombardy) নগরের প্যাভিয়া ইউনিভারসিটির ন্যাচারাল হিস্ট্রির অধ্যাপকের পদ নেন, তাহলে খুব ভাল হয়। প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি অতি প্রাচীন, কিন্তু ভাল অধ্যাপনার অভাবে, একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ন্যাচারাল হিস্ট্রি ক্যাবিনেটের একটি অতি প্রাচীন মিউজিয়াম আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যদি ল্যাজারো নেন, খুব ভাল হয়।

ল্যাজারো সেই পদ গ্রহণ করলেন।

ছাত্রদের তিনি এমনভাবে পড়াতেন, যে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকত না। দেখতে দেখতে প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি আবার জমজমাট হয়ে উঠল। প্যাভিয়া ইউনিভারসিটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ল্যাজারো কিছুদিনের জন্যে দেশভ্রমণে বার হলেন, আর সেই দেশভ্রমণই কাল হল।

ল্যাজারো যখন দেশে দেশে নিজের মতবাদ প্রচার করছিলেন তখন স্ক্যাণ্ডিয়া-নোতে ক্যানন ভল্‌টা নামের একটি লোক এক ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছিল। ল্যাজারোর নিজস্ব একটা মিউজিয়াম ছিল স্ক্যাণ্ডিয়ানোর বাড়িতে। ভল্‌টা সেই মিউজিয়ামের দুষ্প্রাপ্য জিনিসে প্যাভিয়া ইউনিভারসিটির ছাপ গোপনে লাগিয়ে দিয়ে প্রচার করে দিল, এইসব জিনিস প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি থেকে চুরি করে এনে ল্যাজারো সাজিয়েছে।

ল্যাজারোকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হল।

ভগ্নহৃদয় ল্যাজারো দেশভ্রমণ বাতিল রেখে ফিরে এলেন প্যাভিয়াতে। মাথা হেঁট করে প্যাভিয়া ইউনিভারসিটিতে ঢুকলেন। একদিন যেখানে মাথা উঁচু করে শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন, আজ সেখানে চোরের অপবাদ নিয়ে ঢুকছেন।

ল্যাজারো ইউনিভারসিটিতে ঢুকে দেখতে পেলেন, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ছলছল চোখে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাজারোর মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এইসব ছেলেমেয়েদের ভালবাসাই তাঁর একমাত্র পাথেয়। অধ্যাপকের সবচেয়ে বড় সম্পদ্!

বিচার শুরু হল।

ল্যাজারো ক্ষিপ্ত বাঘের মত নিজের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে উন্নত করে তুলেছেন তিনি। প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি নিজে প্যাভিয়ার মিউজিয়ামকে কত জিনিস দান করেছেন, খোঁজ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে। আমার নিজস্ব মিউজিয়ামে যে সব জিনিস আছে, সেগুলি প্যাভিয়াতে যোগ দেবার অনেক আগে থেকেই ছিল, তাছাড়া তার অনেকগুলো আমি নিজে প্যাভিয়াতেও তৈরি করেছি। এর চেয়ে বেশী কিছু বলার নেই।

ল্যাজারো বিদায় নিলেন। বিচারে তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন। কিন্তু শরীর আর মন সারল না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সন্ন্যাস রোগ হল, আর সেই রোগেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

ঠিক সেই বছরেই নেপোলিয়ন পৃথিবীকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার অভিযান শুরু করেছিলেন।

ল্যাজারো স্প্যালানজানির নাম যতদিন চিকিৎসাশাস্ত্র থাকবে, ততদিন সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে। স্প্যালানজানি মানুষের কুসংস্কারকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রথম প্রমাণ করলেন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জীবাণুদের জীবনকথা। আজকের চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল ও আদিতত্ত্ব।

॥ তেইশ ॥

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই।

সকলে ধরাধরি করে জোসেফকে ডাক্তারবাবুর ডিসপেনসারিতে শুইয়ে দিল। ন বছরের ছেলে জোসেফ, তাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে। জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণগুলো জোসেফের দেহে ফুটে উঠেছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; এ মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। কোনদিন এই মৃত্যুরোগ থেকে কেউ নিস্তার পায়নি।

জোসেফ মীস্টার (Josheph Meister) বাপের একমাত্র সন্তান। আলাস্তিয়া থেকে প্যারী নগরে এসেছেন ভাগ্যের অন্বেষণে। জোসেফ তাঁর নয়নের মণি, সে যদি মারা যায়, তাহলে তিনিও আত্মহত্যা করবেন।

জোসেফের মা ডাক্তারবাবুর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাতর প্রার্থনা জানালেন—ডাক্তারবাবু, আমার ওই একটিমাত্র সন্তান। ওকে বাঁচিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু পাথরের মত নিস্পন্দ, নিথর। জলাতঙ্ক,—হাইড্রোফোবিয়া। শিবের অসাধ্য এই রোগ। মানুষের হাতে এমন কোন ওযুধ নেই, যাতে এই রোগ নিরাময় করা যেতে পারে।

—আমার কাছে এ রোগের কোনো ওষুধ নেই। ডাক্তারবাবু ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন।

জোসেফের বাবা অস্থির হয়ে বললেন—যত টাকা চান দেব ; আপনি চেষ্টা করুন।

ডাক্তারবাবুর ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত। তিনি একটু বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন—জীবনে অর্থের লোভে কিছুই করি নি। আজ আমাকে টাকার লোভ দেখানো বৃথা।

জোসেফের মা ডাক্তারবাবুর পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমার ছেলে কি পশুর চেয়েও অধম? শুনেছি আপনি পশুর জলাতঙ্ক রোগ সারিয়ে দিয়েছেন।

সত্যিই! ডাক্তারবাবুর মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে ভেড়া আর গরুর ওপর পরীক্ষা করেছেন। পঁচিশটি ভেড়া আর ছটি গরুকে তিনি তাঁর তৈরি ওযুধ ইনজেকশন দিয়েছেন। বাকিগুলোকে কোন ইনজেকশন দেন নি। তারপর জলাতঙ্ক সমস্ত পশুগুলোকে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলি ইনজেকশন দিয়েছেন। যেগুলোকে প্রতিষেষক ইনজেকশন দিয়েছিলেন

সেগুলোর কিছু হয় নি, কিন্তু যে পঁচিশটি ভেড়া আর ছটি গরু, কোন প্রতিষেধক ইনজেকশন পায় নি, তার সবকটিই জলাতঙ্ক রোগে মারা গেছে।

—কি হল ? ডাক্তারবাবু—কথা বলছেন না কেন ? জোসেফের মা আর্তকণ্ঠে বললেন—জোসেফের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু জোসেফের দিকে তাকালেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর করাল ছায়া ক্রমশঃ জোসেফের মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। ফরসা রঙের ওপর নীলাভ ছাপ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। নিঃশ্বাস টেনে টেনে নিচ্ছে। একটা অসহ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে মাঝে মাঝে।

আপনার ছেলে পশুর অধম নয়, কিন্তু—

থেমে গেলেন ডাক্তারবাবু। যে ওষুধ তিনি তৈরি করেছেন, শুধু পশুর ওপর তার প্রয়োগ হয়েছে। মানুষের ওপর কোনদিন তার ফলাফল দেখা হয় নি।

—কিন্তু কি ?—জোসেফের বাবা পকেট থেকে টাকার গোছা বার করে বললেন —টাকার জন্যে ভাবছেন ? আমরা সর্বস্ব উজাড় করে দেব। আপনি আর দেরি করবেন না। আমার ছেলেকে বাঁচান। —টাকার দরকার নেই, কিন্তু যে ওষুধ কোনদিন মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয় নি, সেই ওষুধ সর্বপ্রথম আপনার ছেলে পাবে। মৃত্যু ঘটলে আমাকে কিছু বলতে পারবেন না।

—আমার ছেলে এমনিও মারা যাবে। তবু সান্ত্বনা থাকবে মৃত্যুর আগে আপনার মত চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করাতে পেরেছি।

—বেশ। তাহলে তাই হোক। ডাক্তারবাবু ধীরপায়ে আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাল্লা দুটো খুলে ফেললেন। নিজের তৈরি ওষুধ বার করে সিরিঞ্জে ভরলেন, তারপর জোসেফের হাতে ইনজেকশন দিয়ে দিলেন।

দর্শকের দল সবাই নির্বাক। কি ঘটবে কেউ জানে না। ডাক্তারবাবুর তেষট্টি বছরের মধ্যে এই প্রথম মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছেন পশুর জন্যে তৈরি ওষুধ। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চিন্তান্বিত অবস্থায় জোসেফের দিকে তাকিয়ে আছেন। এর পূর্বে তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করে যশের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু এমন কঠিন পরীক্ষার সামনে কোনদিন পড়েন নি।

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।

ক্রমশঃ নাড়ীর গতিবেগ উন্নত হচ্ছে। মুখের নীলাভ আভা দূরে সরে যাচ্ছে। যন্ত্রণার চিৎকার ধীরে ধীরে কমে আসছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

মৃত্যুকে বোধ হয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ডাক্তারবাবু বার বার নাড়ী টিপছেন জোসেফের। তাঁর মনের মধ্যে উত্তেজনা। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, অবধারিত মৃত্যুকে তিনি রোধ করে একটি মানবশিশুকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

—আপনার ছেলে এ যাত্রায় বেঁচে গেল।

ডাক্তারবাবু কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন। জোসেফের বাবা কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন—আপনার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়, তবু বলুন আমরা কি করতে পারি ?

ডাক্তারবাবু বললেন—সত্যিই যদি কিছু করার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে এমন করুন যাতে আপনার ছেলের মতই আরও অনেক ছেলে বাঁচতে পারে।

—তাই হবে।

জোসেফকে সুস্থ করে ওর মা বাবা বাড়ি ফিরলেন। জোসেফের আরোগ্য সংবাদ লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। পৃথিবীর সর্বত্র রটে গেল এই খবর। দূর দূরান্ত থেকে পাগলা কুকুর আর পাগলা নেকড়ে বাঘের কামড়ের রোগী আসতে লাগল ডাক্তার বাবুর কাছে। জোসেফের বাবা এবং আরও বহু উপকৃত মানুষ চাঁদা তুলে প্যারিস শহরে একটি ইনস্টিটিউট তৈরি করে দিলেন, যেখানে জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ তৈরি হবে, রোগীদের চিকিৎসা করা হবে এবং আরও নানারকম প্রতিষেধক ওষুধের গবেষণা করা হবে।

ইন্‌স্টিটিউটটির নামকরণ হল চিকিৎসকের নামে, তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য। মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভাধর চিকিৎসকের নাম লুই পাস্তর। ইন্‌স্টিটিউটের নাম হল পাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট।

লুই পাস্তর ফ্রান্সের ডোলে গ্রামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাস্তরের বাবা চামড়ার ব্যবসায় করতেন, আর নেপোলিয়নের সৈন্যদলের একজন সৈনিক ছিলেন। লুই পাস্তর বাবার কাছে ফরাসীদেশের গল্প শুনে নিজে আশ্চর্য রকমের দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই পাস্তর বিজ্ঞানের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ঠিক করেছিলেন বিজ্ঞানের চর্চার ভেতর দিয়েই দেশের সেবা করবেন।

নর্মাল স্কুল থেকে পাশ করে পাস্তর প্যারিসের একটি হাই-স্কুলের শিক্ষক হলেন। এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কন্যাকে পাস্তর বিবাহ করেন।

তিনি স্কুলে কাজ করার সময় থেকেই বিজ্ঞানবিষয়ক নানা রিসার্চ করেন। তাঁর

রসায়ণশাস্ত্রের রিসার্চ-এর খ্যাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং কিছু-দিনের মধ্যেই লিলি ইউনিভারসিটির কেমিস্ট্রির অধ্যাপক পদে উন্নীত হলেন। লিলি ইউনিভারসিটি তখন সবে গড়ে উঠেছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করলেন দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যদি কোন বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যার উদয় হয়, তাহলে সেই সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করবে। এই ধরনের পরিকল্পনা ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছে।

পাস্তরকে ফরাসী সরকার অনুরোধ করলেন—অরলিয়ান্স অঞ্চলের অধিকাংশ মদের ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ কিছুদিনের মধ্যেই সব মদ পচে যাচ্ছে। যদি লুই পাস্তর এ সম্বন্ধে একটু গবেষণা করে সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তাহলে দেশের মদ তৈরির শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাঁচতে পারে।

পাস্তর কোন জবাব দিলেন না, নীরবে সমস্যার কথা ভাবতে লাগলেন। পাস্তরের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছেন, মদের মধ্যে একরকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়, যার ফলে মদ এই রকম টক হয়ে যায়, আর পচে যায়।

প্রফেসর পাস্তর কী করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। এমন সময় একদিন তাঁর এক ছাত্র বিগো এসে হাজির হল।

—স্যার। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিগো প্রায় কেঁদে ফেলল লুই পাস্তরের সামনে।

—কি হয়েছে? স্নেহ মেশানো কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন লুই পাস্তর।

—আমার বাবার ফ্যাক্টরীতে যত বীয়ার (এক রকমের মদ) তৈরি হয়েছিল সব পচে গেছে। বাবা পথের ভিখিরী হয়ে গেছেন।

—হুঁ। ছাত্রের দুঃখে বিগলিত হয়ে পড়লেন আদর্শ অধ্যাপক।

—স্যার। এ বিপদ থেকে আপনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। আপনি দয়া করুন।

বিগোর কান্নায় বিচলিত লুই পাস্তর। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন—না, না, এ দয়ার কথা নয় বিগো। এ আমার কর্তব্য। প্রথমতঃ আমার ছাত্রের সর্বনাশ যাতে না হয় তার চেষ্টা করব। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী দেশের শিল্পকে বাঁচাবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব তুমি বাড়ি যাও, আমি কাল সকালে তোমাদের বাড়ি যাব।

বিগো ফিরে গেল। প্রফেসর পাস্তর নিজের ল্যাবোরেটরীতে বসে চিন্তা করতে

লাগলেন। কেন এই মদের মধ্যে পচন ধরছে? কিসের জন্যে? কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন্? কি ধরণের রিঅ্যাকশন্?

নানারকমের চিন্তা করতে করতে রাত শেষ হয়ে গেল। সে রাতে পাস্তরের চোখে ঘুম এল না! পরদিন ভোরবেলায় অরিলিয়ান্স যাত্রা করলেন লুই পাস্তর। বিগোর বাবা অধীর আগ্রহে পাস্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পাস্তরকে দেখতে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন বিগো ফ্যামিলি ভেবে পেলেন না।

—ব্যস্ত হবার দরকার নেই। চল! তোমাদের ফ্যাক্টরী দেখে আসি।

—আগে গরীবের ঘরে কিছু জলযোগ করে বিশ্রাম করুন, তারপর ফ্যাক্টরী দেখতে যাবেন। বিগোর বাবা অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন।

—লুই পাস্তর বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না। প্রফেসর হাসতে হাসতে বললেন—আমি জলযোগ করতে আসি নি, কর্তব্য শেষ বরতে এসেছি। চল, আগে তোমাদের সমস্যা দেখে আসি।

আর তর্ক করতে সাহস পেলেন না মিঃ বিগো। মিঃ বিগো ছেলে এবং তাঁর শিক্ষককে নিয়ে মদের ফ্যাক্টরীর দিকে পা বাড়ালেন।

ফ্যাক্টরীর ভেতরের দৃশ্য দেখে লুই পাস্তরের মনে দুঃখের স্রোত বয়ে গেল। হাজার হাজার ড্রাম পড়ে রয়েছে ফ্যক্টরীর মধ্যে। সবগুলি ড্রামের মদ পচে গেছে। মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। এত কষ্ট করে সব তৈরি হয়েছে, সবই বৃথা হয়ে গেছে।

দুটো পচা ড্রাম আমার বাড়ি পাঠিয়ে দাও। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে পাস্তর বললেন। এ যেন সে পাস্তর নয়। এ কণ্ঠস্বর যেন সম্পূর্ণ এক অচেনা পাস্তরের।

লুই পাস্তর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে বাড়ি ফিরে এলেন। মিঃ বিগো ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা অভদ্র লোক ত! যাবার সময় একটি কথাও বললেন না।

ছেলে সশ্রদ্ধ চিত্তে জবাব দিল—বাবা উনি ধ্যাননিমগ্ন হয়ে গেছেন। আর কারুর কথা শুনতে পাবেন না। কারুর উপস্থিতিও বুঝতে পারবেন না।

একমাস ধরে দিনরাত সাধনা করে চললেন অধ্যাপক লুই পাস্তর। কোথা দিয়ে রাত কেটে যায় ভ্রূক্ষেপ নেই, কখন সূর্য ওঠে—তারও হুঁস নেই। পাস্তরের ল্যাবরেটরীতে এখন খালি নানা রকমের মদ, দুধ সাজানো রয়েছে। কোনটা পচে গেছে, কোনটা ভাল আছে।

একদিন—ছদিন—তিনদিন—

পরপর তিনদিন একই পরীক্ষা করে দেখলেন ফলাফল নিখুঁত। একমাস পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে লুই পাস্তর ঘোষণা করলেন—পেয়েছি। সমস্যার সমাধান পেয়েছি।

তিনি বিজ্ঞানীদের সভা ডাকলেন। সভায় ঘোষণা করলেন, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন্ নয়। মদের পিপেগুলো খোলা অবস্থায় পড়ে থাকার জন্যে, মদের মধ্যে একরকমের জীবাণু জন্মায়। সেই জীবাণুর প্রতিক্রিয়ায় মদে পচন ধরে, দুধেও ওই একই কারণে পচন ধরে।

বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞানীরা তর্কযুদ্ধে বললেন—প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করব না। এই যুক্তি।

—বেশ। প্রমাণ দিচ্ছি—

পাস্তর একটি বোতল তুলে নিয়ে বললেন—এই রোতলের মধ্যে মদ আছে। আমি মদের বোতল গরম করছি। আপনারা সবাই জানেন গরম করলে জীবাণু বাঁচতে পারে না। আমি পরীক্ষায় দেখেছি ৫৫° সেন্টিগ্রেডে কোন খাদ্য গরম করলে সেই খাদ্যের প্রকৃতি বদলে যায় না, অথচ জীবাণুগুলোও বাঁচতে পারে না, তাই ৫৫° সেন্টিগ্রেডে গরম করেই ছিপি এঁটে দিলাম।

এবার বোতলটি রেখে দিলে, যতদিন না ছিপি খুলবেন, ততদিন কোন পচন ধরবে না।

—আমরা এসব বিশ্বাস করি না। জীবাণু এল কোত্থেকে? বিরোধীপক্ষের দলপতি প্রশ্ন করলেন।

পাস্তর ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন—কোটি কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু সবসময়ে আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব জীবাণু খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। বোতলের ছিপি যদি আলগা থাকে অথবা বোতলের খালি জায়গায় এই সব জীবাণু বেঁচে থাকে। জীবাণুগুলিকে যদি না মারা হয়, তাহলে তারা মদের মধ্যে গ্যাঁজলা কাটতে শুরু করে, ফলে মদে পচন ধরে। আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে বোতলের মধ্যে কোন জীবাণু বেঁচে থাকবে না, ফলে পচনের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

পাস্তরের বিপক্ষে আর কোন প্রশ্ন উঠল না। বিরোধীপক্ষ সশ্রদ্ধ চিত্তে পাস্তরের পদ্ধতি মেনে নিলেন। পাস্তরের আবিষ্কৃত পদ্ধতির নামকরণ হল

পাস্তুরাইজেশন্। শুধু ফরাসীর নয়, সারা পৃথিবীর সুরাশিল্প পাস্তুরাইজেশনের কল্যাণে রক্ষা পেল।

আবার আহ্বান। এবার ছাত্র নয়, শিক্ষক। লুই পাস্তুরের প্রবীণ শিক্ষক রসায়নবিদ জীন্-ব্যাপ্টিস্ট্ আদ্রেঁ ডুমা দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে সবিনয়ে লিখলেন—কল্যাণীয় পাস্তুর, তোমার তীক্ষ্ণ মেধা নিশ্চয়ই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে। আমি তোমার শিক্ষক। গুরু। তোমার চেয়ে বয়সে প্রবীণ, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করতে অপারগ। তুমি জান দক্ষিণ ফ্রান্সের রেশম শিল্প আজ বিপন্ন এবং মৃতপ্রায়। কি এক অজানা রোগে গুটিপোকাগুলি শুকিয়ে মারা যাচ্ছে। এখানকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন সমস্যার সমাধান করবার জন্য। কিন্তু হেরে গিয়েছি, আমি এই অজানা রোগের হদিশ করতে পারি নি। তুমি এসে আমাকে এই অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবে এই প্রত্যাশাতেই চিঠি লিখছি।

লুই পাস্তুর অনেকক্ষণ ধরে চিঠি পড়ে চিন্তা করলেন, তারপর প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে ছোট্ট চিঠি লিখলেন।

মান্যবরেষু অধ্যাপক ডুমা,

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পড়লাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, রেশম শিল্পজাত সমস্যা আমার গবেষণার আওতায় পড়ে না, তাই এ ধরনের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে আমি অসমর্থ।

আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রণাম নেবেন। ইতি প্রণতঃ ছাত্র লুই পাস্তুর।

চিঠির জবাব অতি শীঘ্র ফিরে এল। কাতর আহ্বান। অধ্যাপককে, শিক্ষককে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়ে নিমন্ত্রণ করলেন প্রফেসর ডুমা।

কোমল মন পাস্তুরের। ছাত্রের দুঃখে যেমন মন নরম হয়ে গিয়েছিল; ঠিক তেমনি শিক্ষকের দুঃখে মন দ্রবীভূত হয়ে গেল। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে লুই পাস্তুর তাঁর অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু মাইক্রোস্কোপটিকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে পাড়ি দিলেন।

তিনবছর অক্লান্ত সাধনা আর গবেষণা করে ১৮৬৮ সালে লুই পাস্তুর আবিষ্কার করলেন গুটিপোকার গায়ে দু রকমের জীবাণু বাসা বাঁধছে। এই জীবাণুগুলোর জন্যেই গুটিপোকাগুলো মরে শুকিয়ে যাচ্ছে, ফলে রেশম সুতো আর তৈরি হচ্ছে না।

পাস্তর জীবাণুগুলোকে মারার পদ্ধতি আবিষ্কার করে বললেন—এই জীবাণু-গুলোকে মারতে পারলেই রেশমশিল্পে আর সমস্যা থাকবে না। এই ধরনের রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। রোগগ্রস্ত গুটিপোকাগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে, নইলে ছোঁয়া লেগে সব গুটিপোকা মরে যাবে।

পাস্তরের পদ্ধতিতে রেশমশিল্পের সমস্যার সমাধান হল। শিক্ষককে অসম্মানের হাত থেকে পাস্তর বাঁচালেন।

এবার পাস্তর গবেষণা শুরু করলেন নিজের মনের তাগিদে। তিনি মুরগীর কলেরা এবং অ্যানথ্রাক্স রোগের প্রতিকারের কথা ভাবতে লাগলেন। অনেকদিন গবেষণার পর, তিনি একদিন চিকেন স্যুপের মধ্যে পুরনো কলেরার জীবাণু ছেড়ে দিয়ে, সেই স্যুপ কয়েকটা মুরগীকে ইনজেকশন দিলেন। মুরগীগুলো কয়েকদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে আবার সুস্থ হল। তখন তাদের গায়ে জোরালো কলেরার জীবাণু ইনজেকশন দিয়ে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় একটা মুরগীরও কলেরা হল না। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন পুরনো জীবাণু শরীরে ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলে শরীরের মধ্যে সেই রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মায়, ইংরেজীতে যাকে বলে ইমিউনাইজেশন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু অ্যানথ্রাক্স নিয়ে গবেষণা করে সার্থক হন, যে কথা আগেই বলেছি।

এই মৃত্যুঞ্জয় ক্ষণজন্মা প্রতিভা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অমর প্রতিভার সাক্ষী হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববিখ্যাত পাস্তর ইন্‌স্টীটিউট।

॥ চব্বিশ ॥

১৬ই অক্টোবর, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বোস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালের প্রাঙ্গণে জনসাধারণ দাঁড়িয়ে আছে অবাক্ বিস্ময়ে। সকলে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, ডাক্তার জন্‌স্ কলিন্‌স্ ওয়ারেন অপারেশন করবেন এবং ডাক্তার উইলিয়ম্ টি. জি. মরটন্ অপারেশনের সময় আশ্চর্যরকমের একটি ওষুধ শোঁকাবেন রোগীকে যার ফলে রোগী অপারেশনের যন্ত্রণা একদম বুঝতে পারবেন না।

বোস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালের সার্জিক্যাল অপারেশন থিয়েটারের টেবলে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হল। রোগীর কাঁধের ওপর বিরাট একটা টিউমার। সিনিয়র সার্জন ডাক্তার ওয়ারেন প্রস্তুত হয়ে আছেন। ডাক্তার মর্টন এলেই অপারেশন শুরু করা হবে। চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনসাধারণ। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন মেডিকেল স্টুডেন্টস্, পরের সারিতে নার্স, তার পরের সারিতে সাধারণ মানুষ। সকলের মুখেই উত্তেজনা। এত দিন ধরে মানুষ অপারেশনের নাম শুনলেই ভয়ে আঁতকে উঠত। সবাই চেপে ধরত রোগীকে। সজ্ঞানে সার্জন অপারেশন করে দিতেন। যন্ত্রণায় চিৎকার করত রোগীরা। অনেক সময়ে যন্ত্রণা এত বেশী হত যে, রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটত। ডাক্তার মর্টন ঘোষণা করলেন, তিনি ইথার নামক একটি ওষুধের ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন। কিছুক্ষণ ইথার শুঁকলে রোগী বেহুঁশ হয়ে পড়ে, এবং যন্ত্রণার বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। এই সময়ে অপারেশন করলে, রোগীর কোন কষ্টই হবে না। ইথার শোঁকানো বন্ধ করলেই আবার রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে। যতক্ষণ রোগী অজ্ঞান থাকবে, ততক্ষণ সার্জন তাঁর ইচ্ছামত অপারেশন করতে পারবেন।

ডাক্তার ওয়ারেন অপারেশন থিয়েটারে পায়চারি করছেন অস্থির-ভাবে। মর্টনের দেখাই নেই। মর্টন যে সময় দিয়েছিলেন, তা পেরিয়ে গেছে। ওয়ারেন ঘড়ির দিকে তাকালেন। পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। বিরক্তির স্বরে তিনি বললেন—মর্টন আর আসবে না। তার বিখ্যাত ওষুধ নিয়ে, সে বোধহয় অন্য কোন অপারেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওয়ারেন পুরনো পদ্ধতিতে অপারেশন করবার জন্য তৈরী হলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য দরজা দিয়ে ডাক্তার মর্টন ঘরে ঢুকলেন।

ডাক্তার ওয়ারেন একটু রাগের ঝাঁঝে বললেন—আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ?

—খুব জোর দু তিন মিনিট। মর্টন হাসতে হাসতে জবাব দিলেন।

ডাক্তার মর্টন নিজের বাক্স খুলে ইথারের বোতল বার করলেন, সঙ্গে একটা মুখোস। মুখোসটি রোগীর মুখে পরিয়ে দিয়ে ডাক্তার মর্টন সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা কেউ ধূমপান করবেন না। এই ওষুধে বিন্দুমাত্র আগুনের ফুলকি পড়লে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

সকলে নিস্তব্ধ। আশ্চর্য ওষুধের ক্রিয়া দেখবার জন্য সকলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তার মর্টন মুখোসের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ইথার ঢালতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার মর্টন ঘোষণা করলেন—আপনার রোগী তৈরি। ইচ্ছে করলে ডাক্তার ওয়ারেন অপারেশন করতে পারেন।

ডাক্তার ওয়ারেন অপারেশন শুরু করলেন।

আশ্চর্য !

রোগী যন্ত্রণায় একটুও ছটফট করছে না। স্থির হয়ে শুয়ে আছে। ডাক্তার ওয়ারেন ধীরে ধীরে পুরো টিউমারটি নিখুঁত ভাবে অপারেশন করে বাদ দিলেন। অপারেশন শেষ হবার পর ডাক্তার মর্টন রোগীরমুখ থেকে মুখোস খুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। একজন মেডিকেল ছাত্র রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। রোগী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অপারেশন হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। আপনি বুঝতে পারেন নি ?

—না তো !

রোগী নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখলেন, টিউমার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নার্স ট্রের ওপরে অপারেশন করা টিউমার এনে রোগীকে দেখিয়ে বললেন—এই দেখুন আপনার টিউমার !

—আশ্চর্য ! আমি একটুও বুঝতে পারিনি।

১৬ অক্টোবর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। সেই দিনটিকে 'ইথার ডে' হিসেবে চিহ্নিত করা হল। চারিদিকে ইথার দিয়ে অপারেশন করার চলন শুরু হয়ে

গেল। সবাই ইথার দিয়ে অপারেশন দেখার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠল। চিকিৎসকরা তখন ঠিক করলেন ইথার দিয়ে অপারেশন দেখতে হলে মোটা 'ফি' দিতে হবে। অনেক টাকা দিয়ে লোকে ইথার অপারেশন দেখা শুরু করলেন।

ডাক্তার মর্টন ঘোষণা করলেন তিনি ইথারের ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন, অতএব তাঁকে পুরস্কৃত করা হোক। কিন্তু দু'জন চিকিকিৎসক প্রতিবাদ জানালেন। প্রথম জন মর্টনের মাস্টারমশায় ডাক্তার চার্লস থমাস জ্যাকসন, দ্বিতীয়জন মর্টনের বন্ধু হোরেন্স ওয়েল্স্।

জ্যাকসন্ বললেন ইথারের ব্যবহার আমি আগে থেকেই জানতাম। মর্টন এবং তার সহপাঠীরা যখন আমার ল্যাবোরেটরীতে কাজ করত তখন ইথার শুঁকে খেলা করত। আমি লক্ষ্য করে দেখতাম, যে সব ছেলেরা ইথার শুঁকে নেশা করত, তাদের সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ হত। এই থেকে আমার ধারণা হয়েছিল, ইথার বাজারে বিক্রির জন্য 'লেথিডন' নাম দিয়ে বার করেছিলাম।

হোরেস ওয়েল্স্ দাবি করলেন তিনি মর্টনের আগেই নাইট্রাস অক্সাইড্ দিয়ে অজ্ঞান করার প্রচলন শুরু করেছিলেন। অতএব রোগীকে অজ্ঞান করার কৃতিত্ব তাঁরও।

আমেরিকান কংগ্রেস ডাক্তার মর্টনের দরখাস্ত পেয়ে কি করবেন ভেবে পেলেন না। তাঁরা প্রায় সাব্যস্ত করে ফেলেছিলেন মর্টনকে এক লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন, কিন্তু এই ধরনের প্রতিবাদপত্রে থতমত খেয়ে গেলেন। কয়েক বছর ধরে সিনেটে এই ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক চলল। ডাক্তার মর্টনের তরফে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটর ছিলেন। তাঁরা ক্রমাগত দাবি জানাতে লাগলেন, মর্টনকে পুরস্কার দেবার জন্যে। একদিন যখন এই ব্যাপার নিয়ে সিনেটে তর্ক হচ্ছিল, তখন একজন সিনেটের দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন—ডাক্তার মর্টন কখনই পুরস্কার পেতে পারেন না।

—কেন? তিনিই তো প্রকাশ্যভাবে ইথারের ব্যবহার করেছেন।

—না। ডাক্তার মর্টন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইথারের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই ঐতিহাসিক ঘটনার চার বছর আগে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইথারের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়।

—প্রমাণ দিতে পারেন?

—নিশ্চয়ই। এই দেখুন—জর্জিয়া হাসপাতালে ডাক্তার ক্রফোর্ড ডব্লু লঙ্ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জেম্স্ ভেনেবল্ নামের এক রোগীকে ইথার দিয়ে অপারেশন করেছেন।

—এ ঘটনা যে সত্য তার প্রমাণ কি ?

—এই দেখুন জেমস্ ভেনেবল্-এর এফিডেবিট্। তিনি কোর্টে বিচারকের সামনে শপথ নিয়ে সমস্ত কথা স্বীকার করেছেন। এ ধরনের শপথ বাক্য কোন দিন মিথ্যে হয় না।

এফিডেবিটের কাগজ সমস্ত সিনেটর পড়তে লাগলেন। জেম্স্ ভেনেবল্ নিজে ঘোষণা করেছেন, ডাক্তার লঙ্ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমার পিঠের দুটো টিউমার ইথার শুঁকিয়ে অপারেশন করেন। ইথার শোঁকার জন্য আমি কোন যন্ত্রণা অনুভব করিনি। আমি তখন অ্যাকাডেমিতে পড়তাম। ডাক্তার লঙ্ আমাকে বার বার অপারেশন করতে বলেন, কিন্তু যন্ত্রণায় ভয়ে আমি অপারেশন করতে রাজী হইনি। ডাক্তার লঙ্ এর বার বার অনুরোধে আমি আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম। একদিন বিকেলবেলায় স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর আমার অপারেশন শুরু করা হল। বেশ মনে আছে দিনটি ছিল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে।

আমি ইথার শুঁকতে আরম্ভ করলাম। তখনও অপারেশন শুরু হয়নি। কখন আমার অপারেশন আরম্ভ হয়েছিল, আমি জানি না। জ্ঞান হতে দেখি আমার অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। টিউমার দুটি বাদ হয়ে গেছে এবং অপারেশনের ব্যাথা যন্ত্রণা বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারিনি।

আমেরিকান কংগ্রেসের অধিবেশনে এই এফিডেবিট্ পাঠ করার পর সমস্ত সদস্য আর তর্ক করতে সাহস করলেন না, এবং নির্বাক্ হয়ে গেলেন। ডাক্তার মর্টনকে কোন আর্থিক পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হল না। আমেরিকা ইউনিভারসিটি থেকে তাঁকে শুধু অনরারি ডিগ্রী দেওয়া হল এবং ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ্ সায়ান্স থেকে তাঁকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হল। ডাক্তার মর্টন-এর মন একেবারে ভেঙে গেল এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

ভেনেবল্ এর এফিডেবিটের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে, কারণ ভেনেবল্এর এফিডেবিট ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে মোটেই পেশ করা হয়নি। এই এফিডেবিট প্রকাশ করা হয়েছিল ডাক্তার মর্টন-এর প্রকাশ্য ঘোষণার তিনবছর পরে।

মর্টন বা আমেরিকার ইথার ব্যবহারের পরই পৃথিবীতে অ্যানেস্থেসিয়ার প্রচলন

হয়নি। মর্টনএর কৃতিত্বের কথা বৃটিশ সার্জনদের কানে আসে। বৃটিশ সার্জনদের অন্যতম ডাক্তার জেম্স্ ওয়াই সিম্পসন্, গ্লাসগো ইউনিভারসিটির প্রসূতিবিদ্যার প্রফেসর অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে প্রসবের প্রচলন শুরু করলেন।

ডাক্তার সিম্পসন্ ইথারের বদলে ক্লোরোফর্মএর ব্যবহার শুরু করেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর ঘোষণা করলেন, ফোঁটা ফোঁটা ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে সুন্দরভাবে নির্বিঘ্নে প্রসব করানো যায়। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার করেন ফরাসী কেমিস্ট জীন্ ব্যাপ্টিস্ট আন্দ্রে ডুমা।

ডাক্তার সিম্পসনকে ধর্মযাজকরা তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁরা বললেন বাইবেলে বর্ণিত আছে ঈশ্বর নারীকে বলেছিলেন, সন্তান জন্মের সময় তোমাদের ব্যথা হবে। সেই ব্যাথা অনুভব করার পর জীবনের পাপ লাঘব হবে।

ধর্মযাজকরা বাইবেলের উক্তি ঘোষণা করে বললেন কেউ যেন সিম্পসনের পদ্ধতিতে প্রসব না করায়। দেশসুদ্ধ সকলে ডাক্তার সিম্পসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগলেন এবং কেউ প্রসবের সময় যেন ক্লোরোফর্ম ব্যাবহার না করেন। ডাক্তার সিম্পসন্ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে এই সমস্ত কুসংস্কারাছন্ন মতবাদের খণ্ডন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনল না। সিম্পসন্‌কে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে প্রসব করানো সকলে মিলে বন্ধ করে দিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কুইন ভিক্টোরিয়ার সপ্তম সন্তান কুমার লিওপোল্ড জন্মগ্রহণ করেন। লিওপোল্ড জন্মানোর সময় রানী ভিক্টোরিয়ার অসম্ভব রকমের প্রসবব্যথা হয়। তিনি প্রসবব্যথায় পাগল হয়ে যাবার মত হলেন। অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় না পেয়ে, তিনি সকাতরে চিকিৎসককে বললেন—আমাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে দিন।

কুইন ভিক্টোরিয়াকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করে দেওয়া হল এবং নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। যেদিন ভিক্টোরিয়াকে বেহুঁশ করে সন্তান ভূমিষ্ঠ করানো হল, সেদিন থেকে সমস্ত ধর্মযাজক একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। দেশের জনসাধারণও আর কোন সমালোচনা করতে সাহস করলেন না। সেদিন থেকে সারা পৃথিবীতে অ্যানেস্থেসিয়ার প্রচলন হল।

অ্যানেস্থেসিয়া আবিষ্কৃত হবার পর চিকিৎসাশাস্ত্রে সার্জারির কত উন্নতিসাধন ঘটেছে। যে সব অপারেশনের কথা আগে কল্পনাও করা যেত না, অ্যানেস্থেসিয়া আবিষ্কৃত হবার পর সেই সব অপারেশন নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন এক একটি অপারেশন সাত আট ঘণ্টা ধরে করা হয়, তা

শুধু সম্ভব হয়েছে অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য, অথচ সাধারণ মানুষ অ্যানেস্থেটিস্ট এর নাম পর্যন্ত জানতে পারেন না; খ্যাতি হয় শুধু সার্জনের। একটি রোগীর সফল অপারেশনের জন্য সার্জনের যতখানি কৃতিত্ব, ঠিক ততখানি কৃতিত্ব যিনি অপারেশনের সময় রোগীকে জ্ঞানহীন করে রাখেন।

॥ পঁচিশ ॥

ব্যাটিস্টা গ্রাসী এবং রবার্ট কক্ যখন ইটালীর মাঠে মাঠে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন ভারতবর্ষে আর একজন লোক ম্যালেরিয়ার কারণ সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন।

তাঁর নাম রোনাল্ড রস্।

রোনাল্ড রস্ (Ronald Ross)-এর জন্মভূমি ভারতবর্ষে, হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়া শহরে। রোনাল্ডের বাবা একজন যোদ্ধা ছিলেন এবং সীমান্তবর্তী দেশের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতেন, কিন্তু রোনাল্ড সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছেলে ছিল। তার গান শিখতে খুব ভাল লাগত। নিজে গান লিখতো আর নিজের মনে তাতে সুর দিত। বাবা দেখলেন ছেলে ভারতে থাকলে একেবারে বিগড়ে যাবে, তাই ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন।

১৮৭০খ্রীষ্টাব্দ। পাস্তুরের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। অনেক ছাত্রই সাধারণতঃ ডাক্তারি পড়ার জন্য উৎসুক। রোনাল্ডও ডাক্তারি পড়তে ঢুকলো। কিন্তু ডাক্তারিতে একটুও মন ছিল না। সে পাস করল বটে, কিন্তু প্রেসক্রিপশন লিখতোই না। তার বদলে সে শুরু করল উপন্যাস লিখতে। তার ধারণা ছিল, সে যা উপন্যাস লিখছে, প্রকাশকরা শুনলে চমকে উঠবে। দেশের চারদিকে হই হই পড়ে যাবে!

কিন্তু হায়! রস্ পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরল, কিন্তু কেউই পাত্তা দিল না। কেউ হয়ত দয়াপরবশ হয়ে পাণ্ডুলিপি শুনতো, কিন্তু চমকে ওঠা দূরে থাকুক, উপন্যাস প্রকাশ করার ধারে কাছে যেত না। রোনাল্ড তখন নিজের পয়সায় উপন্যাসগুলো ছেপে ফেললো, ভাবলো এবার দেশবাসী অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, এই নতুন ঔপন্যাসিক কে?

চারদিকে তার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

কিন্তু কোথায় কী? কেউ রোনাল্ডের ছাপানো বই উলটেও দেখলো না। একখানা বইও বিক্রি হল না।

এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে রোনাল্ডের বাবা কঠোর ভাবে চিঠি দিলেন,—বাঁদরামি করার জন্য টাকা পাঠাই না। তোমাকে আর টাকা পাঠাবো না। তুমি নিজে রোজগারের বন্দোবস্ত কর।

রোনাল্ড নিরুপায় হয়ে এক জাহাজের ডাক্তার হলেন। জাহাজটি লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাতায়াত করতো। এই জাহাজে বসে বসে কবিতা লিখতেন তিনি। জীবনের ব্যার্থতার কথা লিখতেন, মানুষের যন্ত্রণার কথা লিখতেন। যাত্রীদের হাসিকান্না নিয়ে রচনা করতেন নতুন নতুন কবিতা।

এমন সময় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন রোনাল্ড রস্। ভারতবর্ষে ডাক্তার হয়ে ফিরে এলেন তিনি। ভারতে আসাতে তিনি খুব খুশীই হলেন। অতি অল্প সময়ের জন্যে তাঁকে রোগী দেখতে হত, বাকী সময়টা কবিতা লিখে কাটিয়ে দিতেন।

বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে রস্ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন, আর ফিরে গিয়েই নতুন ভাগ্যের সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে মিস রোসা ব্লক্সাম্ (Miss Rosa Bloxam)-এর বিবাহ হল, তারপর তিনি স্ত্রীসহ ভারতে ফিরলেন। ফেরার সময় জাহাজের বিষয় নিয়ে লিখলেন 'চাইল্ড অফ ওসান' (Child of Ocean) উপন্যাস। সেই বোধহয় তাঁর শেষ উপন্যাস। সাহিত্যিক রোনাল্ড রস্ বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন কোন এক জাদুমন্ত্রে। রস্এর মাথায় ঢুকলো—কেন এত নেটিভ হিন্দু ম্যালেরিয়ায় মারা যায়? ম্যালেরিয়া কেন হয়? যে লোক কিছুদিন পূর্বেও কালি কলম নিয়ে মত্ত ছিলেন উপন্যাস কবিতা রচনা করার জন্যে, তিনিই এখন মাইক্রোস্কোপের তলায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু অন্বেষণে তন্ময়।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু—? হ্যাঁ—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনার চিকিৎসক ল্যাভেরান বলেছেন ম্যালেরিয়ার স্বতন্ত্র জীবাণু আছে। সেই জীবাণু রক্তের ভিতরে প্রবেশ করলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে।

আরম্ভ হল গবেষণা। দিনের পর দিন রোনাল্ড রোগীদের আঙুলে ফুটিয়ে রক্ত বের করে নেন। তারপর সেই রক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করেন। কিন্তু কিছু দেখতে পান না। কোথায় ল্যাভেরানের আবিষ্কৃত মালেরিয়ার জীবাণু? যত সব বাজে!

এদিকে হয়েছে আর এক বিপদ। রোগীরা আঙুল ফুটো হবার ভয়ে আর হাসপাতালের দিকে পা বাড়ায় না। হাতে পায়ে ধরে, ভিক্ষে করে রোনাল্ড যে কয়েকজনের রক্ত পান পরীক্ষা করে তাতে কিছুই দেখতে পান না। দিনের পর দিন পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে রোনাল্ড হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন,—না, ল্যাভেরান নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। ছত্রিশ বছর বয়স তখন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। জীবনে যা কিছু করতে গিয়েছেন তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন বার বার।

কিন্তু এই ব্যর্থ হয়ে লণ্ডনে আসার পেছনে বোধহয় সৌভাগ্যের ইঙ্গিত ছিল। অলক্ষ্যে তাঁর ভাগ্য বিধাতা তাঁকে নিয়ে গেলেন লণ্ডনের একটি বাড়িতে, যেখানে প্যাট্রিক ম্যানসন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। প্যাট্রিক ম্যনসন সাংহাইতে প্রাকটিস করতেন। তিনি সেখানে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন মশা চীনাদের শরীর থেকে জীবাণু চুষে চুষে খায়। তিনি আরও বলেছিলেন এই জীবাণুগুলো মশার পেটে জন্মায়। হারলি স্ট্রীটের বিখ্যাত ডাক্তাররা ম্যানসনের এই উদ্ভট উক্তিকে বিদ্রূপ করে বলতেন,—ম্যানসন হলেন চিকিৎসা জগতের জুলে ভার্নে (Jules Verne)।

জুলে ভার্নের কথা নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো। টোয়েণ্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী, মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড, জার্নি টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ, রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন্ এইটটি ডেজ্ প্রভৃতি অমর সাহিত্যের স্রষ্টাকর্তা। সাবমেরিন আবিষ্কারের পূর্বেই তিনি সাবমেরিনের কথা লিখে গিয়েছিলেন। এরোপ্লেন আবিষ্কারের আগে তিনি বেলুনের কথা কল্পনা করে লিখে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক যুগের লোকেরা তাঁর লেখা পড়ে হাসতেন। বলতেন গাঁজাখুরি লেখার রাজা হলেন জুলে ভার্নে।

ম্যানসনের কথাকে কেউ বিশ্বাস করতেন না বলে সবাই তাঁকে জুলে ভার্নের সঙ্গে তুলনা করতেন।

অবিশ্বাস করেন নি একজন, তিনি রোনাল্ড রস্।

প্রত্যহ প্যাট্রিক ম্যানসনের বাড়িতে তিনি আসতেন, চুপচাপ বসে শুনতেন। ম্যানসন তাঁকে উপদেশ দিতেন,—রোনাল্ড, তুমি ভারতে ফিরে যাও। আমি বলছি তুমি ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করতে পারবে। তুমি ঠিক পথেই চলেছো। শুধু ধৈর্য ধরে কাজ করে যাও, দেখবে একদিন তুমি সফল হবে। তুমি

যেটুকু খুঁজে পাবে আমায় চিঠি লিখে জানিও। যদি কোন সমস্যায় পড়, তাও জানিও—আমি তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করবো।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ স্ত্রী-পুত্র রেখে একা রোনাল্ড রস্ প্যাট্রিক ম্যানসনের আশীর্বাদ মাথায় করে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

ভারতবর্ষ তখন এক নতুন জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত। বাঙলাদেশের যুবকের দল তখন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রে জাগ্রত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সে সময়ে এক কাণ্ড বাধলো। আর সেই গোলমাল থেকে সর্বভারতীয় বিপ্লব শুরু হল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা দেশপ্রেমিক হয়ে উঠলেন, কারণ তখনকার অধিকাংশ ইংরেজী সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমিকতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. পাস করার পরও তাঁকে কোন চাকরি দেওয়া হয় নি। অনেক গোলমালের পর অবশেষে তিনি চাকরি পেলেন, কিন্তু বিনা কারণে কয়েকদিনের মধ্যে আবার চাকরি চলে গেল।

বিটিশ সাম্রাজ্যের চাকরি যাওয়ার ফলেই সুরেন্দ্রনাথ একজন সর্বভারতীয় নেতা হয়ে উঠলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম বোম্বাই শহরে এক জাতীয় অধিবেশন আহ্বান করেন। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি বাঙালী ব্যারিস্টার সেই সভার সভাপতি ছিলেন। সেই অধিবেশনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। তার পরের ইতিহাস জাতির সংগ্রামের ইতিহাস। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম কাহিনী।

এই রকম সময় রোনাল্ড রস্ ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন। তাঁকে অবিলম্বে সেকেন্দ্রাবাদের সৈন্য শিবিরে বহাল করা হল। সেখানে তিনি অল্প কয়েকদিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। কোন রোগী তাঁর কাছে যেতে চায় না। সবাই ভয় পায়। বলে, ওই পাগলা ডাক্তারের কাছে গেলেই, হাত ফুটিয়ে রক্ত নেয়। ওর কাছে কেউ যাবো না।

শিবিরের কর্নেল পর্যন্ত ভাবলেন রস্এর মাথা খারাপ হয়েছে এবং পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে রস্ ম্যানসনকে চিঠি লিখে জানালেন, রিসার্চ একটুও এগোচ্ছে না। কেউ রক্ত দিতে চায় না।

ম্যানসন উত্তর দিলেন, তুমি ভুল পথে যাচ্ছো। লোক না চিরে, মশা চিরে দেখো কোন কিছু পাও কিনা!

নতুন ভাবে পরীক্ষা করলেন রস্। মশা ধরেন আর চিরে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে পরীক্ষা করেন। কোন রোগী পেলে তার গায়ে মশা ছেড়ে দেন

আর সেই মশা ধরে পরীক্ষা করেন। কিন্তু কিছু পান না। তাঁর অত্যাচারে রোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভয়েতে কেউ তার ধারে কাছে যায় না। কর্তৃপক্ষ উপায়ন্তর না দেখে তাঁকে বাঙ্গালোরে বদলি করে দিলেন। সেখানে তখন ভীষণ কলেরা হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ রোনাল্ডের ওপর আদেশ দিলেন যেন কলেরা অতি অবশ্য বন্ধ হয়। কিন্তু কলেরা তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। অগত্যা আবার তাকে সেকেন্দ্রাবাদে বদলি করা হল। রোনাল্ড প্রার্থনা করলেন যেখানে ম্যালেরিয়া বেশী এমন জায়গায় তাঁকে বদলি করলে খুব ভাল হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। সাহেব ডাক্তাররা সহজে ম্যালেরিয়াদুষ্ট জায়গায় যেতে চাইতেন না, তাই সহজেই রোনাল্ডের আবেদন মঞ্জুর হল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে তাঁকে বদলি করা হল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণে তখন প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে মহানন্দে রোনাল্ড গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন। রোনাল্ড দুজন সহকর্মী বহাল করলেন। একজনের নাম মহম্মদ বক্স। অন্যজন পারবুনা। এই দুজনে রাজ্যের মশা ধরে নিয়ে আসতো আর পরমানন্দে রস্ মশার দেহ চিরে যেতেন।

আর দিনের পর দিন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে চলত তাঁর অক্লান্ত সাধনা। একদিন পেলেন। এতদিনের সাধনার পর হঠাৎ একদিন তাঁর সিদ্ধির পথ খুলে গেল। তিনি পরম আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলেন ধূসর রঙের মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু রয়েছে।···কেটে চলেছেন। উন্মাদের মত একটার পর একটা মশা চিরে যাচ্ছেন আর জীবাণু দেখতে পাচ্ছেন।

এবার দেখা যাক পশু-পাখির দেহের ভিতর জীবাণু প্রবেশ করানো যায় কিনা? আরম্ভ করলেন গবেষণা। পাখির শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পাখির দেহে ম্যালেরিয়া ফুটে উঠল। তারপর সেই ধূসর রঙের মশাদের পাখির গায়ে ছেড়ে দিলেন। দেখলেন ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার পেটের ভিতর চলে গেছে। মশা যখন পাখিকে কামড়াল তখন শুঁড় দিয়ে রক্ত টেনে নিয়েছিল। রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণুও সে শুষে নিয়েছে। সেই মশাগুলোকে কয়েকদিন খাঁচায় রেখে আবার ভাল পাখিদের গায়ে ছেড়ে দিলেন, দেখলেন ভাল পাখিদেরও ম্যালেরিয়া হয়েছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন রোনাল্ড রস্। তাঁর আবিষ্কারের কথা ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করলেন আর তাঁর গুরু প্যাট্রিক ম্যানসনকে লিখে

জানালেন,—আমি ম্যালেরিয়ার সন্ধান পেয়েছি। ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাখির দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই ধূসর রঙের মশা দ্বারা ম্যলেরিয়া রোগ ছড়ায়।

প্যাট্রিক ম্যানসন চিঠি পড়ে রসকে উত্তর দিলেন,—প্রিয় রস্, তোমার সার্থকতার কথা পড়লাম। তুমি পাখির শরীরে ম্যালেরিয়া রোগ তৈরি করেছো শুনে সত্যই আমি আনন্দিত। কিন্তু তোমার রিসার্চের শেষ এখনো হয় নি। পাখির শরীরে যা সত্য, মানুষের শরীরেও যে তাই ঘটবে এ ধারণা তোমার কিসে হল? যতক্ষণ তুমি প্রমাণ করতে না পারবে যে মানুষের শরীরেও ওই একই ভাবে রোগ সংক্রামিত হয়, ততক্ষণ তোমার রিসার্চ অসম্পূর্ণ। তুমি আরও চালিয়ে যাও। আমার আশীর্বাদ রইল।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। ইটালীর গ্রামে গ্রামে রবার্ট কক্ ও জিওভানী ব্যাটিস্টা গ্রাসী (Giovanni Battista Grassi) নামে দুজন বৈজ্ঞানিক ম্যালেরিয়ার বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। দেখা যাক সম্মানের জয়মুকুট ইটালীর ভাগ্যে যায় না ইংলণ্ডের ভাগ্যে যায়!

রোনাল্ড রস্ যখন ভারতবর্ষের বুকে বসে আবিষ্কার করেছেন ধূসর রঙের মশার পেটে ম্যলেরিয়া রোগের জীবাণু জন্মগ্রহণ করে, আর সেই মশা পাখিকে কামড়ালে পাখির ম্যালেরিয়া রোগ হয়, তখন ইটালীতে দুজন মনীষী ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। একজন স্বনামধন্য রবার্ট কক্ অন্যজন তরুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাটিস্টা গ্রাসী।

গ্রাসী সজোরে মাথা নেড়ে রবার্টকে বললেন,—জানেন, আমি ইটালীর এমন জায়গা দেখেছি, যেখানে মশা ভরতি অথচ সেখানে ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু এমন একটি জায়গাও দেখিনি যেখানে ম্যালেরিয়া আছে অথচ মশা নেই।

—তা থেকে তোমার কী মনে হয়?—প্রবীণ বৈজ্ঞানিক থতমত খেয়ে নবীনকে প্রশ্ন করলেন।

—তা থেকে এই মনে হয় যে বিশেষ কোন শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করছে। আমার গবেষণা হবে কোন্ শ্রেণীর মশা এই জীবাণু বহন করছে তা আবিষ্কার করা।

কক্ গ্রাসীর কথা বিশ্বাস করলেন না। বার্ধক্যের জন্য তিনি ভালভাবে চিন্তা করতে পারতেন না। এলোমেলো যা-তা ভাবতেন।

ব্যাটিস্টা গ্রাসী ইটালীর প্রান্তরে প্রান্তরে ম্যালেরিয়া জীবাণু অন্বেষণে ঘুরে

বেড়াতে লাগলেন। তিনি কেবল বলতেন,—ম্যালেরিয়া ইটালীর সর্বনাশ করে দিল। চাষীর দল এই রোগের মড়কে নিঃশেষ হয়ে গেল। যে করেই হোক এই রোগের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে।

ইটালীর কারপাসিও উপত্যকায় রেললাইন পাতা আরম্ভ হয়েছিল তখন, কিন্তু রেল কোম্পানির কর্মচারী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উজাড় হয়ে যেতে লাগল। কেউ আর ভয়ে কাজ করতে চায় না। গ্রাসী এমনি একটা জায়গা খুঁজছিলেন নিজের গবেষণার জন্যে। তিনি ইটালীর সরকারকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অর্থ মঞ্জুর করলেন গ্রাসীর গবেষণার সুবিধের জন্যে।

গ্রাসী গবেষণা করতে করতে দেখলেন তিনি যা ভেবেছেন তাই ঠিক। বিশেষ একশ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। যেখানে সে মশা নেই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নেই। যেখানে সে মশার প্রাচুর্ভাব, সেখানেই ম্যালেরিয়ার মড়ক।

কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মশা জীবাণু বহন করে?

আবার গবেষণা। আবার অন্বেষণ। খুঁজতে খুঁজতে একরকম বিশেষ শ্রেণীর মশা খুঁজে পেলেন, যারা মানুষের দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করতে তারা বলল,—আমরা এই মশাদের জাঞ্জারোন (Zanzarone) বলি।

জাঞ্জারোন—জাঞ্জারোন…।

ব্যাটিস্টা গ্রাসীর মস্তিষ্কের ভিতর আগুন জলতে লাগলো। তিনি স্পষ্ট দেখলেন রক্তপায়ী মশাদের লেজগুলো আকাশের দিকে তোলা, আর এগুলো স্ত্রী-মশক। বহুদিন আগে থেকেই বিশেষজ্ঞরা এই জাতের মশার নাম রেখেছেন অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজার (Ano-Pheles Claviger)।

অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজার। অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজারের স্ত্রী-মশা ম্যালেরিয়া বহন করে বেড়ায়। সেই বাহক মশা যখন মানুষের রক্ত শোষণ করে, তখন দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয় ম্যালেরিয়ার জীবাণু। গ্রাসীর জীবনের গবেগণার বিষয় হয়ে উঠল অ্যানোফিলিস মশা আর ম্যালেরিয়ার জীবাণু। যেখানেই অ্যানোফিলিস মশা দেখতে পান, পাকস্থলী চিরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পরীক্ষা করেন।

গ্রাসী রোমে ফিরে এলেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর লিনসেই (Lincei) অ্যাকাডেমির সামনে তাঁর গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করলেন,—"অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে এবং মশার কামড় থেকেই ম্যালেরিয়া হয়।"

তারপর গ্রাসী রোমের হোলি স্পিরিট হাসপাতালের ডাক্তার ব্যাস্টিয়ানেলীর (Dr. Bastianelli) সঙ্গে দেখা করলেন। পাহাড়ের ওপর সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে এই হাসপাতাল। কোনদিন কোন লোক এখানে ম্যালেরিয়ায় ভোগে নি। গ্রাসী এখানেই নিজের গবেষণা করবেন বলে স্থির করলেন। সেই হাসপাতালের রোগী মিঃ শোলা এগিয়ে এলেন গবেষণার রোগী হিসেবে। তিনি বললেন,—আমার গায়ে যত ইচ্ছে মশা ছেড়ে দিন। আমার কিচ্ছু হবে না।

গ্রাসী, ব্যাস্টিয়ানেলী এবং গ্রাসীর অন্যতম সহকারী বিগনামী মিঃ শোলার গায়ে অ্যানোফিলিস মশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর কিছুই হয় নি। ব্যাস্টিয়ানেলী একটু দমে গেলেন। রবার্ট কক্ ঘোষণা করলেন, গ্রাসীর আবিষ্কারে ভুল আছে। ম্যালেরিয়া মশা দ্বারা হয় না।

গ্রাসী দমলেন না। তিনি রোমের বাইরে চলে গেলেন, তারপর সেখান থেকে এক বাক্স অ্যানোফিলিস মশা ধরে নিয়ে এসে মিঃ শোলার গায়ে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন মিঃ শোলার কাঁপিয়ে জ্বর এলো।

গ্রাসী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ মিঃ শোলার রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বর্তমান।

গ্রাসীর সাধনা এতদিনে সার্থক হল।

হঠাৎ একদিন একটা মেডিকেল জার্নালের পাতা খুলে অবাক্ হয়ে গেলেন ব্যাটিস্টা গ্রাসী। ভারতবর্ষের কলকাতা শহরের প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতলে রোনাল্ড রস্ নামে এক ডাক্তার প্রমাণ করেছেন মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু জন্মায় আর সেই মশা পাখিকে কামড়ালে পাখির ম্যালেরিয়া হয়। ম্যালেরিয়া জীবাণু কেমন দেখতে তাও তিনি এঁকে দেখিয়েছেন। অবাক হয়ে গ্রাসী দেখলেন, তিনি যা আবিষ্কার করেছেন, অবিকল সেই জিনিসই রোনাল্ড রস্ আবিষ্কার করেছেন।

আবিষ্কারের তারিখটা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন ব্যাটিস্টা গ্রাসী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক তাঁর আবিষ্কারের এক বছর আগে।

—কিন্তু আমি তো রস্-এর নাম শুনিনি। আমি যা কিছু করেছি, নিজের মৌলিক গবেষণায় করেছি। অন্যকে তো অনুকরণ করিনি! অনেকটা নিজের মনেই বিড়বিড়য়ে বললেন ইটালীর হতভাগ্য আবিষ্কারক ব্যাটিস্টা গ্রাসী। হতভাগ্য কেন বললাম তা একটু পরেই বুঝতে পারবে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রোনাল্ড রস্‌কে সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট প্রিন্স অগাষ্টি নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি লিখলেন,—ইসমেলিয়া শহরে এত বেশী ম্যালেরিয়ার উপদ্রব যে ক্যানালের কর্মীরা কাজ করতে পারছে না। যদি এই ভয়াবহ রোগ থেকে আমাদের না বাঁচান, তাহলে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে আমাদের।

চিঠি পেয়ে রোনাল্ড রস্ ইসমেলিয়া শহরে উপস্থিত হলেন। কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে দেখলেন শহরের এঁদো পচা নরদমায় কোটি কোটি শিশুকীট জন্মে রয়েছে। এগুলো থেকেই মশা উৎপন্ন হবে বুঝতে পারলেন তিনি। এগুলোকে মারতে পারলে মশার উপদ্রব কমে যাবে আর অধিবাসীরাও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পাবে। এখন, কী করে এই শিশুকীটগুলোকে মারা যায় তাই ভাবতে লাগলেন রস্। হঠাৎ একদিন মাথায় এলো অক্সিজেনের জন্যেই ওই কীটগুলো বেঁচে আছে। অক্সিজেন বন্ধ করে দিলে সব দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

অনেক ভেবে রস্ এক উপায় বের করলেন। নরদমায় টিন টিন তেল ঢালতে লাগলেন। তেলের একটা স্তর পড়ে গেল নরদমার ওপর। ফলে সব কীট তেলের তলায় পড়ে মরে গেল। ওদিকে জাদুর মত সমস্ত মশা শহর ছেড়ে পালাল। আর তার ফলে শহরও ম্যালেরিয়া মুক্ত হল।

রোনাল্ড রসের জয়জয়কার শুরু হয়ে গেল চারিদিকে। তিনি ইসমেলিয়া শহরকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করেছেন। ক্রমে সেই কথা ইংলণ্ডে গিয়ে পৌছুল। দেখতে দেখতে বিশ্ববাসী জানতে পারল রোনাল্ড রসের আবিষ্কারের কথা।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রোনাল্ড রসের কপালে আঁকা হল ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ সম্মান সার উপাধি।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল কমিটি সার রোনাল্ড রসকে নোবেল পুরস্কার দিলেন।

ইটালীর হতভাগ্য আবিষ্কারক ব্যাটিস্টা গ্রাসী হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির তলে। কেবল ইটালীর লোক ছাড়া অন্য দেশের লোকেরা ব্যাটিস্টা গ্রাসীর নাম ভাল করে শোনেও নি।

॥ ছাব্বিশ ॥

বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জোসেফ প্রিসলির কাছে একটি উপহার এল আমেরিকা থেকে। জোসেফ প্রিসলির তখন দেশজোড়া খ্যাতি। অল্প কয়েক বছর হল তিনি অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেছেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ। আমেরিকার বন্ধু তাঁকে উপহারের সঙ্গে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন।

বন্ধুবর প্রিস্‌লি,

তোমাকে একরকম গাছের রস পাঠালাম উপহার হিসেবে। আমেরিকার আদিবাসীরা এই রসকে বলে 'কচাও' (coutchue)। এই রসের কোন কাজ আছে কি না ঠিক জানি না, তবে শুনেছি মেক্সিকোর সম্রাট মণ্টেজুমা, ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজা হারনাডো কোর্টিস এবং তাঁর সৈন্যদলকে আপ্যায়ন করেছিলেন এক ধরনের খেলায়। এই গাছের রস শুকিয়ে তালের মত করে তাঁরা খেলেছিলেন।

তুমিও এখন খ্যাতিমান ব্যক্তি। তোমাকে উপহার দেবার মত কিছুই নেই, তাই এই সম্মানিত গাছের রসের তাল তোমাকে পাঠালাম। আশা করি তুমি এই তাল দিয়ে নতুন কিছু খেলা খেলতে পারবে। ইতি—

জোসেফ প্রিস্‌লি তালটি নিয়ে সত্যিই খেলা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পড়াশুনা করে, তাঁর মাথা টনটন করছে। বারবার একটা অঙ্ক পেনসিল দিয়ে করছেন আর মুছছেন। হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছেন না। পেনসিলের শিষের দাগ মোছার জন্য তিনি পাউরুটির গুঁড়ো ব্যবহার করতেন, কারণ আর কিছু তখনও ব্যবহারের জন্যে আবিষ্কৃত হয় নি।

অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারছেন না। পাঁউরুটির গুঁড়ো দিয়ে ঘষে চলেছেন শিষের দাগ। খাতার বেশির ভাগটা কালো হয়ে গেছে ঘষার জন্য।

হঠাৎ বন্ধুর পাঠানো রসের জমানো তালটির দিকে নজর পড়ল জোসেফ প্রিস্‌লির। নিতান্ত খেলার ছলে তালটি নিয়ে খাতার ওপর ঘষতে লাগলেন। জোসেফ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পেনসিলের দাগ সম্পূর্ণ উঠে গেল। সাদা ধবধবে খাতার পাতা। বিশ্বাসই করা যায় না, একটু আগেই এই পাতার উপর পেনসিলের দাগ কাটা ছিল।

আবার হিজিবিজি কাটলেন জোসেফ প্রিসলি। কচাও দিয়ে আবার ঘষলেন। সব ফরসা হয়ে গেল। পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে যে দাগ তুলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানী প্রিস্‌লি, বন্ধুর পাঠানো কচাও-এর আলতো ঘষাতে একদম মুছে গেল।

প্রিস্‌লি অবাক। এত সহজে, এত বড় সমস্যায় সমাধান হয়ে যাবে ভাবতেও পারেন নি জোসেফ প্রিস্‌লি। কি নাম দেবেন কচাও তালের? কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর ঠিক করলেন কচাও দিয়ে যখন ঘষতে হবে (Rub) তখন এর নাম রবার দেওয়াই সমীচীন। জোসেফ প্রিস্‌লির আমেরিকাবাসী বন্ধুর পাঠানো উপাহরের নাম হয়ে গেল রবার (Rubber)।

রবারের ব্যবহার শুরু হল উড্‌পেনসিলের শিষের দাগ তোলার জন্য। প্রিস্‌লির ঘোষণার পর থেকেই ইউরোপে কচাও রসের তাল রবার নামেই খ্যাতি লাভ করল এবং সকলেই পাঁউরুটির টুকরো ঘষে পেনসিলের দাগ তোলার বদলে রবার ঘষে দাগ তোলা আরম্ভ করলেন।

ইউরোপ এবং ইংলণ্ডের বহু জ্ঞানী ব্যক্তি রবারের নানা ব্যবহারের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা 'কচাও'কে আরও বড় রকমের সামাজিক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চার্লস্‌ গুডইয়ার এবং চার্লস্‌ ম্যাকিন্‌টশ্‌ রবার কিভাবে সুন্দর করে তৈরি করা যায়, তার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। ম্যাকিনটশ্‌ দুপাশে কাপড় বিছিয়ে মাঝখানে রবার গলিয়ে লেপে দিলেন। ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে রবার কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে গেল। ম্যাকিনটশ্‌ জল ঢেলে দেখলেন জল ম্যাকিনটশের তৈরি কাপড়ের ভেতর দিয়ে আসতে পারে না! ম্যাকিনটশ্‌ রবারের তৈরি কাপড় দিয়ে বর্ষাতি বানিয়ে বৃষ্টির মধ্যে মহানন্দে হাঁটতে লাগলেন। জামাকাপড় ভেজার কোন চিহ্ন নেই।

খানিকটা পরে বৃষ্টি থেমে গেল, সূর্য উঠল। রোদের গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবার গলে যেতে সুরু করল এবং খানিকটা পরে দেখা গেল রবার একেবারে গলে জামা প্যাণ্টে লেপ্টে একসা হয়ে গেছে।

চার্লস্‌ গুডইয়ার চিন্তা করতে লাগলেন। রবার সম্বন্ধে জানতে হলে পড়াশুনা করতে হবে। কিছু না জেনে এ কাজে নামা ঠিক হবে না, অথচ চিন্তার জন্য নিরিবিলি সময় পাচ্ছেন না। তাঁর লোহালক্কড়ের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু এই

গতানুগতিক ব্যবসায় তাঁর মন মোটেই বসে নি। তিনি নতুন কিছু করতে চান। সমাজকে নতুন কিছু দেবেন, অথচ তাঁর অর্থ হবে।

রবার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বই গুড্‌ইয়ার সংগ্রহ করলেন।

রোজই পড়াশুনা করেন চার্লস, গুড্‌ইয়ার। একদিন একটি গ্রন্থ খুলে তন্ময় হয়ে পড়লেন। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক জুয়ান ডি টরকুমাডা (Juan de torquemada) এক জায়গায় লিখেছেন মেক্সিকাম ইণ্ডিয়ানরা একরকম গাছের রস মিশিয়ে পোষাক ব্যবহার করেন। জুতো, জামাকাপড়, টুপি জাতীয় পোষাক গঁদের মত এই রস মিশিয়ে নেন। এই রস মিশিয়ে নিলে পোষাকের ভেতর দিয়ে জল ঢুকতে পারে না, কি রোদ আটকাতে পারে না, কারণ সূর্যের তাপ লাগলে এই রস গলে যায় এবং পোষাক নষ্ট হয়ে যায়।

গরমের হাত থেকে রবারকে ঠেকাতে পারলেই রবারের ব্যবহার আদৃত হবে। গুড্‌ইয়ার চিন্তা করতে সুরু করলেন, কিন্তু ব্যাঘাত পড়ল সদর দরজায় সজোরে কড়া নড়ে উঠতে। গুড্‌ইয়ার বই বন্ধ করে বাইরের দরজা খুললেন। দরজা খুলেই বিস্মিত। দরজার সামনে পুলিশ অফিসার, তাঁর সঙ্গে অনেক পাওনাদার।

চার্লস ভুলেই গিয়েছিলেন হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ের কথা। দীর্ঘদিন দোকানে না যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ে ভীষণ মন্দা পড়ে গিয়েছিল। বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঋণের মাত্রা পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠেছিল। পাওনাদারেরা সম্মিলিত ভাবে চার্লস গুড্‌ইয়ারের নামে কোর্টে কেস করে দিলেন।

পাওনাদারের টাকা না দিতে পারার জন্য চার্লস গুডইয়ারের জেল হয়ে গেল। আপীল না করে গুড্‌ইয়ার জেলখানার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আশ্চর্য মনোবল ছিল চার্লস গুড্‌ইয়ারের। সামাজিক অসম্মান হওয়া সত্ত্বেও একটুও দমিত না হয়ে তিনি রবার সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন রবার পদার্থকে যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নত করা যায়, তাহলে পৃথিবীব্যাপী এর চাহিদা হবে আর অর্থাগমও হবে প্রচুর। যে রবার প্রিস্‌লি ম্যাকিনটশ ব্যবহার করেছিলেন তার অসুবিধে হচ্ছে গরমে গলে যায়, ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে ভেঙে যায়। সব ঋতুতেই রবারকে একই ভাবে ঠিক রাখতে পারলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

গুড্‌ইয়ার জেলখানা থেকে বেরিয়ে রবারকে উন্নত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কচাও গাছের ছালের রস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করে দিলেন। ভাল ভাল রবার নিয়ে আসেন আর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে

পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কোন ফলই তিনি পেলেন না। এতদিনের কষ্ট, অসম্মান সবই এমন প্রকটভাবে চেপে ধরল যে গুড্ইয়ার অসুস্থ হয়ে পড়ল।

পাড়ার লোকেরা তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। অনেকে বললেন—রিসার্চ না ছাই, আবার লোকের পয়সা মারার ফিকির। দোকানদার ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল ; অভাবে, ক্ষিদের জ্বালায় পাগল হয়ে পড়বার মত অবস্থা হল চার্লস গুড্ইয়ারের।

একদিন গুড্ইয়ার এক রাসায়নিক পদার্থের দোকানে গিয়ে বললেন—আমায় একটু গন্ধক (Sulphur) দিতে পারেন ?

দোকানদার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—গন্ধক দিয়ে কি করবেন ? পাঁউরুটি নিয়ে যান, পেটের জ্বালা কমবে তবু।

গুড্ইয়ার উত্তর দিলেন—গন্ধক খেয়েই জীবনধারণ করব, দরকার হলে আত্মহত্যা করব।

—না মশায়। আপনি মরবেন, মরুন, কিন্তু আপনার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী হতে পারব না। আপনি আসতে পারেন।

গুড্ইয়ার দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। মনের মধ্যে দৃঢ় চিন্তা। আত্মহত্যা তাঁকে করতেই হবে। ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে সমস্ত রকমের শাস্তিই দিয়েছেন। ব্যবসায়ে বিফল, ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে জেল পর্যন্ত খাটলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে অভাবের জ্বালায় এখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।

অনেক ঘুরে ঘুরে গুড্ইয়ার একটি দোকান থেকে খানিকটা গন্ধক সংগ্রহ করলেন। গন্ধক মেশালে রবার খানিকটা পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু ভাল করে জমে না।

নিজের বাড়িতে এসে একটা ডেকচির মধ্যে খানিকটা গন্ধক ঢাললেন! ঘরের মধ্যে তাল তাল রবার জমানো। রবারের গন্ধে ঘরের আবহাওয়া কেমন ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গুড্ইয়ার মরীয়া। এর আগেও অনেকবার গন্ধক মিশিয়েছেন রবারের সঙ্গে, কিন্তু কোন ভাল ফল পান নি। গুড্ইয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সঠিকভাবে পদার্থের বিষয় সম্পূর্ণভাবে না জেনে ব্যবসায়ে নামবেন না। একবার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, আর সে পথে যাবেন না। হয় কৃতকার্য হবেন, নইলে এ জীবন আর রাখবেন না।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি দিনে গুড ইয়ার সারাদিন চেষ্টা করেছেন কিভাবে রবারকে উন্নত করা যায়। নানারকম ভাগ করে গন্ধক মিশিয়েছেন রবারের সঙ্গে, সারাদিন চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ—ব্যর্থ হয়েছেন চার্লস গুড্‌ইয়ার। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন স্থির করে ফেলেছেন, এ জীবন তিনি আর রাখবেন না। বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। সমাজের গ্লানি আর ধিক্কার বহন করে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

রবার আর গন্ধকের মিশ্রণ সামনের ডেকচিতে পড়ে আছে। এক দৃষ্টিতে ডেকচির দিকে তাকিয়ে আছেন গুড্‌ইয়ার। তাঁর চোখের কোণে জলের বিন্দু।

বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আত্মহত্যা করবেন গুড্‌ইয়ার। সমস্ত দিন পেটে একবিন্দু দানাপানি পড়ে নি। এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

রবার গন্ধক কি সরাসরি খাবেন? না—মানুষ হয়ে যখন জন্মেছেন, খাবার জিনিস কেন তিনি কাঁচা খাবেন? রান্না করে খাবেন। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে পারবেন, পৃথিবীতে শেষ খাওয়া পর্যন্ত তিনি রান্না করে খেয়েছেন।

একটা খালি ডেকচি উনুনের ওপর চড়িয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে শূন্য ডেকচিটা গরম হয়ে উঠল। এবার রান্নার জন্য কিছু দিতে হবে ডেকচির ওপরে, নইলে তেতে গরম হয়ে গলে যাবে ডেকচিটা।

কিছুটা রবার গন্ধক মেশানো মিকশ্চার ডেকচির ওপর ঢেলে দিলেন চার্লস গুড্‌ইয়ার।

আশ্চর্য!

গুড্‌ইয়ার বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন গরম লেগেও রবার চটচটে হয়ে যায় নি। সুন্দর আছে। নরম নরম অথচ শক্ত। গলেও যাচ্ছে না, আবার শক্ত কাঠও হয়ে যাচ্ছে না।

গুড্‌ইয়ার নামিয়ে নিলেন ডেকচিটা। স্পঞ্জের মত নরম লাগছে গরম করা রবার মিশ্রণ।

ডেকচির মধ্যে জল ঢেলে দিলেন গুড্‌ইয়ার। ঠাণ্ডা করলেন। জলের মধ্যে হাত চুবিয়ে টিপে টিপে দেখলেন রবারের তালটা একই রকম আছে। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য কোন পার্থক্য ঘটে নি। ঠিক স্পঞ্জের মতই আছে।

আবার একটা ডেকচি চাপালেন উনুনের ওপর। একমুঠো রবার মিশ্রণ ছেড়ে দিলেন ডেকচিতে। আগের মতই এবারও রবার তৈরি হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

গুড্ইয়ার আনন্দে আত্মহারা। রবার তৈরি করতে গেলে রবার গন্ধক মিশ্রণকে একটু গরম করে নিতে হবে।

তৈরি করা রবারগুলো উঠোনের মধ্যে ফেলে রাখলেন। সারারাত তুষারের ঠাণ্ডায় রবারগুলো পড়ে থাক। গরমে সুন্দর থাকে লক্ষ্য করেছেন গুডইয়ার। তুষারের ঠাণ্ডায় কেমন থাকে দেখতে হবে।

সকালবেলায় গুড্ইয়ার দেখলেন রবারের তালগুলি যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। ঠাণ্ডায় একটুও শক্ত হয় নি। স্পঞ্জের মতই নরম রয়ে গেছে। শক্তও হয়নি, বা ভঙ্গুর হয়নি। আগের রবারগুলো শক্ত হয়ে গেলেই একটু চাপ লাগলেই ভেঙ্গে যেত।

গুড্ইয়ারের উৎসাহ নতুনভাবে দেখা দিল। তিনি আবার রিসার্চ স্থরু করলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখলেন রবার-গন্ধক মিশ্রণের সঙ্গে চুন (Lime), ম্যাগ্নেসিয়া এবং সীসে (Lead) মেশালে রবার আরও উন্নত ধরনের হয়।

পাঁচ বছর ধরে নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করে দেখলেন গুড্ইয়ার। গরম না করলে কিছুতেই রবার তৈরি হতে পারে না, এ বিশ্বাস গুড্ইয়ারের দৃঢ়ভাবে হয়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন তাঁর পদ্ধতি পেটেণ্ট করে ফেলা একান্তভাবে দরকার। পেটেণ্ট করে নেওয়ার স্থবিধে, প্রথম যিনি পেটেণ্ট করবেন, তিনি ছাড়া আর কেউ ওই পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে পারবেন না।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গুড্ইয়ার তাঁর পদ্ধতি পেটেণ্ট করার জন্য দরখাস্ত করলেন। প্রথমে রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে নিতে হবে, তারপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে আগুনে গরম করতে হবে। কতটা গরম করতে হবে, সব তিনি নিখুঁত-ভাবে লিখে দিলেন দরখাস্ততে। আগুনে গরম করার পদ্ধতির নাম দিলেন 'ভালকানাইজেশন' (Vulcanization)। ভাল্কান্ (Vulcan) নামটি গুড্ইয়ারের মাথায় এসেছিল তার কারণ ভাল্কান্ হচ্ছে রোমানদের আগুনের দেবতার নাম। ভগবানের নাম দিয়ে তিনি পেটেণ্টের দরখাস্ত করে দিলেন।

এমন সময় গুড্ইয়ার পেটেণ্ট পেলেন যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লব স্থরু হয়েছে। ইউরোপের দিকে দিকে তখন শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। শিল্পের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে রবারের চাহিদাও বাড়তে লাগল।

শিল্পের সরঞ্জাম নিয়ে যাবার জন্যে নানারকম গাড়ির ব্যবস্থা তৈরি হল, কিন্তু মুশকিল হল চাকা নিয়ে। কারখানায় যেসব লোক যাতায়াত আরম্ভ করল, তারা

একরকমের যানবাহন ব্যবহার করত, যার নাম 'বাইসাইকেল'। বাইসাইকেলের চাকা লোহা বা কাঠের তৈরি হওয়ার জন্য খুব ভারি হয়ে যেত আর চালাতেও কষ্ট হত।

গুড্ইয়ারের তৈরি রবার দিয়ে যদি চাকা বানানো যায়, তাহলে যানটি হালকাও হবে, যানের গতিও বাড়বে। গুড্ইয়ার তাঁর তৈরি রবার দিয়ে বাইসাইকেলের চাকা তৈরি করলেন, এবং দেখা গেল বাইসাইকেল অতি সহজে সুন্দর ও স্বচ্ছন্দগতিতে চলছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, রবারের ব্যবহার সুরু হয়ে গেল। সভ্য সমাজে গুড্ইয়ারের তৈরি রবারের আদর বেড়ে গেল এবং চার্লস গুড্ইয়ার চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন ইতিহাসের পাতায়।

॥ সাতাশ ॥

ওডেসার চোখের হাসপাতাল। প্রফেসর ভি. পি. ভিলাটভ্ গভীরভাবে চিন্তা করছেন। একটি সুন্দর ছেলে ডাংগুলী খেলার সময় তার চোখে আঘাত পেয়েছিল। আঘাতটা লেগেছিল চোখের মণিতে। ঘা যখন শুকলো দেখা গেল চোখের মণি ঘষা কাচের মত অথবা পাথরের মত হয়ে গেছে। তার ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে না, তাই চোখের ভেতরের অংশ পুরোপুরি ভাল থাকা সত্ত্বেও ছেলেটি অন্ধ হয়ে গেছে।

—কোন ওষুধ নেই ডাক্তারবাবু? যাতে আবার চোখের মণি স্বচ্ছ হয়ে যায়। ছেলেটির বাবা কাতরভাবে প্রশ্ন করলেন।

—উঁহু। আমার অন্ততঃ জানা নেই। মাথা নেড়ে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন।

—তাহলে আমার ছেলে আর দৃষ্টি ফিরে পাবে না? ছেলেটির বাবার কণ্ঠস্বর কান্নার বেগে বন্ধ হয়ে এল।

—আজ তোমার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাও। আসছে সপ্তাহে এসো। এর মধ্যে ভেবে দেখি কী করতে পারি।

ছেলেটিকে নিয়ে তার পিতা চলে গেল।

ডাক্তার ফিলাটভ্ চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে ছেলেটির চোখ ভাল করা

যায়। অনেক চিন্তা করে ঠিক করলেন যদি কোন লোকের ভাল চোখের মণি (cornea) পাওয়া যায়, তাহলে অস্বচ্ছ মণি কেটে বাদ দিয়ে তার জায়গায় স্বচ্ছ মণি লাগিয়ে দিলে যদি জুড়ে যায়, তাহলে আবার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে।

কিন্তু স্বচ্ছ ভাল মণি কোথায় পাওয়া যায়?

ডাক্তার ফিলাটভ্ হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে রোগীদের বললেন—তোমরা একটি ছেলের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাকে সাহায্য করবে?

—কি সাহায্য? প্রায় একসঙ্গে সকলে জিজ্ঞাসা করল।

—তোমাদের মধ্যে কেউ একটা চোখের মণি আমাকে দান করবে?

সকলেই নীরব। কে চোখ নষ্ট করবে? চোখের মণি কেটে নিলে দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে এ সত্য সকলেরই জানা। সকলেই নীরব।

—তোমাদের দুটি চোখই আছে। ছেলেটির দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা কেউ যদি একটা চোখ দান কর, অন্য চোখে দেখতে পাবে। ছেলেটির চোখ অপারেশন করে একটা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারি হয়ত। একটি বালকের জন্যে তোমরা কেউ একটা চোখ দান কর। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।

ডাক্তার ফিলাটভ্ প্রত্যেক রোগীর বিছানার কাছে গিয়ে, বিনীতভাবে নিবেদন করতে লাগলেন। সমস্ত ওয়ার্ড নিস্তব্ধ। প্রত্যেক রোগী বাক্যহীন। হঠাৎ একটি অল্পবয়সী ছেলে বলে উঠল—আমার বন্ধুর জন্যে আমি একটা চোখ দান করব ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু পায়ে পায়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন যোশেফ। কাল তোমার বাবা মা এলে তাঁদের অনুমতি নিয়ে তোমার চোখ অপারেশন করব। আজ রাতে তুমি ঘুমোও।

যোশেফ পরম নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমলো কিন্তু ডাক্তার ফিলাটভের চোখে ঘুম নেই। যোশেফের মণি কেটে সেই মণি জোড়া দেবেন অন্ধ ছেলেটির চোখে। কিন্তু কীভাবে করবেন? চোখের মণিতে কোন রক্তশিরা নেই, সেলাই করার কোন জায়গা নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু অস্বচ্ছ মণিটা কেটে ফেলে দিয়ে সেই জায়গাতে স্বচ্ছ মণি বসিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাত অস্থির পায়ে ছটফটিয়ে বেড়ালেন ডাক্তার ফিলাটভ্।

পরদিন সকালে যোশেফের বাবা মা আসতে, তাঁদের সমস্ত কথা বলে যোশেফের মহান দানের প্রতিশ্রুতি শোনালেন।

যোশেফের বাবা মৃদু কণ্ঠে বললেন—বেশ, ডাক্তারবাবু আমার ছেলে যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তখন তার অমর্যাদা করা অন্যায় হবে। আপনি ওর চোখ নিন। আমার ছেলের একটি চোখ নিয়ে আর একটি ছেলে দৃষ্টি ফিরে পাক।

ডাক্তার ফিলাটভ্ সমস্ত আয়োজন করে ফেললেন। অন্ধ ছেলেটিকে একটি অপারেশন টেবলের ওপর শোয়ালেন, পাশের টেবলে শোয়ালেন যোশেফকে। ধীর অকম্পিত হাতে ডাক্তার ফিলাটভ্ প্রথমে যোশেফের মণি গোল করে কেটে অন্ধ ছেলের চোখের খাঁজে বসিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। যোশেফের চোখও ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

সাতদিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুললেন ডাক্তার ফিলাটভ্। অন্ধ ছেলেটি আনন্দে লাফিয়ে উঠল—আমি দেখতে পাচ্ছি ডাক্তারবাবু। পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার ফিলাটভের আনন্দও আর ধরে না। তার অপারেশন সার্থক হয়েছে। দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দান করতে পেরেছেন ডাক্তার ফিলাটভ্।

ডাক্তার ফিলাটভ্ ধীর পায়ে যোশেফের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার ব্যাণ্ডেজ খুলতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি জানেন ব্যাণ্ডেজ খোলার পর যোশেফ সে চোখে আর দেখতে পাবে না। সে বলবে—আমি এ চোখে দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তারবাবু—

নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ খুললেন ডাক্তার ফিলাটভ্। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর ডাক্তারবাবুকে আশ্চর্য করে দিয়ে যোশেফ জিজ্ঞাসা করল—যার জন্যে আমার চোখ নিয়েছেন, সে দেখতে পেয়েছে?

ফিলাটভের চোখে জল। অ্যাপ্রণের হাতায় চোখ মুছে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ যোশেফ, তোমার দান সার্থক হয়েছে।

১৯০৯ সালে ডাক্তার ফিলাটভ্ সর্বপ্রথম এই অপারেশন করলেন। প্রথম অপারেশনে সার্থক হবার পর ক্রমাগত তিনি এই অপারেশন করে চললেন, কিন্তু সমস্যা হল ভাল কর্ণিয়া যোগাড়ের। সকলেই তো আর যোশেফের মত মহৎ প্রাণের বালক নয়, যে এক কথায় চোখের ভাল মণি অন্য লোককে দান করে দেবে।

ডাক্তার ফিলাটভ্ মুশকিলে পড়লেন কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তিনি নতুন ভাবে গবেষণা শুরু করলেন। জীবিতর মণি নেওয়ার বদলে মৃত রোগীর ভাল চোখের মণি কেটে নিয়ে বরফের ঠাণ্ডার মধ্যে রেখে দিয়ে সেই মণি দিয়ে অপারেশনে কাজে লাগাতে লাগলেন। সকলে বলল মানুষ মরে যাবার পর তার শরীরের কোষে আর শক্তি থাকে না। সেই কোষ কখনও জীবিত মানুষের দেহে জোড়া লাগে? ডাক্তার ফিলাটভের বিশ্বাস যে কোন প্রাণীর কোষ মৃত্যুর পরও সজীব থাকে, এবং সেই কোষ খুব ঠাণ্ডার মধ্যে রাখলে (২° থেকে ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) নষ্ট তো হয়ই না বরং কোষের মধ্যে সজীবতা আরও বাড়ে।

আশ্চর্য!

মৃত ব্যক্তির চোখের মণি রোগীর চোখে জোড়া লাগালে আরও ভালভাবে জোড়া লেগে যায়। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন সেলাই না করেও জোড়া লাগানো জায়গাটি এত সুন্দরভাবে জুড়ে গেছে যে স্বাভাবিক জায়গা থেকেও শক্ত হয়ে উঠেছে। একটি নয়, দুটি নয় অনেক মণি এমনিভাবেই সুন্দর জোড়া লেগেছে আর পরীক্ষার ফলাফল জীবিত মানুষের মণির চেয়েও অনেক ভাল। তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষায় দেখলেন জীবিত মানুষের মণি নিয়ে অপারেশন করলে শতকরা চব্বিশ ভাগ ফল পাওয়া যায় অথচ মৃত ব্যক্তির মণি নিয়ে অপারেশন করলে শতকরা চৌষট্টি ভাগ ফল পাওয়া যায়।

ডাক্তার ফিলাটভ্ আবার গবেষণা শুরু করলেন। তিনি দেখলেন শুধু মণি নয়, শরীরের যে কোন অংশ মৃত্যুর পর শরীর থেকে কেটে নিয়ে হিমশীতল স্থানে রেখে দিলে, ত্বকের সজীবতা বাড়ে এবং সেই অতি সজীব ত্বক রোগীর রুগ্ন ত্বকের ওপর লাগিয়ে দিলে আপনা থেকেই সে অংশ জুড়ে যায়, ভাল হয়ে যায়।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ফিলাটভ্ পরীক্ষা করে চলেছেন। প্রত্যেকটি সংরক্ষিত ত্বকে এই অতি সজীবতা লক্ষ্য করলেন তিনি। তিনি বললেন মৃত্যুর পর কোষ কেটে নিয়ে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার মধ্যে রেখে দিলে সংরক্ষিত কোষগুলির মধ্যে কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়, যার জন্যে এই কোষগুলি ব্যবহার করলেই শরীরের ক্ষত কোষগুলি আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। তিনি এই পদার্থগুলির নাম দিলেন বায়োজেনিক স্টিমুলেটেরস্।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। যুদ্ধের জন্য ডাক্তার ফিলাটভের পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। যাঁরা ফিলাটভের চিন্তাধারাকে অবিশ্বাস করছিলেন,

তাঁরা বললেন—এ সব আজগুবি কথা। মৃত্যুর পর শরীরের কোন অংশই আর সজীব থাকে না।

—তাহলে আমি যে মণির জোড়া লাগিয়েছি সেগুলো কি মিথ্যে। ডাক্তার ফিলাটভ্ প্রতিবাদ করলেন।

—ওগুলো কাকতালীয়ভাবে জোড়া লেগেছে। মরা মানুষের মণি যেমন জোড়া লেগেছে, জীবিত মানুষের মণিও তেমনি জোড়া লেগেছে। সেইজন্যে এ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ডাক্তার ফিলাটভ্ বললেন—কিন্তু জীবিত মানুষের চোখের মণি দিয়ে যে অপারেশনগুলো করেছি, সেগুলো মোটেই ভাল হয়নি, তাছাড়া একশোটা অপারেশন করলে চব্বিশটা জোড়া লেগেছে, কিন্তু মৃত মানুষের মণি নিয়ে যেসব অপারেশন করেছি, সেগুলি সবই ভীষণ ভালভাবে জোড়া লেগেছে। শতকরা চৌষট্টিজনের অপারেশন সার্থক হয়েছে।

—তার অর্থ এই নয়, আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন। বিরুদ্ধ দলের ডাক্তাররা বললেন—তার প্রধান কারণ হল আপনি ভাল করে অপারেশন করেননি। যেগুলো ভালভাবে অপারেশন করেছেন, সেগুলো ঠিক হয়েছে, যেগুলো করতে পারেননি, সেগুলো জোড়া লাগেনি।

ডাক্তার ফিলাটভ্ কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর দেবার সময় এখনও আসেনি। এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা করতে হবে, আরও অনেক রোগীর অপারেশন করতে হবে, তারপর এক সিদ্ধান্তে পৌছনো যাবে।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফিলাটভের পরীক্ষার সুযোগ অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। হাসপাতালের দরজায় অন্ধ সৈনিকের ভিড়। গোলাগুলির আঘাতে তাদের চোখের মণি নষ্ট হয়ে গেছে। স্বচ্ছ মণি অস্বচ্ছ হয়ে গেছে বলেই তারা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে। অস্বচ্ছ মণি অপারেশন করে বাদ দিয়ে স্বচ্ছ মণি লাগিয়ে দিলে চোখ দুটো আবার আগের মত ভাল হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে সৈনিকেরা দলে দলে হাসপাতালের দরজায় ভিড় করেছে। তারা লোকমুখে শুনেছে ডাক্তার ভি. পি. ফিলাটভ্ এই ধরনের অপারেশনে বিশেষ পারদর্শী।

মৃতের সংখ্যাও অগণিত! মৃত সৈনিকেরা যেখানে সেখানে পড়ে আছে। তাদের তুলে নিয়ে কবর দিয়ে চলেছেন মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। ফিলাটভ্ এ সুযোগ ছাড়লেন না। যে সব সৈনিকদের মৃত্যু ঘটেছে অন্য কারণে, কিন্তু চোখ

দুটি ভাল আছে, তাদের চোখের মণি কেটে নিয়ে ঠাণ্ডায় তুলে রাখলেন ডাক্তার ফিলাটভ্। যে সব ব্যক্তি দু ঘণ্টা থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে মারা গেছে, তাদের মণি কেটে নিয়ে জমিয়ে রাখলেন ডাক্তার ফিলাটভ্।

সেই জমানো মণি দিয়ে অপারেশন শুরু করলেন অন্ধ সৈনিকদের।

অপারেশন করার সময়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন ফিলাটভ্। যে মণিগুলো কেটে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লাগাতেন, সেগুলো জোড়া লাগত না, কিন্তু যে মণিগুলো কয়েকদিন ঠাণ্ডায় রেখে ব্যবহার করতেন, সেগুলো অনায়াসে জোড়া লেগে যেত। ফিলাটভ্ আরও পরীক্ষা করলেন। অনেকদিন ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন কমপক্ষে সাতদিন ঠাণ্ডায় রেখে দিলে কোষগুলির সজীবতা বাড়ে। তিনি ঘোষণা করলেন কোষগুলির ঠাণ্ডার মধ্যে কমপক্ষে সাতদিন রেখে দিলে কোষের মধ্যে অতি সজীবতার সৃষ্টি হয়, এই অতিসজীবতার নাম বায়োজেনিক স্টিমুলেটরস্।

দীর্ঘদিনের পরীক্ষার ফল ডাক্তার ফিলাটভ্ কাগজে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ ১৯৩৩ সালে। তিনি বিশ্বসমাজকে জানালেন মৃত ব্যক্তির কোন অংশ কেটে নিয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রেখে দিলে একসপ্তাহের পর সেই অংশে অতি সজীবতার সৃষ্টি হয়। যার প্রভাবে এই অংশ আবার সজীব ত্বকের মতই ব্যবহার করে এবং জীবিত মানুষের কোন ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে আপনা থেকেই জোড়া লেগে যায়। এর জন্যে কোন সেলাইয়ের দরকার হয় না। এই অংশ ক্ষত অংশের সঙ্গে জোড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলে আপনা থেকেই জুড়ে যায় এবং ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

ফিলাটভের প্রবন্ধমালা বিশ্বের চারদিকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল এবং চিকিৎসক জগৎ সেই মনিষীর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে লক্ষ লক্ষ রুগ্ন মানুষকে সুস্থ করে তুললেন।

পৃথিবীখ্যাত রুশবিজ্ঞানী প্রফেসর ভি. পি ফিলাটভের পদ্ধতির পরবর্তী কালে আরও উন্নতি হয়েছে কিন্তু চিকিৎসকসমাজ আজও এই টিস্যু থেরাপি চিকিৎসার জনক ফিলাটভকে স্বীকার করে থাকেন।

॥ আঠাশ ॥

না! এতো সে রোগ নয়!

রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগের আসল কারণ আবিষ্কার করে অমর হয়ে গেলেন। কলকাতায় যে সব সৈন্যরা ছিল, তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। রোনাল্ড রস যতদিন না ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আবিষ্কার করেছেন, ততদিন আমাদের মতই ইংরেজদের ধারণা ছিল, দুর্গন্ধময় জলাশয়ের দূষিত বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করলে সারা শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসে। এই ভূতুড়ে জ্বর আর ছাড়তে চায় না। কারুর একদিন বাদে বাদে হাড় কাঁপিয়ে জ্বর আসে, কারুর বা দু'দিন বাদে আসে, কিন্তু আসে ঠিক। কেউ ধরতে পারে না কেন আসে। ফোর্ট উইলিয়মের ডাক্তার রোগীদের আলাদা করে পাঠিয়ে দেন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে প্রথমে রোগীর রক্ত টেনে নেন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক রোনাল্ড রস, তারপর তাদের খাইয়ে দেওয়া হত কুইনিনের বড়ি। কেউ কেউ সারতেন, আবার অনেকে মারা যেতেন এই রোগের প্রকোপে। ইটালীর অধিবাসীরা এই রোগের নাম দেন ম্যালেরিয়া। আমাদের দেশের মতই ইটালীতেও অনেক জলাশয় আছে যেখানের বাতাস দূষিত। ম্যালো কথার বাংলা অর্থ দূষিত এবং এরিয়া কথার অর্থ বাতাস। দূষিত বাতাসের মতই ইংরাজীর ম্যালো আর এরিয়া কথার সন্ধি করে নাম হয়েছে ম্যালেরিয়া।

বৃটিশ সৈন্যরা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসতে ভয় পেতেন ম্যালেরিয়ার জন্যে। একবার যদি এ রোগ ধরে আর ছাড়তে চাইবে না। শরীর ক্রমশঃ রক্তশূন্য হয়ে যাবে। প্লীহা ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে, তারপর একদিন রক্তশূন্যতার জন্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

—না। এ ম্যালেরিয়া নয়। ডাক্তার লিশ্‌ম্যান্ ফোর্ট উইলিয়াম-এর সৈন্যব্যারাকে রাউণ্ড দেবার সময় চিন্তিতভাবে মন্তব্য করলেন—এ ম্যালেরিয়া নয়? তাহলে এ আবার কী ভূতুড়ে রোগ রে বাবা? ডাঃ লিশ্‌ম্যানের সহকারী ডাঃ উইলিয়াম বেশ ভয়ার্তভাবে বললেন—হুঁ। চিন্তিতভাবে লিশম্যান্ জবাব দিলেন—আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, তোমার কথার কি জবাব দেব?

লিশ্‌ম্যান্ পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একটু জোরের সঙ্গে বললেন—তবে হলফ করে বলতে পারি, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয়।

—কিন্তু ম্যালেরিয়ার মতই এ রোগেও তো প্লীহা বড় হয়। সহকারীর মনে সংকটের উদয়।

—কথাটা বলেছো মিথ্যে নয়, কিন্তু দেখো উইলিয়াম, একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এ রোগে-সারা দেহ, বিশেষ করে মুখ কেমন কালীবর্ণ ধারণ করে। রোগীরা ক্রমশঃ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে যায়। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, ম্যালেরিয়া কুইনিন খাওয়ালেই ভাল হয়ে যায়, কিন্তু এ রোগে তা হয় না।

যুক্তি অকাট্য। উইলিয়াম আর তর্ক না করে শুধু বলল—তাহলে এ রোগটা কি রোগ ?

—আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ রোগ একেবারে অন্য রোগ কক্ষণো ম্যালেরিয়া নয় তবে কি রোগ এক্ষুণি বলতে পারব না।

—আপনি এত জোর দিয়ে কেন বলছেন স্যার যে, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয় ? উইলিয়াম বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

—বেশ। চল। কোয়ার্টার্সে গিয়ে আলোচনা করব। লিশ্‌ম্যান্ উত্তর দিলেন। উইলিয়াম আর কোন প্রশ্ন করল না। নিঃশব্দে গুরুর সঙ্গে হাঁটতে লাগল। লিশ্‌ম্যান কম্যাণ্ডার-ইন-চীফকে গোপনে নির্দেশ দিলেন, এই কালরোগে যদি কোন সৈনিক মারা যায়, তার দেহ যেন পার্ক ষ্ট্রীটের সিমেট্রিতে সমাধি দেওয়া না হয়, গোপনে তার দেহ যেন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

—দ্যাট্‌স্ রাইট ডক্টর। সেনাপতি সশ্রদ্ধভাবে জানালেন।

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বেরিয়ে লিশ্‌ম্যানের ফিটন রাজপথ ধরে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগল। গড়ের মাঠের দক্ষিণে পি. জি. হাসপাতালের লাগোয়া ডাক্তারদের কোয়ার্টার্স। কোয়ার্টার্সের চত্বরে এসে ফিটন্ গাড়ি দাঁড়াল। লিশ্‌ম্যান ও উইলিয়াম গাড়ি থেকে অবতরণ করে কোয়ার্টার্সের বারান্দায় বেতের ইজি-চেয়ারে উপবেশন করলেন। মিসেস লিশ্‌ম্যান্ নিজের হাতে তিনকাপ চা তৈরি করে ট্রের ওপর সাজিয়ে বারান্দার টেবলের ওপর রেখে, নিজে একটি চেয়ারে বসে, ওঁদের আলোচনায় যোগ দিলেন।

—দেখো উইলিয়াম, আমি রোনাল্ডের মত পৃথিবী-বিখ্যাত নই, কিন্তু আমি এ বিষয়ে ব্যাটিস্টার সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে প্রায় নিশ্চিত হয়েছি।

—কিসে নিশ্চিত হয়েছ ? মিসেস লিশ্‌ম্যান্ প্রশ্ন করলেন।

—এই কালাজ্বর সম্পর্কে।

—ও গড! মিসেস লিশ্‌ম্যান্‌ ভয়ার্তভাবে বললেন—কি ভয়ানক রোগ। একবার এ রোগ হলে আর নিস্তার নেই।

—এখানকার নেটিভ্‌রাও তাই বলেন।

লিশ্‌ম্যান্‌ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—ইউ নো উইলিয়াম! দিজ্‌ নেটিভ্‌স কল্‌ গড অফ ডেথ্‌ অ্যাজ্‌ যম অর কাল।

মিসেস লিশ্‌ম্যান্‌ বললেন—হ্যাঁ, হামি নেটিভদের সঙ্গে কথা বলেছি। উহারা গড অফ ডেথকে যম বলে। সামবডি কলস্‌ অ্যাজ্‌ কালা।

—অ্যাণ্ড ফিবার ইজ্‌ জ্বর, সো ডেথ ফিবার ইজ্‌ কালাজ্বর (Kala-azar)।

লিশ্‌ম্যান্‌ চিন্তিতভাবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন—আমি বলছি কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়া একেবারে আলাদা রোগ। আমি ব্যাটিস্টা গ্রাসিকে এ সম্পর্কে চিঠি লিখেছিলাম। সে জানিয়েছে, ইটালীতে কখনো এ ধরনের রোগ হয় নি এবং সে কখনও এই রোগ দেখে নি।

—ব্যাটিস্টা কে? মিসেস লিশ্‌ম্যান্‌ জিজ্ঞাসা করলেন।

লিশ্‌ম্যান্‌ গভীর দুঃখের সঙ্গে জানালেন—অ্যান্‌ আনফরচুনেট সায়ান্টিস্ট্‌ অফ্‌ ইটালী। রস যেমন কলকাতায় ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটের রিসার্চ করেছে, ঠিক তেম্‌নি ব্যাটিস্টা ইটালীতে করেছে। তার জীবনের চরম দুর্ভাগ্য, তার আবিষ্কারের ঠিক এক বছর আগে রোনাল্ড ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট্‌ আবিষ্কার করেন। রোনাল্ড আজ পৃথিবী-বিখ্যাত, কিন্তু ব্যাটিস্টার নাম কেউ জানেও না।

তিনজনেই চুপচাপ। ব্যাটিস্টার মর্মান্তিক দুঃখ যেন তিনজনের মনই স্পর্শ করেছে। নিঃশব্দে তিনজনে চা-পান করতে লাগলেন।

অল্পক্ষণ পরে উইলিয়াম কথা বলল। সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল —তাহলে এ রোগ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

—যতক্ষণ না পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করছি, ততক্ষণ সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে হলফ করে বলতে পারি, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয়।

—তবে এ কি রোগ? মিসেস লিশ্‌ম্যান্‌ জিজ্ঞাসা করলেন।

—সঠিকভাবে এক্ষুণি বলতে পারছি না। আগে কিছু রোগীর দেহ পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করে দেখি, তারপর আমার সঠিক সিদ্ধান্ত দেব।

চা-পান শেষ হয়ে গেল। উইলিয়াম বিদায় অভিবাদন জানিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিল।

মিসেস লিশ্‌ম্যান্‌ একটু ভয় পেয়ে বললেন—ইণ্ডিয়াতে হাজার রকমের

বিদঘুটে রোগ আছে। এখানে থাকতে আমার ভীষণ ভয় করে। চল, আমরা লণ্ডনে চলে যাই।

ডক্টর লিশ্‌ম্যান্ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—নো। আই ওয়াণ্ট্ টু সী দি এণ্ড্ অফ ইট। রস বলছে, এ রোগ এক রকমের ম্যালেরিয়া, রজার্সও তাই বলছে। অবশ্য ম্যান্‌সন্ জানিয়েছেন, তাঁর মতে এ ম্যালেরিয়া নয়।

লিশ্‌ম্যান্ একটু থেমে গম্ভীরভাবে বললেন—আমরা কখনও হার মানিনি। আজও মানব না।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। নানাদিক থেকে রোগী আসছে। সাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল ১৭৭০ সালে, কিন্তু তখন কোন ভারতীয়, এমন কি কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অধিকার ছিল না প্রবেশ করার। ধীরে ধীরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চিকিৎসার অধিকার দেওয়া হল, কিন্তু কোন ভারতীয়কে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না।

দমদম ফিভার, বর্ধমান ফিভার, কালাজ্বর যে যেমন খুশী নামে ডাকছে এই ভয়ংকর রোগকে, কিন্তু কেউ বাঁচাতে পারছে না রোগীকে। ডাক্তার লিশ্‌ম্যান্ এবং ডাক্তার রোনাল্ড রসের মধ্যে মতবিরোধ। রস বলছেন, এই রোগ এক রকমের ম্যালেরিয়া, লিশ্‌ম্যান্ বলছেন কক্ষণো নয়। এ রোগ সম্পূর্ণ আলাদা রোগ।

দমদম জ্বরে মারা গেলেন জনৈক সৈনিক। লিশ্‌ম্যানের নির্দেশমত তাঁর দেহ নিয়ে আসা হল হাসপাতালে। লিশ্‌ম্যান্ তাঁর যকৃৎ এবং প্লীহা কেটে বার করে নিলেন। পরীক্ষা করতে লাগলেন ল্যাবোরেটারীতে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি পাগলের মত পরীক্ষা করে চলেছেন। অণুবীক্ষণের নীচে প্লীহার টুকরো নিয়ে, যকৃতের অংশ নিয়ে দেখে চলেছেন।

—উইলিয়াম, এই দেখ। একদিন নির্জন ল্যাবোরেটারীতে মধ্যরাত্রে চিৎকার করে উঠলেন লিশ্‌ম্যান্।

মাইক্রোস্কোপ্ থেকে মুখ তুলে দেখলেন ল্যাবোরেটারী নির্জন। কেউ কোথাও নেই। লিশ্‌ম্যান্ পাগলের মত আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন পেয়েছি—আমি পেয়েছি। রোনাল্ড ভুল বলেছে। আমি ঠিক বলেছি।

তারপর নির্জন ল্যাবোরেটারীতে বসে লিশ্‌ম্যান্ তাঁর ডায়রীতে লিখলেন—

যে সৈনিক দমদম ফিভারে মারা গিয়েছিল, তার প্লীহা পরীক্ষা করে আমি জীবাণু দেখতে পেয়েছি। জীবাণুগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এগুলো দেখতে ক্ষুদে ক্ষুদে ডিমের মত। মাপে আন্দাজ ২ থেকে ৪ মাইক্রোন লম্বা এবং ১ থেকে ২ মাইক্রোন চওড়া। এগুলোর নাম—নাম—কি নাম দেব?

পরদিন প্রত্যুষে লিশ্‌ম্যান্‌ রোনাল্ড রস এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের ডেকে এনে তার আবিষ্কারের কথা বললেন।

রস মাইক্রোস্কোপের ওপরে চোখ লাগালেন, তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখে বললেন—তুমিই জয়ী হয়েছ লিশ্‌ম্যান্‌। আমি ভুল বলেছিলাম। কালাজ্বরের জীবাণু অন্য, ম্যালেরিয়ার জীবাণু থেকে কালাজ্বর হয় না।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লিশ্‌ম্যান্‌ প্রমাণ করলেন, কালাজ্বর মাছির কামড়ে হয়। এক রকমের মাছি, যার নাম Phlebotomus argentipes, সেই মাছির মধ্যে কালাজ্বরের জীবাণু থাকে। সেই মাছি যখন মানুষকে কামড়ায়, সেই কামড়ের সঙ্গে জীবাণু শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়, আর কালাজ্বর হয়।

১৯০৩ সালে দিল্লীর ডাক্তার ডোনোভ্যান জানালেন দিল্লী-ফোড়া নামে যে ভয়ংকর রকমের রোগ হচ্ছে, তাও এক রকমের কালাজ্বর। আমি এইসব রোগীদের প্লীহা পরীক্ষা করে কালজ্বরের জীবাণুর মতই এক রকমের জীবাণু পেয়েছি। সে জীবাণুর নাম আমি জানি না।

বিশেষজ্ঞরা একমত হয়ে এই জীবাণুর নাম দিলেন লিশ্‌ম্যানিয়া-ডোনোভ্যানি (Leishmania Donovani)।

শহর কলকাতা তখন আজকের মত ছিল না। এই শহরে প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০৭ সালে। সেই হাসপাতালের নাম ছিল জেনারেল হাসপাতাল এবং শুধু ইউরোপীয়ানদের চিকিৎসা হত এই হাসপাতালে।

সিপাহীদের জন্য সাময়িকভাবে একটা অস্থায়ী হাসপাতাল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হল বর্তমানের খিদিরপুর অঞ্চলে। ১৭৬৮ সালে এখন যেখানে এস. এস. কে. এম. হাসপাতাল সেইখানে একখণ্ড জমি কিনে বৃটিশ সরকার একটি হাসপাতাল গড়ে তুললেন ১৭৭০ সালে শুধু মাত্র ইংরেজদের চিকিৎসার জন্যে। ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগে, ভারতীয়দের চিকিৎসার জন্যে তখনও কলকাতা শহরে কোন হাসপাতাল ছিল না।

জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বেসরকারী হাসপাতাল তৈরি করা হল উত্তর কলকাতার গরাণহাটা অঞ্চলে। এই হাসপাতালে

ভারতীয় অভারতীয় সকলেরই চিকিৎসা হত। সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ মানুষের টাকায় গড়ে উঠল একটি হাসপাতাল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই হাসপাতালে এত রোগী হতে শুরু করল যে, এই ছোট্ট বাড়িতে হাসপাতাল চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে ১৭৯৬ সালে এই হাসপাতালকে ধর্মতলায় একটা বড় বাড়িতে উঠিয়ে আনা হল। কিন্তু এই বাড়িতেও হাসপাতাল হিসেবে চালানো সম্ভব হল না। রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ওই বাড়িটিতেও স্থান অকুলান হওয়ায় কলকাতার উত্তর দিকে গঙ্গার তীরে অনেকখানি খোলা জায়গা কিনে একটি বড় হাসপাতাল করে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৮৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মেয়ো মেমোরিয়াল গ্রাণ্ট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে একটি সুন্দর হাসপাতাল গড়ে তোলা হল গঙ্গার পাড়ে। মেয়ো সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে হাসপাতালটির নাম রাখা হল মেয়ো হাসপাতাল।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাব্যস্ত করলেন, কলকাতায় পাশ্চাত্ত্য দেশের মত মেডিকেল শিক্ষা দরকার। নেটিভ্‌দের মধ্যেও অনেক মেধাবী ছাত্র আছে, যারা সুযোগ পেলে অসাধারণ ভাল চিকিৎসক হতে পারে। বেন্টিঙ্ক সাহেব ছ জনের একটি কমিটি গঠিত করলেন, সেই কমিটিতে অন্যান্যদের সঙ্গে বাবু রামকমল সেনও ছিলেন। ১৮৩৩ সালে বেন্টিঙ্ক এই কমিটি গঠিত করে, অনুসন্ধানের পর যথাযথ রিপোর্ট দিতে বললেন। কমিটি ১৮৩৪ সালে রিপোর্ট দাখিল করলেন এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী গভর্নমেন্ট একটি সরকারী মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যে সময়ে রোনাল্ড রস, লিশ্‌ম্যান্‌, রজার্স কালাজ্বর ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারে ব্যস্ত, যে সময়ে এঁদের নাম পৃথিবীখ্যাত, সেই সময়ে একটি নেটিভ্‌ বাঙালীর ছেলে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. ডি. পাস করলেন।

আশ্চর্য মেধাবী ছাত্র। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বর্ণে বর্ণে তা ফলে গেছে। এই বাঙালীর সন্তান ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে হুগলী কলেজ থেকে বি/এ. পাস করলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম হলেন। পরের বছরেই প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পাস করলেন এবং রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন।

বাঙালীর ছেলে এম. এ. পাস করার পর ডাক্তারী পড়তে ঢুকলেন। আশ্চর্য মেধাবী, আশ্চর্য আত্মভোলা ছাত্র। পড়তে পড়তে সে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যায়। তার মনে কিসের চিন্তা কেউ জানে না ; কিন্তু সে কিছুতেই স্বস্তি পায় না।

লিশ্‌ম্যান-ডোনোভ্যান আবিষ্কার করলেন কালাজ্বরের জীবাণু। রোনাল্ড রস আবিষ্কার করলেন ম্যালেরিয়ার জীবাণু। তবু—তবু কেন তার শান্তি নেই? আনন্দ নেই?

সবাই যখন তাকে প্রশ্ন করেন, সে উত্তর দেয়—কেন শান্তি হবে? ম্যালেরিয়ার ওষুধ সিঙ্কোনা কুইনিন অনেকদিন থেকেই ছিল। কেন সে রোগ হত লোকে বুঝতে পারত না; কিন্তু ম্যালেরিয়া হলে তাকে সারাবার পথ চিকিৎসকদের জানা ছিল। কালাজ্বরের বেলায় ঠিক তার উল্টো। এ রোগ কেন হত তাও লোকে জানত না, কি করে এ রোগ সারানো যায়, তাও কেউ জানে না? কি লাভ শুধু কেন এই রোগ হয় জেনে?

ছাত্রটির কথার গুরুত্ব সকলেই বুঝতে পারলেন। ছাত্রটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল —এ রোগ আমাদের দেশেই হয়, তাই এর ওষুধ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, কারণ এই রোগে আমাদের দেশের মানুষই মারা যায়।

ছাত্রটি চিকিৎসাজগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ১৮৯৮ সালে এম. বি. পরীক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষায় মেডিসিন ও সার্জারীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। মেডিকেল কলেজের প্রথম সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ ছিলেন ডাঃ এইচ. গুডাইভ্। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিপদক দেওয়া হয় সেরা ছাত্রকে। যার নাম গুডিভ পদক। সেই পদক পেলেন ছাত্রটি। এ ছাড়াও সে অধিকার করল ম্যাকলাউড পদক।

বাঙালী ছাত্রটি সসম্মানে এম. বি. পাস করল। তারপর পাস করল এম. ডি. ১৯০২ সালে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রটি শারীরতত্ত্বে পি. এইচ. ডি. সম্মানের অধিকারী হল।

ছাত্রজীবনের অবসানে কর্মজীবনের শুরু। ছাত্র এখন আর ছাত্র নেই। নানান চিন্তায় অহরহ মগ্ন এক চিকিৎসক। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে তিনি চলে গেলেন ঢাকায়। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্যাথলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক হয়ে কাজে যোগ দিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি কলকাতায় এসে ক্যামবেল মেডিকেল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষক হলেন। কর্মজীবনে খ্যাতনামা চিকিৎসক হলেও, মনের মধ্যে প্রতিক্ষণে সেই ক্ষোভ জেগে উঠতে লাগল। রোগীরা কালাজ্বরের আক্রমণে যখন অসহায় হয়ে তাঁর কাছে আসে চিকিৎসার প্রত্যাশায়, তিনি কিছুই করতে পারেন না। অসহায়ভাবে তাদের মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে থাকেন।

তিনি যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, ঠিক তেমনি রসায়নশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর সাধনায় এবার রসায়নশাস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

একটির পর একটি ওষুধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করেন, আর ল্যাবোরেটারীতে লিশ্‌ম্যানিয়া—ডোনোভ্যানি জীবাণুর ওপর প্রয়োগ করেন। অদ্ভুত কঠিন জীবন এই জীবাণুগুলোর। সিঙ্কোনা হজম করে দেয়, কুইনিনে কোন ফলই হয় না।

এসব ওষুধে কোন ফল হবে না, কারণ এই জীবাণুগুলো ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটের মত নয়।

আবার গবেষণা। আরও বিষাক্ত ওষুধের প্রযোজন। যেমন কঠিন ধাতের জীবাণু, তেমনি বিষাক্ত ওষুধের প্রয়োজন।

ম্যান্‌সন্‌ বলেছিলেন কালাজ্বরের জীবাণু ট্রিপানোসোম্‌ গ্রুপের কোন রোগ। তিনি ঠিক কথা বলেন নি, লিশ্‌ম্যান তা প্রমাণ করে দিয়েছেন, কিন্তু চিকিৎসায় হয়ত ওই ধরনের ওষুধ কাজে লাগতে পারে।

আর্সেনিক দিয়ে ওষুধ তৈরি করলেন বাঙালী বৈজ্ঞানিক। প্রয়োগ করলেন কালাজ্বরের জীবাণুর ওপর। না, কোন ফল পাওয়া গেল না।

হতাশ হলেন না। একের পর এক খুঁজে যেতে হবে। একদিন না একদিন সার্থক হয়ে উঠবেই এই তপস্যা। এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

আরও বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে হবে। অ্যান্টিমনি। অ্যান্টিমনি দিয়ে ওষুধ তৈরি করলেন বাঙালী বৈজ্ঞানিক। প্রয়োগ করলেন লিশ্‌ম্যানিয়া-ডোনোভ্যানি জীবাণুর ওপর। আশ্চর্য! জীবাণুগুলো ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নির্জীব হয়ে গেল জীবাণুগোষ্ঠী।

পেয়েছি!

বৈজ্ঞানিক বিড় বিড় করে আপনমনেই উচ্চারণ করলেন পেয়েছি! সন্ধান পেয়েছি। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক যা করতে পারেন নি, বাঙালী বৈজ্ঞানিক তা করতে পেরেছেন।

কিন্তু সমস্যা আছে। এই ওষুধ এত বিষাক্ত যে মানুষ তা সহ করতে পারছে না। আবার গবেষণা শুরু করলেন। রসায়নশাস্ত্রের প্রক্রিয়ায় নানা রকম ওষুধ তৈরি করতে লাগলেন বাঙালী চিকিৎসক।

একটি ওষুধ তিনি অবশেষে তৈরি করলেন। ওষুধটি ইনজেকশন দিলে রোগী সহ্য করতে পারে, অথচ কালাজ্বরের জীবাণুও মারা যায়। এই ভয়ংকর রোগে

আক্রান্ত রোগীরা তাঁর ওষুধে চিকিৎসিত হয়ে আবার সুস্থ জীবন লাভ করল। দিকে দিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। ১৯২০ সালে এই ওষুধ আবিষ্কার করলেন বাঙালী বৈজ্ঞানিক। ভারত সরকার ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সম্মানে নাইট উপাধি দান করলেন। বাঙালীর ছেলে ১৯৩৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিন-এর সভারূপে নির্বাচিত হলেন।

এই বাঙালী মহাবৈজ্ঞানিক ১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী দেহত্যাগ করেন। অসামান্য মেধাবী, আসাধারণ বাঙালী কৃতিপুরুষ হলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধের নাম ইউরিয়া স্টিবামাইন, কালাজ্বরের অমোঘ ওষুধ।

॥ উনত্রিশ ॥

লোকে বলে পাগল ডাক্তার।

এলোমেলো কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুল মাথায়। চোখে চশমা, বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে। সব সময়ে নিজের চিন্তায় বিভোর। কি ভাবছেন কেউ বলতে পারেন না।

—ডাক্তার ব্যান্টিং কি সত্যই পাগল হয়ে গেলেন? দিনরাত কেবল কুকুরের অপারেশন করছেন। একটি ছাত্র বলল।

আমেরিকার টোরেন্টো হাসপাতালের একটি ঘরে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনা করছিলেন ডাক্তার ব্যান্টিং-এর বিষয়। ডাক্তার ব্যান্টিংকে শ্রদ্ধা করে সবাই। এত বড় শারীরতত্ত্ববিদ্ সারা দেশে আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর কাছে কিন্তু কেউ সহজে পড়াশুনা করতে যেতে চায় না। তাঁর পাণ্ডিত্য এত গভীর যে, তার কুলকিনারা পাওয়া মুশকিল। তিনি হজমের বিষয় পড়াতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষ করলেন, গ্রন্থিরসের পরিচ্ছেদে। কেউ যদি হেসে জিজ্ঞাসা করেন—হজমের ব্যাপারে গ্রন্থিরস কোথেকে এল স্যার?

ব্যান্টিং রেগে ওঠেন। রাগতস্বরে বললেন—যা বোঝো না, সে বিষয় কথা বোলো না। শরীরের একটা অঙ্গের সঙ্গে আর একটা অঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটাকেই বিচার করা যায় না।

ছেলেরা কথা বলে না। অনেক মাষ্টারমশায়ও ব্যান্টিং-এর কথার প্রতিবাদ করেন না। ব্যান্টিং যা বলেন, শুনে যান। যতটুকু বিশ্বাস করা দরকার করেন, বাকীটা ভুলে যান।

ইদানীং ব্যান্টিং-এর কাজকর্ম কেমন অন্যরকম হয়ে পড়েছিল। তিনি কুকুরের পেট চিরে অপারেশন করে প্যান্‌ক্রিয়াস্‌-গ্রন্থি পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্যান-ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থি পেটের মধ্যে পাকস্থলীর পেছন দিকে অবস্থিত। প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থির মধ্যস্থল থেকে একটি নালী অন্ত্রের ভিতর যুক্ত হয়েছে। সেই নালীপথ দিয়ে একরকমের রস অন্ত্রের মধ্যে যায়, তারই প্রভাবে যথাযথ হজম হয়। ব্যান্টিং-এর নিশ্চিত ধারণা প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থির মধ্যে এমন কিছু আছে, যার প্রভাবে শরীরের হজম ও পুষ্টি সাধারণভাবেই হয়।

—ডাক্তার ব্যান্টিং পাগল হয়েছেন এ কথা মনে করছ কেন? বেস্ট্‌ নামের আর একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করল। বেস্ট্‌ ডাক্তার ব্যান্টিং-এর ভক্ত এবং একনিষ্ঠ সেবক।

—পাগল না হলে এই ধরনের কাজ করেন? পূর্বোক্ত ছাত্র জন পালটা প্রশ্ন করল।

—কাজটা কি শুনি আগে?

ব্যান্টিং বলছেন, প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থি শরীরের পুষ্টিসাধন করে, অথচ যে কটা কুকুরকে উনি অপারেশন করেছেন, সবকটিই শুকিয়ে মারা গেছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বেস্ট্‌ এ কথার উত্তর সরাসরি উত্তর দিতে পারল না, তবু একটু জোরের সঙ্গে বলল—না, না—আমি বিশ্বাস করি না স্যার পাগল হয়ে গেছেন।

—ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাক। ব্যঙ্গের সুরে জন জবাব দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেস্ট্‌ মনমরা হয়ে বসে থাকে। জন যে কথা বলল তা অস্বীকার করার উপায় নেই, তবু তার মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ডাক্তার ব্যান্টিং একদিন অভাবনীয় কিছু আবিষ্কার করবেন।

বেস্ট, ধীর পায়ে ব্যান্টিং-এর ঘরে গেল। ব্যান্টিং একমনে কাজ করছিলেন, বেস্ট্‌ ঘরে ঢুকতেই রাগতস্বরে বললেন—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বেস্ট্‌ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। জানে কোন কথা বলতে গেলেই ব্যান্টিং চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবেন। বেস্ট্‌-এর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল

ব্যান্টিং-এর। তিনি কোমল স্বরে বললেন—একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব।

বেস্ট্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাস্টারমশায়ের দিকে। ব্যান্টিং একটা কুকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—সাত নম্বর কুকুরকে মনে আছে?

বিস্মিত দৃষ্টিতে বেস্ট্ কুকুরটির দিকে তাকিয়ে রইল। মাসখানেক আগে কুকুরটির অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকেই ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য! সে আবার আগেকার মত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। তার যে কোন অপারেশন হয়েছিল একথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

—এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হল স্যার? বেস্ট্-এর বিস্মিত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

—বলব, তোমাকে নিশ্চয়ই বলব। তবে এখন নয়। আমার সাধনার প্রথম পর্ব শেষ হল বেস্ট্।

ডাক্তার ব্যান্টিং তাঁর গবেষণায় তন্ময় হয়ে গেলেন আরও গভীরভাবে। তিনি সর্বদাই ল্যাবোরেটারীতে গবেষণায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। কখন খান, কখন ঘুমোন কিছুই ঠিক থাকে না। তাঁর একমাত্র সাথী বেস্ট্। গভীর রাতে দু'চোখ ভেঙে ঘুম আসে বেস্ট্-এর, তবু অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে ব্যান্টিং-এর পাশে। তার অগাধ বিশ্বাস, ডাক্তার ব্যান্টিং নিশ্চয়ই অসাধ্যসাধন করবেন।

ডাঃ ব্যান্টিং যে বই খুঁজে আনতে বলেন, বেস্ট্ যেভাবেই হোক যোগাড় করে আনে। বই থেকে যে জায়গা দরকার বেস্ট্ খুঁজে মাষ্টার মশায়কে পড়ে শোনায়। বেস্ট্ আর ব্যান্টিং-এর মধ্যে আলোচনা চলে। বেস্ট্ আলোচনা করতে করতে যে জায়গায় ভুল করে ফেলে, ব্যান্টিং শুধরে দেন, আবার ব্যান্টিং যেখানে খটকা অনুভব করেন বেস্ট্ সরল করে দেয়। দুজনে মিলে একটি বিচিত্র জগৎ গড়ে তোলে, সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই।

বছর খানেক পরে ব্যান্টিং একদিন বেস্ট্‌কে বললেন—দেখো বেস্ট্। এই যে ওষুধ তৈরি করলাম ল্যাবোরেটারীতে, এই ওষুধ দিয়ে পুষ্টিহীন রোগীকে সুস্থ সবল করে তোলা যাবে।

বিভ্রাট লাগল রোগী নিয়ে। কেউ ব্যান্টিং-এর চিকিৎসায় ভরসা পায় না। রোগীরা স্বচক্ষে দেখেছে একের পর এক কুকুর শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেছে ব্যান্টিং-এর কাছে। অন্য ধরনের চিকিৎসায় হয়তো আবার হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া যেতে

পারে, কিন্তু ব্যান্টিং-এর হাতে পড়লে মৃত্যু নির্ঘাত।

আমেরিকার এই অঞ্চলে হঠাৎ যেন রোগা হয়ে যাওয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। প্রায়ই লোককে দেখা যায়, একটু বয়স হলেই ক্ষিদে বেড়ে যায় অস্বাভাবিক রকম। লোকে খায়ও প্রচুর, কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়, কেউ জানে না। কোন পুষ্টিই হয় না। ক্রমশঃ ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে। বার বার মূত্র ত্যাগ করতে হয়। রক্তপরীক্ষায় চিনির ভাগ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারপর ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে যেতে একদিন জ্বর হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ডাক্তারদের ধারণা হজমের গোলমালে খাদ্যের পুষ্টি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে না, ফলে ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! হজমের যত রকমের চিকিৎসা জানা ছিল সব করেও তাঁরা কোন সুরাহা করতে পারেননি, একটি রোগীকেও বাঁচাতে পারেননি। রোগ ধরা পড়বার কয়েক মাসের মধ্যেই রোগীরা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অনেক সময় রোগ নির্ণয় করবার আগেই মৃত্যু ঘটে যায়।

ব্যান্টিং ঘোষণা করলেন—আমার তৈরি ওষুধে নিশ্চয়ই ওই ধরনের রোগ সেরে যায়। তোমরা নিজেরা এসে দেখে যাও, যে কুকুরগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল, আমার তৈরি ওষুধের ইনজেকশনে আবার মোটাসোটা হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।

ব্যান্টিং-এর কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বেস্ট্ ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু ব্যান্টিং হাল ছাড়েন না। তিনি বেস্ট্‌কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এত অল্পে হতাশ হলে জীবনের কোন সাধনাই সার্থক হয় না।

বেস্ট্ নীরবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আর ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস।

উত্তর আমেরিকার টোরান্টো শহরে তুষার পড়ছে। ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাবার অবস্থা। সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছে ফায়ার প্লেসের চারপাশে। আগুন ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

টোরান্টোর থম্পসন্ সংসারে কিন্তু শান্তি নেই। মৃত্যুর আশঙ্কা সামনে নিয়ে থম্পসন্ গৃহিণী মিসেস্ ডরোথী নিঃশব্দে কাঁদছেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। স্বামী মারা গেছেন। এক এক করে চার চারটি ছেলে অকালে মারা গেছে। কোন

চিকিৎসাই তাদের ধরে রাখতে পারেনি। স্বামী ইদানীং একটু পরিশ্রম করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। মধ্যবিত্ত সংসারে যা সংগ্রহ করা সম্ভব, সবই যোগাড় করে স্বামীকে খাওয়াতেন ; কিন্তু তবু শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। তারপর একদিন হোঁচট খেলেন কাজ থেকে ফেরার পথে। আঙুলের ঘা একটু একটু করে বাড়তে লাগল। সাধারণ ঘা ভেবে, সাধারণ চিকিৎসা করলেন ডাক্তারবাবুরা। ঘা ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগল, তার সঙ্গে জ্বরও শুরু হল। ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসায় কোন সুফল না পেয়ে হাসপাতালে ভরতি করে দিলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। হাসপাতালের ডাক্তারদের সামনে মিসেস্ থম্পসনের স্বামী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

অভিশপ্ত সংসার।

স্বামীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তিনটি ছেলে অকালে মারা গেল। সকলেরই সেই বিদকুটে রোগ। চিকিৎসকের অসাধ্য রোগ। কোন ভাবেই চিকিৎসকেরা সুরাহা খুঁজে পান না।

শেষ ছেলে লিওনার্ড থম্পসন্। চোদ্দ বছর বয়সেই সেই কালরোগ দেখা দিয়েছে। ক্লান্তি! ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে লিওনার্ড। লাল টকটকে চেহারা কয়েক মাসের মধ্যেই তামাটে হয়ে গেল। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। চোখ কোটরাগত। একটু জোরে হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়ছে। মিসেস্ ডরোথী মা। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন মৃত্যু তার কালো দু'খানি হাত নিয়ে, লিওনার্ডের ওপর নেমে আসছে। মৃত্যুর জয় অবধারিত। মৃত্যুর নিশ্চিত হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই।

ডিসেম্বরের শীতে সারা কানাডা স্থবির হয়ে গেছে। এবার বরফ পড়ছেও অত্যন্ত মারাত্মকভাবে। এই ঠাণ্ডায় ডরোথীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ছেলের দিকে যতবার তাকাচ্ছেন, ততবারই বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক করে উঠছে। চোখের তারার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছেন ডরোথী। যে কোনদিন লিওনার্ডের প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।

—মা। লিওনার্ড মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে বলল—আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। একটু বিষ এনে দাও।

ডরোথী চোখ মুছলেন। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—কি কষ্ট হচ্ছে বাবা?

—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি

অজ্ঞান হয়ে যাব।

ডরোথী উঠে বসলেন। ছেলের মাথা কোলের ওপর নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। ওর বাবা, ওর দাদারা সবাই এক এক করে চলে গেছে। যাবার সময় সকলেই একই রকম উপসর্গের কথা বলেছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার পরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, তারপরে আর সে জ্ঞান আসেনি।

—আর একটু বাতাস করো জোরে জোরে।

ডরোথী লিওনার্ডের মাথা বালিশের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অক্সিজেন না দিলে বাতাসের কষ্ট যাবে না। ডরোথী জানেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বৃথা। সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। তা হোক, তবু তিনি যাবেন ; এভাবে নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে বসে থাকা যায় না।—মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বরের শেষ রাতে লিওনার্ড থম্পসন্‌কে টোরোণ্টো জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হল। ডাক্তাররা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। লিওনার্ডও সেই কালরোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ রোগের চিকিৎসা বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অসহায় চিকিৎসকের সামনে রোগীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেউ কিছুই করতে পারে না।

ডাক্তারেরা লিওনার্ডের রক্ত পরীক্ষা করে চমকে লঠলেন। রক্তের মধ্যে যেখানে আশি থেকে একশ কুড়ি থাকে চিনির পরিমাপ, সেখানে লিওনার্ডের রক্তে পাঁচশ মিলিগ্রাম হয়ে গেছে ; তার মানে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও পাঁচ গুণ।

—আমার লিওনার্ড বাঁচবে তো? ডরোথী ডাক্তারদের দিকে আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাংশুমুখে একজন ডাক্তার উত্তর দিলেন—আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমরা চিকিৎসা করতে জানি, প্রাণ দিতে জানি না মা। মৃত্যুকে ঠোকানো আমাদের সাধ্য নেই।

—আমি একবার দেখতে চাই। ব্যান্টিং ডাক্তারদের মিটিং-এ বললেন—আমি লিওনার্ডকে একবার দেখব।

ডাক্তারদের মধ্যে অনেকে বললেন—কি হবে দেখে?

—আপনারা যা করতে পারেননি, আমি হয়তো পারব।

—কি করে? ডাক্তারেরা প্রশ্ন করলেন।

—সে কথা এখন বলব না। যদি সফল হই তখন নিজেই সব বুঝিয়ে দেব। ডাক্তাররা নিমরাজী হলেন।

ব্যান্টিং ধীর গম্ভীর ভাবে লিওনার্ডের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। লিওনার্ড আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে। বিছানার সঙ্গে লেপটে গেছে। কণ্ঠার হাড় প্রকট হয়ে উঠেছে। শরীরে আর কোথাও মাংস নেই বললেই চলে। হাড়ের ওপর শুধু চামড়ার আবরণ। সারা শরীরে হিমশীতল ঘাম। বিছানার পাশে একটি টুলের ওপর ডরোথী বসে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দয়া করে ডরোথীকে ছেলের কাছে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন।

ব্যান্টিং বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ডরোথী উঠে দাঁড়ালেন। পরম আশ্বাসে তাঁর দিকে তাকালেন। এতদিন পরে ডরোথী একজন নতুন চিকিৎসককে দেখলেন, যিনি হতাশ না হয়ে চিন্তিতভাবে রোগীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ডরোথী নমস্কার করে সরে যেতেই ব্যান্টিং তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—মা! আপনার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছি।

ডরোথী বিস্মিত! তাঁর কাছে কিসের অনুমতি চাইছেন, ব্যান্টিং-এর মত স্বনামধন্য চিকিৎসক?

—বলুন? মৃদুকণ্ঠে ডরোথী জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি একটা ওষুধ তৈরি করেছি। আপনার ছেলের ওপর পরীক্ষা করতে চাই।

ডরোথীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। পরীক্ষা! পরীক্ষার ফল যদি ব্যর্থ হয়ে যায়! তাঁর সবে ধন নীলমণি হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে!

ডরোথীকে চুপ করে থাকত দেখে ডাক্তার ব্যান্টিং বললেন—আপনি অনুমতি না দিলে আমি ইনজেকশন দিতে পারব না। একটু থেমে ব্যান্টিং আবার বললেন—আপনার সংসারের সবাই এক এক করে চলে গেছে। কাউকে ধরে রাখতে পারেননি। একেও পারবেন না। আমাকে চেষ্টা করতে দিলে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে।

—আপনি যা খুশি করুন, শুধু আমার লিওনার্ডকে বাঁচান। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ওর জীবন থেকে সব আলো যেন নিবে না যায়। ডরোথী কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

—নার্স! ব্যান্টিং গম্ভীরভাবে নার্সকে ডাকলেন।

নার্স পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—এঁকে বাইরে নিয়ে যাও। ডরোথীকে দেখিয়ে আদেশ দিলেন।

—না। ডরোথী মাথা নেড়ে সজোরে আপত্তি জানালেন—যদি কিছু ঘটে, আমার সামনেই ঘটুক।

—বেশ। আপনি তাহলে ওই দূরের টুলটিতে চুপ করে বসে দেখুন, কি করি?

ডরোথী নিঃশব্দে দূরের টুলে বসলেন আশা-আশঙ্কা মেশানো মন নিয়ে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। টোরাণ্টো জেনারেল হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার ঘরের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ালেন। বেস্ট্ ব্যান্টিং-এর তৈরি ওষুধ আর ইনজেকশন-এর সিরিঞ্জ নিয়ে ব্যান্টিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল। ব্যান্টিং পরিমাণমত ওষুধ ইনজেকশন -এর সিরিঞ্জে ভরে লিওনার্ডের শরীরে দিয়ে দিলেন।

১১ই জানুয়ারী, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথম ইনজেকশন পড়ল লিওনার্ডের শরীরে। ডাক্তারেরা সবাই অবাক্ বিস্ময়ে দেখলেন লিওনার্ডের শরীরে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। ডরোথী চোখ বুজে বসে ঈশ্বরের উপাসনা করছিলেন। জীবনের শেষ অবলম্বন যেন তিনি কেড়ে না নেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন তিনি। লিওনার্ড ঘুমিয়ে পড়েছে, তার চোখমুখের ক্লান্তি অনেকখানি কেটে গেছে। পরিষ্কার হয়ে আসছে শরীরের গ্লানি। জীবন যেন মৃত্যুর ক্লেদ নিজের হাতে মুছিয়ে দিলেন।

ব্যান্টিং সহর্ষে বলে উঠলেন—দেখেছো, লিওনার্ড কেমন ভাল হয়ে উঠছে। আমার ওষুধে নিশ্চয়ই কাজ হয়েছে। তোমরা ওর ব্লাডসুগার দেখ, নিশ্চয়ই কমতে আরম্ভ করেছে।

অন্য ডাক্তারেরা বললেন—আমরা ব্লাডসুগার পরীক্ষা করেছি, কিন্তু আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাপারটা।

—বেশ। বিকেলবেলায় কনফারেন্স্ ডাকা হোক। ব্যান্টিং নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন।

বিকেলবেলায় ঘরভরতি ডাক্তাররা বসে। ব্যান্টিং বক্তার চেয়ারে, পাশে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ সহকারী সি. এইচ. বেস্ট্। ব্যান্টিং সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—লিওনার্ডের যে অসুখ করেছে, তার নাম ডায়াবিটিস মেলিটাস্। মূত্র

দিয়ে শরীরের অধিকাংশ চিনি বেরিয়ে যায় বলেই ওই নাম দেওয়া হয়েছে। মেলিটাস্ কথাটার মানে মধু।

কিন্তু কেন? কেন হঠাৎ চিনি বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করল? আমি প্রথমে প্রথমে কুকুর চিরে দেখলাম কি করে শরীরের পুষ্টি অন্ত্র থেকে লিভারে যায়, কারণ লিভারই আমাদের শরীরে পুষ্টি প্রদান করে। দেখলাম লিভার থেকে একটি নালী আর প্যান্‌ক্রিয়াস্ থেকে একটি নালী অন্ত্রে আসছে। প্রথমে লিভারের নালী, পরে প্যান্‌ক্রিয়াসের নালী কেটে দিলাম। তাতে হজমের গোলমাল হল, কিন্তু ব্লাডস্যুগারের কোন পরিবর্তন ঘটল না। তারপর প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থি কেটে বাদ দিয়ে দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে হুহু করে চিনির ভাগ রক্তে বেড়ে গেল।

ব্যান্টিং থামলেন। ঘরের সকলে বিস্মিত, নিস্তব্ধ। ওপাশ থেকে একজন সন্দিগ্ধচিত্তের ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—তাতে কি সাব্যস্ত হল?

ব্যান্টিং বিরক্তচিত্তে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা সহজ জিনিস বুঝতে যে এত দেরি লাগে জানতাম না।

ডাক্তারটি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে না বোঝা পর্যন্ত ছাড়ছি না।

ব্যান্টিং ঘরের সমস্ত ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদেরও কি তাই মত?

ঘরের সবাই নিস্তব্ধ। একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যেতে পারে। ব্যান্টিং কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—বেশ। সমস্ত ব্যাপারটাই আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

'প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থি কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডস্যুগার হুহু করে বেড়ে যেতে লাগল। অথচ প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থির নালী (duct) পথ বন্ধ করে দিলে স্যুগার বাড়ে না। এ থেকে আমার বিশ্বাস হল, প্যানক্রিয়াস্ গ্রন্থির ভেতরে আরও কোন রস সৃষ্টি হয়, যা শরীরের চিনির ভাগ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখে।

এমন সময় টোরাণ্টো জেনারেল হাসপাতালের প্যাথোলজিস্ট, ঘরের মধ্যে ঢুকে চিৎকার করে উঠলেন—আশ্চর্য! আশ্চর্য ব্যাপার—।

—কি? সকলেই প্রায় সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন। ব্যান্টিং শুধু মিটিমিটি হাসছেন। বেস্ট, নীরবে নাটকের দর্শক হয়ে বসে আছে।

লিওনার্ডের রক্ত তিনবার পরীক্ষা করলাম। অনেক অনেক কমে গেছে চিনির পরিমাণ।

—আমি জানতাম। নির্বিকার স্বরে জবাব দিলেন প্রফেসর ব্যান্টিং। ব্লাড-সুগার না কমলেই আমি আশ্চর্য আর হতাশ হয়ে পড়তাম।

সকলে সবিস্ময়ে, শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাক্তার ব্যান্টিং-এর দিকে তাকালেন। ব্যান্টিং ধীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন—আমি একের পর এক কুকুর কেটেছি। তাদের প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছি। তারপর এক অবিশ্বাস্য পদার্থ খুঁজে পেয়েছি।

ঘরের সবাই পাথরের মত নিথর নিস্তব্ধ। বাইরে বরফ পড়ছে। নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। মৃদু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছে শুধু।

ব্যান্টিং চোখ বুজে বলে যেতে লাগলেন।

—আমি দেখতে পেলাম, প্যান্‌ক্রিয়াসের মধ্যে আরও একরকমের কোষ আছে। যেখান থেকে এক রকমের হরমোন্‌ সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে গ্লুকোজ শরীরে নিয়মিত সঞ্চয় হয় আর খরচ হয়। গ্লুকোজ বা চিনি শরীরের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে ঢুকে জ্বালানী শক্তি দান করে, ফলে এনার্জি সৃষ্টি হয়। এই হরমোন্‌ না থাকলে বা কম থাকলে গ্লুকোজ লিভারে সঞ্চিত হতে পারে না। আবার কোষের মধ্যে গিয়েও জ্বালানী শক্তি প্রদান করতে পারে না। সমস্ত চিনি বা গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে জমা হয়ে থাকে।

এই হরমোন্‌ আমি ল্যাবোরেটারীতে তৈরি করেছি। যাদের শরীরে এই হরমোন্‌ নেই বা কম আছে, তাদের যদি আমার তৈরি হরমোন্‌ পরিমাপমত ইনজেকশন দেওয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিক লোকের মতই আবার তারা চলাফেরা করতে পারবে।

আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। লিওনার্ডকে যদি নিয়মিতভাবে এই হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে ও সেরে উঠবে।

—আমরা আপনাকে অনুমতি দিলাম। সমস্ত ডাক্তার একসঙ্গে বলে উঠলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন লিওনার্ডের শরীরে ব্যান্টিং-এর তৈরি হরমোন ইনজেকশন দেওয়া শুরু হল। দেখতে দেখতে লিওনার্ডের রক্তের চিনির পরিমাপ স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে এল। ধীরে ধীরে শরীরের পুষ্টি বাড়তে লাগল ; মৃত্যুর কালো ছায়া মুখের ওপর থেকে সরে গেল, আবার জীবনের রক্তাভ আলো জেগে উঠল সারা দেহে। শান্ত, ক্লান্ত লিওনাড

থম্পসন, মৃত্যুর দরজা থেকে সরে এসে আবার জীবনের আনন্দময় স্পন্দন অনুভব করল। হাসিতে ভরে উঠল ডরোথী থম্পসনের মুখমণ্ডল। মাসকয়েক পরে ছেলেকে সুস্থ সবল করে বাড়ি ফিরে গেলেন ডরোথী থম্পসন্। যাবার সময় প্রণাম করে গেলেন প্রফেসর ব্যান্টিংকে।

—উহুঁ! শুধু আমায় করলে হবে না। একেও করতে হবে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেস্ট্-এর দিকে তাকিয়ে প্রফেসর ব্যান্টিং বললেন—এমন একনিষ্ঠ সহকারী না পেলে আমি ইনসুলিন আবিষ্কার করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

—না। উনি ছাত্র, ওঁকে প্রাইজ দেওয়া যাবে না।

ডাঃ ব্যান্টিং এবং প্রফেসর ম্যাকলিয়ড যুগ্মভাবে নোবেল প্রাইজ পেলেন। বেস্ট্কে দেওয়া হল না ছাত্র বলে। ১৯২৩ সালে এই নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়।

আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী, যাঁরা ডায়াবিটিস্-এ ভুগছেন, তাঁরা ইনসুলিন্ নিয়ে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ইনসুলিন্ হরমোনের আবিষ্কর্তা এফ. জি. ব্যান্টিং এবং সি. এইচ. বেস্ট্কে প্রণাম জানাচ্ছেন।

॥ তিরিশ ॥

—ডাক্তারবাবু, আমি এভাবে বাঁচতে চাই না। মেয়েটি কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল।

—কি হয়েছে?

ডাক্তার আইভারসন্ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি আইভারসনের দিকে সরাসরি তাকাল। তার মুখ ভরতি বসন্তের দাগ। হয়তো এককালে সুন্দর ছিল, বর্তমানে মারীগুটিকার দাগের জন্য কদাকার হয়ে গেছে।

ডাক্তার আইভারসন্ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন, তারপর ধীরস্বরে বললেন—তুমি কয়েকদিন পরে এস। এর মধ্যে ভেবে দেখি কি করতে পারি।

মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার প্রেসটন্ আইভারসন্।

ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। মানুষের বিজ্ঞান কি এতই সীমিত যে

তার হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়?

কোন মেয়ের মুখে কুৎসিত কোন দাগ দেখলে তাঁর পাঁজরাগুলো টনটনিয়ে ওঠে, একটা যন্ত্রণার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে বুকের পাঁজরাগুলো থেঁতলিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। তাঁর একমাত্র মেয়ে রেবেকা, ইউনিভারসিটির ছাত্রী ছিল। রসায়নশাস্ত্র নিয়ে রিসার্চ করত। ফুলের মত সুন্দর দেখতে। জন্-এর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা। জন্ অধ্যাপক ছিল। তারা দুজনে যখন আইভারসনের সামনে এসে দাঁড়াত, আইভারসনের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। তাঁর মনে হত, পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তাঁর সামনেই রয়েছে।

হঠাৎ একদিন।

রেবেকা একমনে ল্যাবোরেটারীতে কাজ করছে, হঠাৎ একটা রাসায়নিক ফ্লাস্ক ফেটে গিয়ে সমস্ত অ্যাসিড ছড়িয়ে পড়ল। তপ্ত অ্যাসিডের খানিকটা ছিটকে রেবেকার মুখের ওপর পড়ল। যন্ত্রণায় একটা চিৎকার করে রেবেকা সেই মুহূর্তেই জ্ঞানহীন হয়ে টুল থেকে লুটিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে ডাক্তার ছুটে এল। আইভারসন্‌কে খবর দেওয়া হল। হাসপাতাল থেকে আইভারসন্ ছুটে গেলেন। রেবেকাকে হাসপাতালে ভরতি করা হল। দীর্ঘ দুমাস ধরে তার চিকিৎসা করে, তাকে সুস্থ করে তোলা হল।

কিন্তু!

রেবেকার মুখ বীভৎস হয়ে গেল। ফুলের মত সুন্দর মুখের ওপর ছোপ ছোপ কালো দাগ। রেবেকার মুখের দিকে তাকানো যায় না। বাবা হয়ে আইভারসন্ তাকাতে পারছেন না; অন্য লোকের তো কথাই নেই।

জন্ একদিন দেখতে এসেছিল। সে ফিরে গিয়েছিল, তারপর জানিয়েছিল, সে রেবেকাকে জীবনসঙ্গিনী করতে অক্ষম।

আইভারসন্ কিছু বলতে পারেননি। রেবেকা নিজের মুখ আয়নায় দেখে আঁতকে উঠেছিল। সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবাকে বলেছিল।—পারো না বাবা, আমার মুখটা আবার আগের মত করে দিতে?

অস্থিরভাবে আইভারসন্ ঘরময় পায়চারি করেছিলেন। একটা অসহায় যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর নীল হয়ে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রেবেকা কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাবাকে বলে গেল—ল্যাবোরেটারীতে যাচ্ছি।

সেই শেষ যাওয়া।

দুপুরবেলায় আইভারসনের হাসপাতালে ফোন এল শীগ্‌গির তিনি যেন ল্যাবোরেটারীতে আসেন। ফোন পেয়েই আইভারসন্‌ ছুটে গেলেন ল্যাবোরেটারীতে। রেবেকার রিসার্চরুমে প্রবেশ করে দেখলেন একটা লম্বা টেবিলের ওপর রেবেকাকে শোয়ানো হয়েছে। সাদা ধবধবে একটা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা। আইভারসন্‌ চাদর সরিয়ে মুখ দেখে পাথর হয়ে গেলেন।

বিষের প্রতিক্রিয়ায় রেবেকার মুখ নীল হয়ে গেছে।

তবু—তবু—।

বাবার মন! অবশ হাতখানি তুলে নাড়ী দেখলেন। নিজের আঙুলের শিরার স্পন্দন যেন রেবেকার নাড়ীর স্পন্দন বলে মনে হয়।

স্টেথোস্কোপ্‌ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের গতি পরীক্ষা করলেন। নিস্তব্ধ নিঝুম। চরম অভিমানে রেবেকা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

রেবেকার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটুকরো চিঠি বেরিয়ে এল। জলভরা চোখে আইভারসন্‌ পড়ে দেখলেন:

'বাবা,

কুৎসিত চেহারা নিয়ে পৃথিবীকে কুৎসিত করে তোলার অধিকার আমার নেই, তাই বিদায় নিলাম—

রেবেকা—'

ডাক্তার প্রেসটন্‌ আইভারসন্‌!

চেম্বারের জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর দুচোখে জল। রেবেকার মত এই মেয়েটিও একটা অসহায় চাউনি নিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে জানে না, চিকিৎসক তার চেয়েও অসহায়।

ডাক্তার আইভারসন্‌ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কি করা যায়? করা যাবে কি?

নিশ্চয়ই যাবে। বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জার্মান-ইংরেজের যুদ্ধের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ড্‌স্টিনার রক্ত সম্বন্ধে আবিষ্কার করেছেন, রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ আছে, এ, বি, এবি. এবং ও গ্রুপ।

পৃথিবীতে হইচই পড়ে গেছে। সার্জারীর উন্নতি হয়েছে। যে রোগী আগে

বাঁচত না, বর্তমানে রক্তদানের কল্যাণে সেই রোগী নির্বিবাদে বেঁচে উঠে চিকিৎসককে আশীর্বাদ করে গেছে।

আইভারসন্ চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে কুৎসিতদর্শন চামড়াকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক করতে পারেন। অনেকক্ষণ ধরে আইভারসন্ এলোমেলোভাবে মোটরে ঘুরে বেড়ালেন, তারপর বাড়ি ফিরে এলেন।

বাড়িতে একা একা শুয়েও ওই একই চিন্তা করে যেতে লাগলেন ; কি করে ক্ষত চামড়াকে আবার ভাল করে তুলতে পারেন। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নিজেও জানতে পারেন নি।

পরদিন সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যখন চেম্বারে গেলেন, দেখলেন সেই মেয়েটি চুপচাপ বসে আছে। আইভারসন্‌কে দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠল। আইভারসন্ বসবার নির্দেশ দিতে সে বসল।

মেয়েটি বসে বলল—কিছু ভেবেছেন কি ?

চিন্তিত স্বরে আইভারসন্ বললেন—তোমার কথাই চিন্তা করছি মা।

তারপর একটু থেমে আইভারসন্ আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এত উতলা হয়েছো কেন মা ?

—হবো না ? মেয়েটির চোখদুটো যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। সে বলল—আমি আগে এত কুৎসিত দেখতে ছিলাম না। বছর পাঁচেক আগে আমার বসন্ত হয়, তারপর থেকেই মুখ এমনি হয়ে যায়।

একটু থেমে মেয়েটি আবার বলতে লাগল—আমি একটা আফিসে চাকরি করি। এখন যে কাজ করি তা একটা ছোট্ট ঘরে মুখ বুজে করতে হয়। কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না। বেশ ভালই ছিলাম।

আমার কাজ দেখে আমার মনিব খুব খুশী হয়ে আমাকে প্রমোশন দিয়েছেন। মাইনে অনেক, কিন্তু সমস্যা হল, এ কাজে সকলের সঙ্গে দেখাশোনা করতে হয়। আমি সেকাজ করতে পারবো না। আমি তার চেয়ে আত্মহত্যা করব। এই কুৎসিত মুখ নিয়ে কি করে লোকসমাজে বার হব ? কোম্পানির খরিদ্দাররাই বা আমাকে দেখে কি ভাববেন ?

মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আইভারসন্ স্তব্ধ হয়ে সবকথা শুনলেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—একটা কথা শুনে রাখো মা। তোমার বয়সী আমার একটি মেয়ে ছিল। তারও ঠিক এমনিভাবে মুখখানা পুড়ে

গিয়েছিল। সে পৃথিবীর ওপর অভিমান করে চলে গেছে। বুড়ো বাপটার কথা একবার ভাবলোও না……।

কথা শেষ করতে পারলেন না। একটা অব্যক্ত কান্নায় কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটি যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল—আপনার মেয়ে ঠিকই করেছেন। পৃথিবীর অনুকম্পা, দয়া, সহানুভূতি, ঘৃণা কুড়িয়ে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। আমিও ভাবছি—

—না, না। ব্যাকুলকণ্ঠে প্রেসটন, আইভারসন, চিৎকার করে উঠলেন।—এভাবে তোমাদের আমি মরতে দিতে পারি না।

—তাহলে সুস্থভাবে বাঁচবার অধিকার দিন।

—দেবো। আইভারসনের কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—দেবো। তবে আমায় সময় দিতে হবে।

—বেশ। মেয়েটি ক্লান্তস্বরে বলল—এক মাস সময় দিলাম। এক মাস পরে আবার আমি আসবো।

আইভারসন, মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—একমাস অনেক সময়। তার মধ্যে নিশ্চয়ই আমি একটা উপায় বার করবোই।

—একমাস পরেও যদি নিরাশ হয়ে ফিরি?—

মেয়েটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আইভারসন, বললেন—তাহলে তোমার আগে আমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব।

মেয়েটি আর কোন কথা না বলে নমস্কার করে বিদায় নিল।

যুদ্ধ যুদ্ধ আর যুদ্ধ—

পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রত্যেক দেশের সাধারণ মানুষ শান্তি চায়, নীল আকাশ প্রাণ ভরে দেখতে চায়, মন খুলে হাসতে চায়।

রণক্লান্ত আহত সৈনিকের দল আইভারসনের চেম্বারে এসে ভিড় করে। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডল। সুন্দর সুন্দর যুবক কদাকার হয়ে গেছে স্প্লিণ্টারের আঘাতে।

আইভারসন, পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে ক্ষত চামড়া আবার নতুন করে তোলা যায়।

একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে চিন্তিত মনে হেঁটে যাচ্ছিলেন, পথের পাশে দেখলেন কয়েকটি রেড ইণ্ডিয়ান একটা গ্রাম্য লোকের কাছে বসে হাতে উলকি আঁকছে।

কি খেয়াল হল আইভারসন, দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকগুলি উলকি আঁকিয়ে নিয়ে খোস-মেজাজে গল্প করতে করতে চলে গেল।

আইভারসন, দাঁড়িয়ে রইলেন। উলকির লোকটি আইভারসন্‌কে মোটা খদ্দের ভেবে আপ্যায়ন করে বলল—আসুন বাবু, উলকি পরবেন, নতুন নতুন নকশা!

আইভারসন, কাছে এসে বললেন—উলকি পরতে পারি এক শর্তে!

—বলুন বাবু, কি শর্ত?

—যদি আবার উলকি তুলে দিতে পার তবেই।

—এ আর এমন কি শক্ত? লোকটি বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল—কিন্তু বাবু, যদি উঠিয়েই ফেলবেন, তাহলে পরছেন কেন?

—এর জবাব আজ নয়। আর একদিন দেব।

—বেশ। বসুন আপনি।

আইভারসন্ পথের ওপর বসে পড়লেন। লোকটি তার যন্ত্রের সাহায্যে আইভারসনের দু হাতে উলকি এঁকে দিল, তারপর জিজ্ঞাসা করল—কোন্ হাতেরটা উঠিয়ে দিতে হবে?

আইভারসন, বাঁ হাত এগিয়ে দিলেন। পরম বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, লোকটি তার থলি থেকে একখণ্ড সিরিশ কাগজ বার করে উলকির ওপর ঘষতে লাগল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠল আইভারসনের মুখ, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। নীরবে তার কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলেন। ঘষতে ঘষতে উলকির নীল দাগ যখন মিলিয়ে গেল, লোকটি একটা ন্যাকড়া বার করে হাতে জড়িয়ে দিয়ে বলল—তিনদিন পরে খুলে দেখবেন উলকি উবে গেছে!

তিন দিন পরে আইভারসন, ন্যাকড়া খুলে দেখলেন সত্যিই কোন উলকির দাগ নেই। জায়গাটায় কচি নূতন চামড়া গজিয়েছে।

বিদ্যুতের মত আইভারসনের মাথায় খেলে গেল লোকটি উলকির দাগ যতটা চামড়ার নীচে গেছে ততটা ঘষে উঠিয়ে দিয়েছে। নতুন চামড়া যখন গজিয়েছে স্বাভাবিক চামড়াই গজিয়েছে।

সেই মুহূর্তে ডান হাতের উলকির খানিকটা কেটে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন। চামড়ার সাতটি স্তর আছে। উলকির দাগ চামড়ার দ্বিতীয়, বড় জোর তৃতীয় স্তর ভেদ করেছে। সিরিশ কাগজের সার্জারীও তৃতীয় স্তর পর্যন্ত গিয়েছে; ফলে নতুন চামড়া গজাবার বেলায় স্বাভাবিক চামড়া গজিয়েছে।

প্রেসটন্ আইভারসনের পরীক্ষামূলক অপারেশন শুরু হল। পরিষ্কার বিশুদ্ধ সিরিশ কাগজ দিয়ে সৈন্যদের মুখের ক্ষতস্থানগুলি ঘষে ঘষে তুলে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তিনদিন পরে বুকের মধ্যে অসীম ভয় আর বিস্ময় নিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলে আইভারসন্ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। স্বাভাবিক চামড়া গজিয়েছে, যে চামড়ায় পূর্বের ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চামড়ার ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক দাড়ি গোঁফ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে।

নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলেন আইভারসন্। একের পর এক অপারেশন করে চললেন তিনি। রোগীকে অজ্ঞান করে সিরিশ কাগজ দিয়ে ক্ষত ঘষে বিলুপ্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দেন। চামড়া যখন গজায় তখন আগের দাগের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না।

প্লাস্টিক সার্জারী।

পরবর্তী কালের সার্জেনরা এই অপারেশনের নাম দিলেন প্লাস্টিক সার্জারী।

এক মাস যেদিন শেষ হলো, সেদিন সেই মেয়েটি আইভারসনের চেম্বারের দরজায় এসে দাঁড়াল। মেয়েটি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল—আমি এসেছি।

দু হাত বাড়িয়ে আবেগের স্বরে আইভারসন্ বললেন—এসো মা। আমি রেবেকার সময়ে যা করতে পারিনি, তোমার জন্যে তাই করবার জন্যে বসে আছি।

মেয়েটির অপারেশন করলেন আইভারসন্। তিনদিন পরে যখন ব্যাণ্ডেজ খুললেন গোলাপী রঙের স্বাভাবিক চামড়া দেখা গেল। আগের ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রেসটন্ আইভারসনের দু'চোখে জল ভরে এল। জলভরা আবছা দৃষ্টিতে বৃদ্ধ ডাক্তার মেয়েটির মুখের ওপর রেবেকার মুখ দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেললেন। অ্যাসিস্ট্যান্টরা অধ্যাপকের চোখের জল মোছা দেখে বাঁকা ঠোঁটে মৃদু হাসলেন। সাতদিনের দিন মেয়েটি ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল। একমাস পরে চিঠি লিখে জানাল নতুন কাজ সে গ্রহণ করেছে। মালিক তার কাজে খুব আনন্দিত। তার অনেক টাকা মাইনে হয়েছে। হয়ত খুব শীগ্‌গির তার বিয়ে হবে। এ সবের জন্য ডাক্তার প্রেসটন্ আইভারসনের ধন্যবাদ পাওয়া উচিত।

—না, না, না—।

থরথর করে বৃদ্ধের হাত কেঁপে উঠল। চিঠিটা থরথরিয়ে উঠল। আইভারসন্ নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন—না, না—এর জন্যে আমার ধন্যবাদ পাওয়া উচিত নয়। ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে সেই উলকিওলাকে দিতে হয়।

আইভারসন্ ধন্যবাদ দেবার জন্যে উলকিওলার কাছে গেলেন। দেখা পেলেন না। উলকিওলা কখনও এক জায়গায় বসে না। আইভারসন্ এক এক করে সমস্ত জায়গা খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না সেই উলকিওলাকে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ধন্যবাদ দিলেন কাল্পনিক উলকিওলাকে যে নিজের অজান্তে বর্তমান চিকিৎসাজগতে প্লাস্টিক সার্জারীর সূচনা করে দিয়ে গেল।

॥ একত্রিশ ॥

সর্বনাশ!

আবার সেই সর্বনাশা রোগ!

রক্তাল্পতা—ক্রমশঃ রক্তের লোহিত কণিকাগুলো মরে যাচ্ছে। লোহিত কণিকা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়, আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বহন করে ফুসফুসের ভিতর দিয়ে শরীরের বাইরে বার করে দেয়।

লোহিত কণিকাগুলির অপমৃত্যু ঘটছে। কেন ঘটছে এতকাল কেউ বুঝতে পারেনি, জানতে পারেনি। এই রোগের কোন চিকিৎসাও জানা নেই চিকিৎসক সমাজের। অসহায় দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় রোগী রোগিণীর অকালমৃত্যু। কিছুতেই মৃত্যুকে রোধ করা যায় না। দু বছর—বড় জোর তিন বছর বাঁচে। তার মধ্যে লোহিত কণিকাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়, ফলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সার্থকতা আর থাকে না। অক্সিজেনের অভাবে রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

—এভাবে হেরে যেতে আমি রাজী নই। মিন্ট বললেন মারফিকে।

—যেভাবেই হোক এই রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে।

—কি করে বাঁচাবে? মারফি জবাব দিলেন—এই রোগকে পারনিসিয়াস

অ্যানিমিয়া কেন বলে ? চিকিৎসা নেই বলেই বলে। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া —ভয়ংকর ধরনের অ্যানিমিয়া—সর্বনাশা অ্যানিমিয়া—বিপজ্জনক অ্যানিমিয়া। একবার এই ধরনের অ্যানিমিয়া হলে আর রক্ষে নেই।

—জানি—জানি, সব জানি। তবু আমি বাঁচাবার চেষ্টা করব। চিকিৎসা-শাস্ত্রের কোথাও না কোথাও এর চিকিৎসার বিধান আছে। কিন্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ডিস্‌গ্রেস্ ফর আস্।

জর্জ আর মিনট্‌ উত্তেজিতভাবে তাঁর বন্ধু উইলিয়ম পি মারফির সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁরা দুজনেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসকবিজ্ঞানী।

মাসের পর মাস তাঁরা সমস্ত রকমের জানা বিদ্যায় চিকিৎসা শুরু করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। যথাসময়ে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

একদিন একজন রোগী হাসপাতালে এলেন। মিনট্‌ তাঁর উপসর্গ শুনে রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন ভদ্রলোক পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া রোগে ভুগছেন।

—আমার কি হয়েছে ?

ম্লান হেসে মিনট্‌ জবাব দিলেন—তেমন কিছু নয়।

তারপর যথাযথ প্রেসক্রিপশন করে বললেন—এইসব ওষুধ খাবেন অন্ততঃপক্ষে তিন বছর। তারপর এসে বলবেন, কেমন থাকেন।

মিনট্‌ জানতেন তিন বছর পরে ভদ্রলোক আর এসে তাঁর উপসর্গের কথা বলতে পারবেন না। তার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। ভদ্রলোক সরলভাবে জবাব দিলেন। মিনট্ যা বলেছেন ভদ্রলোক সরলচিত্তে তাই বিশ্বাস করেছেন।

ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর মারফি বললেন—এভাবে মিথ্যা কথা বলা তোমার উচিত হয়নি।

—সত্যি কথা বলাটা খুব উচিত হত ? অসহিষ্ণুকণ্ঠে মিনট্ জবাব দিলেন। —আমি জানি এক বছরের মধ্যে ভদ্রলোক নিশ্চিতভাবে মারা যাবেন।

তবু, সাত্য কথা বললে ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি উইল করতে পারতেন।

মিনট্ কোন জবাব দিলেন না।

১৯২৬ সাল।

উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ বছর পর। জর্জ মিনট্ এবং উইলিয়াম মারফি হার্ভার্ড

মেডিকেল স্কুলে একই ভাবে কাজ করছেন। না। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। অন্যান্য চিকিৎসকদের মত মিনট্ এবং মারফি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছেন। এলোপাতাড়ি ভাবে ওষুধ খুঁজে চলেছেন এই ভয়ংকর ব্যাধিকে রোধ করার জন্যে।

—গুড্ মরনিং—

মিনট্ মুখ তুলে তাকালেন। সামনে ভূত দেখার মত ভদ্রলোককে দেখলেন ; পাঁচ বছর আগে ভদ্রলোককে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসার জন্যে ওষুধ দিয়েছিলেন।

—কি নাম আপনার ?

মিনট্ সঠিক ভাবে জানার জন্যই প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পুরনো একটি কার্ড বার করলেন। কার্ডটি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের। পাঁচ বছর আগে মিনট্ নিজেই কার্ডটি লিখে ভদ্রলোকের হাতে দিয়েছিলেন।

—আসুন আমার সঙ্গে।

মিনট্ ভদ্রলোককে হাসপাতালের ভেতর মারফির কাছে নিয়ে গেলেন। মারফিকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলে বললেন—এঁর ব্লাড পরীক্ষা করে এক্ষুণি দেখ। আমি আসছি।

মিনট্ হাসপাতালের ওল্ড রেকর্ডরুমে ঢুকলেন, যেখানে রোগীদের রোগের ইতিবৃত্তের খোঁজ পাওয়া যায়। এইসব রেকর্ড-এর দায়িত্ব হাসপাতালের রেজিস্টারের ওপর থাকে। মিনট্ রেজিস্টারকে বললেন, পুরনো রেকর্ড দেখে ভদ্রলোকের রোগের বিষয় খোঁজ করতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে রেজিস্টার সমস্ত রেকর্ড বার করে মিনট্-এর হাতে দিলেন। মিনট্ পুরনো রেকর্ড-এর ওপর দেখলেন তাঁর নিজের হাতেই পরিষ্কার ইংরেজিতে লেখা আছে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া। রক্ত পরীক্ষার ফলও লেখা রয়েছে ঃ পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া।

মিনট্ পুরনো রেকর্ড হাতে মারফির কাছে ফিরে এলেন। মারফি রক্ত পরীক্ষা করেছেন ভদ্রলোকের। কোন দোষ নাই। কোন অ্যানিমিয়ার চিহ্ন নেই।

—না কোন দোষ নাই। রায় দিলেন মারফি—

—বাট্—পুরনো রিপোর্টগুলো দেখিয়ে মিনট্ জিজ্ঞাসা করলেন—এ অসম্ভব কাণ্ড ঘটল কি করে ?

মারফি সমস্ত কাগজপত্র নিখুঁতভাবে দেখলেন, তারপর ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ওষুধ খেয়েছেন?

—হুর্ মশায়! আপনাদের চিকিৎসা—চিকিৎসা সব বাজে। আমি মনের আনন্দে খেয়েছি আর ঘুরে বেড়িয়েছি।

—খেয়েছেন? আশ্চর্য হয়ে মিনট্ জিজ্ঞাসা করলেন—

—কি খেয়েছেন?

—কি আবার? মাংস, ডিম, রুটি, কারী—লিভার—যা খুশি।

—আপনি দয়া করে মাসে মাসে একবার দেখা করে যাবেন। মিনট্ বললেন।

—নিশ্চয়ই আসব। ভদ্রলোক একটু ঝাঁজের সুরে বললেন—আপনারা আমাকে রোগের কথা বলেননি, কিন্তু অন্য হাসপাতাল থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল আমার কি হয়েছে। আমি যে আর বছর খানেক বাঁচবো, তাও সবাই বলে দিয়েছিলেন। আমি কোন চিকিৎসাই আর করিনি। শুধু পেট ভরে খেয়েছি আর ঘুমিয়েছি। পাঁচ বছর পরেও যখন বেঁচে আছি; আমি প্রত্যেকের কাছে গিয়েছি এবং দেখিয়ে এসে বলেছি—এই দেখুন আমি বেঁচে আছি।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

মিনট্ এবং মারফি আবার নতুন করে ভাবতে লাগলেন পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসার কথা।

ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস করে মিনট্ ও মারফি ঠিক করলেন, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দিয়ে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা করবেন। ওঁরা ঘোষণা করলেন পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার রোগী রোগিণীদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন বিনামূল্যে। একে একে অনেক রোগী রোগিণী এসে জুটলেন, কারণ ইওরোপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী।

মিনট্-মারফি এক একজন রোগীকে এক এক ধরনের খাদ্য খাইয়ে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সবিস্ময়ে দেখলেন যে সব রোগী লিভার খান, তাঁদের রোগ ধীরে ধীরে সেরে যাচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেলেন মিনট্-মারফি। লিভার! যকৃত। যকৃতের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু পুষ্টিকর পদার্থ আছে, যার প্রভাবে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার মত ভয়ংকর রোগও সেরে যায়। কি সে পদার্থ?

মিনট্-মারফি সেই পদার্থটির আবিষ্কার করতে পারেননি, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যকৃতের মধ্যে এমন পদার্থ আছে, যার কল্যাণে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার নিরাময় হয়।

রিসার্চ—রিসার্চ—রিসার্চ—

ইংলণ্ডের, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা অবিরাম রিসার্চ করে চলেছেন এই পদার্থটিকে খুঁজে বার করার জন্য। দেখা গেল যকৃতের মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স জাতীয় অনেক পুষ্টিকর প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে। কিন্তু এরা লোহিতকণিকার পুষ্টিসাধন করতে পারে না।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল এক রকমের কোবাল্ট কম্পাউণ্ড লিভারের মধ্যে আছে। এই কোবাল্ট কম্পাউণ্ড বিনষ্ট করে দিলে আর লিভারের কার্যকারিতা থাকে না। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়াও সারে না। বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্তে এলেন যকৃতের মধ্যে বর্তমান কোবাল্ট কম্পাউণ্ডই হল অ্যান্টি পারনিসিয়াস ফ্যাক্টর। এই কোবাল্ট কম্পাউণ্ডের নাম দিলেন সায়ানোকোবালামিন্ (**cyanocobalamin**) অথবা ভিটামিন বি ১২।

ভিটামিন বি ১২ লোহিতকণিকার সৃষ্টিতে প্রধান সহায়ক। ধীরে ধীরে ভিটামিন বি ১২ কে লিভার থেকে আলাদা করা হল, কিন্তু কিছুতেই এর সঠিক চরিত্র উপলব্ধি করা সম্ভব হল না। আন্দাজে ভিটামিন বি ১২-এর ওজন ঠিক করা হতে লাগল।

১৯৫৫ সালে মিসেস ডরোথি ক্রোফুট্ হজ্‌কিন অক্সফোর্ড-এ ভিটামিন বি ১২-এর ওজন সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। তিনি এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি যন্ত্রের সাহায্যে ভিটামিন বি ১২-এর নিখুঁত মলিকিউলার বর্ণনা দিলেন। এই অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মিসেস ডরোথি ক্রফোর্ড হজকিন্ ১৯৬৪ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন। তিনি মহিলা রসায়ন-শাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে তৃতীয় মহিলা যিনি এই সম্মানে ভূষিতা হন।

ভিটামিন বি ১২ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। নরম্যান জলিফে, নরম্যান ওয়েজেল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে ভিটামিন বি ১২ শিশুদের পুষ্টি এবং শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানকালের চিকিৎসাশাস্ত্রে ভিটামিন বি ১২ আবিষ্কার এক আশ্চর্য সংযোজন এবং বহু দুরারোগ্য রোগ এই ভিটামিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাময়

হয়ে যায়। প্রতিদিন ভিটামিন বি ১২ অতি সামান্য পরিমাণেই লাগে। যাঁরা ওষুধ ব্যবহার করতে চান না, প্রতিদিন যকৃৎ খেলে রক্তাল্পতাজনিত রোগ বা পুষ্টিহীনতা জনিত রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়।

॥ বত্রিশ ॥

যুদ্ধ! যুদ্ধ!!

একদিকে জার্মান জাপান অন্যদিকে শক্তিমান ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী। ইওরোপ, ইংলণ্ড আর আমেরিকার বিরুদ্ধে হের' হিটলার নাৎসী বাহিনী নিয়ে উল্কার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

যুদ্ধ মানেই রক্তারক্তি! বোমার আঘাতে আহত হয়ে একের পর এক সৈন্য ক্যাম্প হসপিটালে আসছে। কারুর পা উড়ে গেছে বোমার আঘাতে, কারুর হাত। কারুর বা পাঁজরা খসে পড়ে গেছে। অনেকে হাসপাতালে আসার আগেই স্ট্রেচারের ওপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

ক্যাম্পের ডাক্তার ল্যাণ্ডস্টিনার ক্ষিপ্রহাতে রোগীদের চিকিৎসা করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে নার্স এলিজাবেথ যন্ত্রপুতুলের মত সাহায্য করে চলেছেন।

ডাক্তার প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, কিন্তু আশা নেই। নতুন তাজা প্রাণের যুবক সৈনিকের দল! আহত অবস্থা থেকে আর তারা সুস্থ হতে পারছে না। বোমার আঘাতে হাঁটু থেকে পা খসে পড়ে গেছে। রক্ত ঝরছে! এত রক্ত ক্ষয় হয়েছে, যে তার পূরণ না হলে বাঁচা সম্ভব নয়। ডাক্তার রক্ত বন্ধ করতে পারেন। ক্ষতস্থানকে সেলাই করে আবার নতুন করে দিতে পারেন, কিন্তু যে রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে, তাকে পূরণ করে দিতে পারেন না।

তাজা প্রাণের যুবক সৈনিক! রক্তের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ডাক্তারের নিষ্ফল প্রয়াস, নার্সের ব্যর্থ সেবাযত্ন।

—রক্ত, রক্ত চাই এলিজাবেথ! ল্যাণ্ডস্টিনার চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন—যদি ওইসব আহত সৈনিকদের শরীরে তাজা রক্ত দিতে পারতুম, ওরা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠত।

—রক্ত! এলিজাবেথ আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিল—রক্ত কোথায় পাবেন স্যার?

ল্যাণ্ডাস্টিনার কোন উত্তর দিলেন না। চিন্তিত মনে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। যাবার সময় আদেশ দিয়ে গেলেন, নতুন পেশেণ্ট এলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে।

নিজের ঘরে ঢুকে বই খুলে বসলেন। রক্ত নিয়ে ভূতপূর্ব চিকিৎসকরা কি গবেষণা করেছেন, তার সন্ধান পাবার জন্যে। নেই, তেমন কিছু তথ্য নেই, যার ওপর নির্ভর করে ল্যাণ্ডস্টিনার গবেষণা করতে পারেন। রোগীর শরীরে রক্ত দান সরকার থেকে নিষিদ্ধ করা আছে। রক্ত দিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে। রক্ত শরীরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজন অভিযোগ করেছেন ডাক্তার ইচ্ছে করে রোগীকে হত্যা করেছেন। তাঁর শাস্তি দেওয়া হোক। চিকিৎসকের শাস্তি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, রক্ত দিয়ে যেন কোন চিকিৎসা না করা হয়।

না, না, না—

ল্যাণ্ডস্টিনার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন—না। এ ভুল। রক্ত দিয়ে কি চরিত্র বদলানো যেতে পারে?

আগেকার ডাক্তারদের ধারণা ছিল, রক্ত দিয়ে মানুষের চরিত্রের ধারাকে বদলানো যেতে পারে। পাগলের চিকিৎসা করা হত রক্ত দিয়ে। ভেড়ার রক্ত, ঘোড়ার রক্ত, নানারকম জন্তু-জানোয়ারের রক্ত মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত। তারপর কেউ ভাল হত, কেউ বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

বই বন্ধ করে দিলেন ল্যাণ্ডস্টিনার।

না। রক্তের প্রধান কাজের কথা কেউ তেমনভাবে ভাবেননি। ল্যাণ্ডস্টিনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন রক্ত শুধু রক্ত নয়। লাল রক্তের মধ্যে জলীয় ভাগ আছে, কঠিন ভাগ আছে। জলীয় ভাগকে বলা হয় প্লাজামা। এই প্লাজামা প্রোটিন দিয়ে তৈরি। প্রোটিন, শরীরের পুষ্টিসাধন করে। কঠিন পদার্থের মধ্যে কণিকাসমষ্টি আছে। লোহিতকণিকা, শ্বেতকণিকার দল, রক্তের প্রকৃত কাজ করে। শ্বেতকণিকা শরীরের মধ্যে জীবাণু আক্রমণ হলে প্রতিরোধ করে, আর লোহিতকণিকার মধ্যে লাল রঙের একটি পদার্থ আছে। এই পদার্থের নাম হিমোগ্লবিন্। হিমোগ্লবিন্ ফুসফুস থেকে অক্সিজেন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ সীমায় বহন করে নিয়ে যায়। অক্সিজেন ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচতে পারে না। শরীরের প্রত্যেকটি কোষ কাজ করে, সেই কাজ অক্সিজেনের মাধ্যমে হয়। অক্সিজেন বহন করার একমাত্র উপায় হিমোগ্লবিন্। হিমোগ্লবিন্

ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শুধু অক্সিজেন নয়। শরীরের কোষ অক্সিজেনের সাহায্যে কাজ করে, অক্সিজেন পুড়ে ছাই হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হয়ে যায়। সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড হিমোগ্নবিনের সাহায্যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে ফুসফুসে চলে যায়।

হিমোগ্নবিন!

রক্তের মধ্যে যে হিমোগ্নবিন আছে, সেই হিমোগ্নবিন্ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। শরীরে রক্ত দিলে, তৈরি হিমোগ্নবিন্ শরীরে প্রবেশ করবে আর শরীরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ল্যাণ্ডস্টিনার গবেগণা শুরু করলেন। অবাক্ হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন পশুপাখির রক্তের হিমোগ্নবিন্ আর মানুষের হিমোগ্নবিন্ একেবারে আলাদা রকমের। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করলে অনায়াসে বলে দেওয়া যায়, কোন্‌টি পশুর রক্ত আর কোনটি মানুষের রক্ত! মানুষের রক্ত পশুর রক্তের সঙ্গে মেশালেই সঙ্গে সঙ্গে ছানা কেটে যায়। হিমোগ্নবিন্ ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। রক্তের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের সমস্ত রক্ত ছানা কেটে যায়। রোগী মারা যায়।

ছানা কাটা বাঁচিয়ে যদি রক্ত দেওয়া যায়, তাহলেই রক্তদানের সফলতা আসবে।

ল্যাণ্ডস্টিনার আবার গবেষণায় বসলেন। মানুষের শরীরে মানুষের রক্তই দিতে হবে। পশুপাখির রক্ত মেশাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের শরীরে অন্য কোন পশুর রক্ত দেওয়া সম্ভব নয়!

—এলিজাবেথ! ল্যাণ্ডস্টিনার-এর ডাকে এলিজাবেথ পাশে দাঁড়াল।

মানুষের রক্ত কোত্থেকে পাই?

এলিজাবেথ মৃদু হাসল।

ল্যাণ্ডস্টিনার এলিজাবেথের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন—হাসবার মত কি বললাম?

—মানুষের রক্ত কোত্থেকে পাবেন আমায় জিজ্ঞাসা করছেন? কে দেবে বলুন?

তুমি দিতে পারো?

—পারি। দৃঢ়চিত্তে এলিজাবেথ জবাব দিল,—আমার রক্তে যদি একটা জীবন বাঁচে নিশ্চয়ই দেব।

—বাঁচবে কি না জানি না, চেষ্টা করতে পারি।

ল্যাণ্ডস্টিনার সিরিঞ্জ ঠিক করে এলিজাবেথের শিরা থেকে খানিকটা রক্ত টেনে নিয়ে বললেন—এখন অল্প একটু নিলাম। প্রয়োজন হলে বেশী নেব।

একটা শিশির মধ্যে রক্ত রেখে, শিশিটা বরফের মধ্যে রেখে দিলেন ল্যাণ্ডস্টিনার। গবেষণায় দেখেছেন, রক্ত বরফের মধ্যে রেখে দিলে ঠিক থাকে। সাধারণ আবহাওয়ার মধ্যে রাখলে হিমোগ্লবিন্ গলে যায়। রক্ত নষ্ট হয়ে যায়।

—ও ভাবে রাখলেন কেন? এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল।

—কারণ আছে। পরে বলব।

ক্যাম্পের বাইরে মুমূর্ষু আর্তনাদ। কাতারে কাতারে আহত সৈনিকদের নিয়ে ট্রাক আসছে। ট্রাকের ওপরই একটা বোমা পড়েছে। চারিদিকে তছনছ হয়ে গেছে ট্রাকগুলো। কিছুসংখ্যক সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কিছু তখনও বেঁচে আছে।

ক্যাম্পের দরজার কাছে ল্যাণ্ডস্টিনার দাঁড়ালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এল। যুদ্ধের চেয়ে বড় অভিশাপ বোধহয় মানুষের সমাজে আর নেই।

একটি ছেলের দিকে নজর পড়ল ল্যাণ্ডস্টিনারের। ফরসা ধবধব করছে রঙ। কোঁকড়া কোঁকড়া লাল চুল কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পায়ের খানিকটা উড়ে গেছে বোমার আঘাতে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে ফরসা মুখখানি।

পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল এলিজাবেথ সৈনিকের ওপর। আকুল হয়ে ডাকল—টম্—টম্—।

ক্ষিপ্রগতিতে ল্যাণ্ডস্টিনার ক্ষতস্থান চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কে!

—আমার ছোট ভাই। কাঁদতে কাঁদতে এলিজাবেথ বলল—ও বাঁচবে ডাক্তার?

—বলা মুশকিল। যে পরিমাণ রক্তক্ষয় হয়েছে; কিছু রক্ত না দিলে বাঁচানো সম্ভব হবে না মনে হচ্ছে।

এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে উঠে কঠিনকণ্ঠে বলল—আমার রক্ত দিলে হবে না?

—পরীক্ষা না করে কিছু বলতে পারছি না। ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও।

কাল বিলম্ব না করে এলিজাবেথ এবং ল্যাণ্ডস্টিনারের সহকারীরা টম্‌কে

অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। ল্যাণ্ডস্টিনার টমের শিরা থেকে খানিকটা রক্ত টেনে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

এলিজাবেথের সঞ্চিত রক্ত থেকে খানিকটা রক্ত নিলেন, তারপর টমের রক্তের খানিকটা নিয়ে একটা স্লাইডের ওপর মিশিয়ে দিলেন।

এক মিনিট, দু মিনিট, পাঁচ মিনিট—।

ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রাখছেন ল্যাণ্ডস্টিনার আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন।—আধঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু কই ছানা তো কাটল না!

তাড়াতাড়ি মাইক্রোস্কোপ বার করে তার নীচে স্লাইডখানি ধরলেন। মাইক্রোস্কোপের ভিতর চোখ রেখে পরিষ্কার দেখতে পেলেন, প্রত্যেকটি লোহিত কণিকা নিখুঁত রয়েছে। একটিও নষ্ট হয়নি। একটিও গলে যায়নি।

ল্যাণ্ডস্টিনার পাগলের মত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেই এলিজাবেথকে আদেশ দিলেন—তোমার ভাইয়ের পাশে, তুমি শুয়ে পড়।

বিনা দ্বিধায় এলিজাবেথ আদেশ পালন করল। অন্য ডাক্তাররা বললেন—কি করছেন ডক্টর ল্যাণ্ডস্টিনার? অপারেশনে দেরি করলে পেশেণ্টকে আর বাঁচানো যাবে না।

—ব্লাডপ্রেসার কত?

—নেই বললেই চলে। রোগীর জ্ঞানও নেই।

—আপনারা অপারেশন স্টার্ট করুন। আমি দেখছি পেশেণ্ট-এর ব্লাডপ্রেসার তোলা যায় কি না?

ডাক্তাররা ল্যাণ্ডস্টিনারের নির্দেশমত অপারেশন করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ল্যাণ্ডস্টিনার একটি সরু লম্বা রবারের নল নিলেন। নলের দুপাশে দুটি ইনজেকশনের ছুঁচ লাগিয়ে নিলেন। একটি ছুঁচ এলিজাবেথের শিরায় ঢুকিয়ে দিলেন। নলের ভিতর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। অন্যদিকের ছুঁচটি টমের শিরায় ফুটিয়ে দিলেন। এলিজাবেথের রক্ত রবারের নলের ভিতর দিয়ে টমের দেহের মধ্যে চলে গেল।

ল্যাণ্ডস্টিনারের হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করে চলছে। যদি শরীরের মধ্যে গিয়ে ছানা কেটে যায়? পালস দেখলেন ল্যাণ্ডস্টিনার। টমের পালস আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে। ব্লাডপ্রেসার উঠছে।

—পেসেণ্ট কেমন? ল্যাণ্ডস্টিনার আনেস্থেটিস্টকে প্রশ্ন করলেন।

—ভাল। খুব ভাল।

ছুঁচ বার করে নিলেন ল্যাণ্ডস্টিনার। বেশী রক্ত দিলে টমের দুর্বল হৃৎপিণ্ড সহ্য করতে পারবে না। এলিজাবেথও অত্যাধিক দুর্বল হয়ে পড়বে।

রক্ত দেওয়া শেষ হয়ে গেল। এলিজাবেথ উঠে বসতে গেল। ল্যাণ্ডস্টিনার বাধা দিয়ে বললেন—উঠো না। মাথা ঘুরতে পারে—।

—কিচ্ছু হবে না। জোরের সঙ্গে মাথা ঝেড়ে এলিজাবেথ উঠে দাঁড়াল। ল্যাণ্ডস্টিনার দেখলেন সত্যিই এলিজাবেথ সুস্থ।

টমের একটা পা বাদ দিতে হল, তবু টম সুস্থ হয়ে গেল। যে অপারেশনে এর আগে রোগী বাঁচত না, সেই অপারশনেই টম বেঁচে উঠল।

এলিজাবেথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ল্যাণ্ডস্টিনারকে বলল—ডাক্তার! পৃথিবীর সব সৈনিককে বাঁচাবার জন্যে আমি রক্ত দেব।

মৃদু হেসে ল্যাণ্ডস্টিনার বললেন—ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

—তার মানে?

—পৃথিবীর সব মানুষের রক্ত এক নয়।

—সে কি! সব রক্তই তো লাল!

—লালের মধ্যেও প্রভেদ আছে।

—আমায় বুঝিয়ে বলুন ডাক্তার।

ল্যাণ্ডস্টিনার ধীর কণ্ঠে বললেন—তোমার রক্তের নাম দিয়েছি এক'। তোমার রক্ত আর তোমার ভাইয়ের রক্ত একই রকমের। তোমার ভাইয়ের রক্তও 'এক'-গ্রুপের। কিন্তু আমার রক্তের সঙ্গে তোমার রক্ত মিলবে না। মেশালেই ছানা কেটে যাবে।

—তাহলে? এলিজাবেথের হতাশা মেশানো জিজ্ঞাসা।—আমার রক্ত দরকার হলে টম্ ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না?

—পারবে। পৃথিবীর যত লোকের 'এক'-গ্রুপের রক্ত আছে, তারা সবাই দিতে পারবে।

—কত রকমের রক্তের গ্রুপ আছে?

—চার রকমের। এক, দুই, তিন, চার। পৃথিবীর সমস্ত লোক এই চার ধরনের রক্ত বহন করছে।

—কিন্তু এত লোকের রক্ত পাবেন কি করে?

—সেই ব্যবস্থাই আমাকে করতে হবে। চিন্তিত মুখে ল্যাণ্ডস্টিনার বললেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি যত বেড়ে চলল; ল্যাণ্ডস্টিনারের গবেষণাও তত পুরোদমে চলতে লাগল। ল্যাণ্ডস্টিনার পাশাপাশি শুইয়ে অনেক রক্ত নিয়েছেন, কিন্তু তাতে ঠিক মন সায় দিচ্ছে না। এ প্রথা বৈজ্ঞানিক প্রথা নয়। রক্ত সংগ্রহ করে বোতলে যদি রাখা যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে একটি হিসেব অনুযায়ী রক্ত দেওয়া যেতে পারে।

কি করে বোতলে রাখা যায়?

শরীরের বাইরে রক্ত এলেই জমাট বেঁধে যায়। রক্ত জমাট বেঁধে গেলে শ্বেতকণিকা লোহিতকণিকা জড়াজড়ি করে নষ্ট হয়ে যায়, আর জলীয় ভাগটা জলের আকারে গড়িয়ে আলাদা হয়ে যায়।

রক্তকে তরল করে রাখতে পারলেই সমস্যার সমধান হয়ে যাবে।

দিনের পর দিন গবেষণা করে চলেছেন ল্যাণ্ডস্টিনার। রক্তের মধ্যে কি আছে? কেন শরীরের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না? হিমোগ্লবিন্ কী করে শরীরের মধ্যে অটুট থাকে?

গবেষণা! গবেষণা!

কিছুতেই সুরাহা করতে পারেন না ল্যাণ্ডস্টিনার। শরীরের বাইরে রক্ত সঞ্চিত করে রাখা যায় কি করে?

দীর্ঘ দিন গবেষণার পর দেখা গেল সোডিয়াম সাইট্রেট আর গ্লুকোজ মিশ্রিত জলের মধ্যে যদি রক্ত সঞ্চিত করে রাখা হয়, তাহলে আর রক্ত জমাট বাঁধে না। শুধু তাই নয়। রক্ত সঞ্চিত করে বোতলগুলি রাখতে হবে অত্যন্ত ঠাণ্ডার মধ্যে, যে জায়গার উত্তাপ দু থেকে চার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে থাকবে। ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে থরে থরে রক্তের বোতল জমা হতে লাগল। আহত সৈনিকের দল, যারা রক্তের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত, তারা নিশ্চিতভাবে প্রাণ ফিরে পেতে লাগল। শুরু হল শল্য-চিকিৎসার নতুন অধ্যায়। অনেক দুরূহ অপারেশন, যা অত্যধিক রক্তক্ষয়ের ভয়ে পরিত্যাগ করা হত, তা অনায়াসে সাফল্য লাভ করল।

ল্যাণ্ডস্টিনারের মুখের ওপর আবার দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। অন্যান্য চিকিৎসকরা যখন সমস্যার সমাধান হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত, ল্যাণ্ডস্টিনার আবার চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেলেন।

সঞ্চিত রক্তের বোতলগুলি কিছুদিন রাখার পর নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। হিমোগ্লবিন্ নষ্ট হয়ে লোহিতকণিকা থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত রক্তের মধ্যে মিশে গেল। বোতলের রক্ত অকেজো হয়ে গেল।

কেন ? এরার তো রক্ত জমাট বাঁধেনি। ঠাণ্ডাও তো ঠিকই আছে। তাহলে ? রক্ত সঞ্চিত করে রাখার জন্য তাহলে আরও কিছু পদার্থের প্রয়োজন ?

গবেষণা আবার শুরু হল। ল্যাণ্ডস্টিনার দেখলেন লোহিতকণিকা তিন সপ্তাহ থেকে তিন মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকে। মানুষের শরীরের মধ্যেও লোহিত-কণিকার মৃত্যু ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন লোহিতকণিকার জন্ম হয়। মৃত লোহিতকণিকার অপ্রয়োজনীয় অংশ দেহের বাইরে চলে যায়, প্রয়োজনীয় অংশ নতুন লোহিতকণিকা সৃষ্টির কাজে লাগে। এই জন্মমৃত্যু শরীরের মধ্যে অহরহ ঘটছে। একে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই।

ল্যাণ্ডস্টিনার দেখলেন বোতলের মধ্যে রক্ত নিখুঁত থাকে চোদ্দ দিন। চোদ্দ দিনের পর থেকে লোহিতকণিকার মৃত্যু শুরু হয়। লোহিতকণিকার মৃত্যু হলেই হিমোগ্লবিন্ লোহিতকণিকা থেকে বেরিয়ে আসে। শরীরের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হিমোগ্লবিন্‌কে সরিয়ে নেওয়া হয়, বোতলের মধ্যে সে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হবার সম্ভাবনা নেই। তাই দূষিত হিমোগ্লবিন্ বোতলের সমস্ত রক্তকে নষ্ট করে ফেলে।

সব দিক চিন্তা করে, সমস্ত অনুসন্ধানের পর ল্যাণ্ডস্টিনার সাব্যস্ত করলেন রক্ত সংগ্রহের দিন থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে রক্ত ব্যবহার করতে হবে। যদি না হয়, তাহলে সেই বোতলকে বাতিল করে দেওয়া হবে।

পৃথিবীর দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হল প্রত্যেক হাসপাতালের সঙ্গে। রক্ত দানের সঙ্গে চিকিৎসা জগতের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। শল্য-চিকিৎসার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হল।

পুরনো দিনের রক্ত-গ্রুপকে নতুনভাবে নামকরণ করা হল। পৃথিবীর সব দেশই বর্তমান নামকরণ স্বীকার করে নিলেন।

পুরনো দিনের 'এক' এর নতুন নামকরণ হল 'এ বি' গ্রুপ, 'দুই' এর নাম হল 'এ', 'তিন', হল 'বি' আর 'চার' হল 'ও'।

তবু সমস্যা রয়ে গেল। নিখুঁত রক্ত দিয়েও দেখা হল অনেক সময়ে রোগী বা রোগিণীর নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক সময়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়। কেন ? আবার গবেষণা শুরু করলেন বৃদ্ধ ল্যাণ্ডস্টিনার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গেছে। পৃথিবীতে আবার সন্ধির পতাকা উড়েছে, কিন্তু যে যুদ্ধ

শুরু করেছিলেন ল্যাণ্ড স্টনার, তার শেষ হয়নি। আবার নতুনভাবে যুদ্ধ করতে বসলেন ল্যাণ্ড স্টনার।

ঠিক আছে তো সব কিছুই। রক্তের গ্রুপ ঠিক আছে। সঞ্চিত রক্তেরও কোন দোষ নেই। যে রোগীকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে, তার রক্তেও কোন দোষ নেই। তবে কেন গোলমাল হচ্ছে? যদিও এই প্রতিক্রিয়া ক্বচিৎ কদাচিৎ। তবুও কেন হবে? কেন নিশ্চিন্তভাবে রক্ত দেওয়া যাবে না?

না। গ্রুপের মধ্যে কোথাও গোলমাল নেই। বার বার পরীক্ষা করে দেখলেন ল্যাণ্ড স্টনার, কিন্তু কোন দোষত্রুটি পেলেন না কোথাও। তাহলে কি রক্তের মধ্যে আরও কিছু আছে?

বিদ্যুৎ-ঝলকানি ল্যাণ্ড স্টনারের মস্তিষ্কে। নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে। গবেষণা শুরু করলেন। যে সব বোতলের রক্ত দিয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটছে সেই সব বোতলের লেবেল থেকে রক্ত দাতাদের নাম খুঁজে বার করলেন। তাঁদের রক্ত আবার পৃথক্‌ভাবে সংগ্রহ করে গবেষণা শুরু করলেন।

আশ্চর্য!

গবেষণা করতে করতে ডাক্তার দেখলেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের রক্ত দু ভাগে ভাগ করা চলে। শতকরা পঁচাশি জন মানুষ একদিকে, আর শতকরা পনেরো জন আর একদিকে। শতকরা পনেরো জন যে পক্ষে তাদের রক্তের দ্বারা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। একই গ্রুপের রক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদের রক্তের বৈচিত্র্য পৃথক ধরনের। এদের রক্ত, শতকরা পঁচাশি জনের রক্তের সঙ্গে খাপ খায় না। এদের রক্তকে বলা হয় রেশাস্‌ নেগেটিভ্‌। শতকরা পঁচাশি জন যে ধরনের রক্ত বহন করছে, তার নাম দেওয়া হল রেশাস্‌ পজিটিভ্‌। রেশাস্‌ নেগেটিভ্‌ রক্ত রেশাস্‌ পজিটিভ্‌ রক্তের সঙ্গে কোনদিন খাপ খাবে না; একই গ্রুপের রক্ত হওয়া সত্ত্বেও।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সংগ্রহের ইতিহাস বদলে গেল। আধুনিকতম সরঞ্জাম তৈরি হল রক্ত সঞ্চয় করে রাখার জন্য। জলীয় রক্তকে শুকিয়ে 'শুকনো রক্ত' তৈরি করা হল। শুকনো রক্ত যে কোন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এর জন্য ঠাণ্ডা ঘরের প্রয়োজন হয় না। দূর গ্রামে বা অরণ্যের মাঝখানেও মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচবার জন্য শুকনো রক্ত অনায়াসে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। দেবার সময় শুধু জল মিশিয়ে নিলেই স্বাভাবিক রক্তের মতই শিরায় প্রবেশ করানো যায়।

ল্যাণ্ড স্টনার চিকিৎসার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন রক্ত দানের ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রথায় গড়ে তোলার জন্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর বুকে অনেক

অভিশাপ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু রক্ত-চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করে দেবার জন্যে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের আশীর্বাদ চিরকাল বহন করবে।

॥ তেত্রিশ ॥

আশ্চর্য !

কে জানতো এই বিশ্রী পদার্থ একদিন পৃথিবীতে সোনার চেয়েও আদরণীয় হয়ে উঠবে।

পারস্য দেশের মানুষ ভাবতো, ভগবান তাদের সহায়। তাদের পূজনীয় দেবতা হল আগুন। পারস্য দেশের নানা জায়গায় এরা আগুন জ্বালতো, আর আগুনের সামনে বসে দেবতার পুজো করত। আশ্চর্য ব্যাপার। দেবতা তাদের ছাড়তে চান না। একবার আগুন জ্বাললে, সে আগুন আর নেবে না। গাঁয়ের মানুষ তাকে বলে শাশ্বত- আগুন।

অগ্নিদেবতা পারস্যের মানুষকে আরও সাহায্য করেন। পারস্যের বিরুদ্ধে যখন কোন দেশের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন মাটি ফেটে একরকমের কালো ঘন কালি বেরিয়ে আসে। সেই ঘন কালি তীরের মুখে মাখিয়ে নিয়ে মশালের মত তৈরি করে, ধনুকে লাগিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারত। আশ্চর্যের বিষয়, তীরবেগে শর নিক্ষেপ করলেও মশালের আগুন নিবতো না। উড়ন্ত তীরের ফলায় এসে কুঁড়েঘরগুলোর ছাদে আগুন লাগিয়ে দিত। গ্রামবাসীরা ভয়ে এদিক-ওদিক পালাতো। শত্রুপক্ষ অবাক হয়ে দেখতো, এ কেমন তীর ? তীরের ফলায় বিষ মেশানো যায়, কিন্তু আগুন মেশায় কী করে ? গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়, শত্রুপক্ষরা এঁটে উঠতে পারে না, অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়।

পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বে গ্রীসে হেরোডোটাস নামক একজন ঐতিহাসিক পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন, পারস্য দেশের অধিবাসীরা ডোবাখানা থেকে এক রকমের ঘন কালি তুলে আনে। এই কালি দেখতে খুব কালো এবং চটচটে। গন্ধ খুব বিশ্রী। এই কালি এরা ঘর তৈরির কাজে লাগায়। আঠার মত কালি দিয়ে ঘরের বেড়া জোড়া লাগাতো।

ভেনিসের বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে

চীনের সম্রাট কুবলাই খাঁয়ের সভায় বেড়াতে যান। সেখানে যাবার সময় বাকু অঞ্চলে তিনি এক রকমের আশ্চর্য ধরনের ঝরনা দেখতে পান। এ ঝরনা দিয়ে জল বার হয় না, তেল বার হয়। এই তেল খাবার উপযোগী নয়, তবে জ্বালানির জন্যে খুব ভালভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই তেলের বিষয় আরও খোঁজ শুরু হয় আমেরিকায়। উত্তর আমেরিকার বহু অঞ্চলে জলের ওপর এক ধরনের তেল ভাসতে দেখা যেত। রেড ইণ্ডিয়ানরা এই তেল মেশানো জল গায়ে মাখতো বাত ধরনের রোগ সারাবার জন্যে। অনেকে আবার এই তেল মেশানো জল ওষুধ হিসেবে নানা রোগে খেত।

ইউরোপ থেকে যখন আমেরিকায় অধিবাসীরা উপনিবেশ পত্তন শুরু করলেন, তখন তাঁরাও রেড ইণ্ডিয়ানদের দেখাদেখি গায়ে তেল মেশানো জল মালিশ করতেন, এবং দেখা গেল, তাতে চামড়া বেশ টানটান হয়। এই তেল মেশানো জলকে বলা হত সেনেকা তেল অথবা ইণ্ডিয়ান অয়েল।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার লোকেরা নোনতা জল ব্যবহারের জন্য কূপ খুঁড়ে আশ্চর্যভাবে দেখল জলের সঙ্গে তেলের মিশ্রণ রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, কারণ এই তেল মেশানো বিশ্রী গন্ধের জল ব্যবহারের যোগ্য নয়। সকলেই রেগে-মেগে কূপগুলো আবার বুজিয়ে দিল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোভা স্কোটিয়া অধিবাসী ডক্টর অ্যাব্রহাম গেস্‌নার কয়লা থেকে জ্বালানি আবিষ্কার করেন। অ্যাব্রাহাম গেস্‌নার এই তেলের নাম দিলেন কেরোসিন। গ্রীক শব্দ কেরাস (Keras) মানে হল মোম (Wax)। মোমবাতি যেমন অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে, কেরোসিন তেলের আলোও অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। সেইজন্যে এই তেলের নাম দিলেন কেরোসিন। এই সময়ে একটি কোম্পানী তৈরি করা হল, যে কোম্পানী এই তেল-ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই কয়লা-তেল থেকে আরও সুন্দর ধরনের তেল আবিষ্কার করার জন্য ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিলভানিয়ার অয়েস ক্রিক-এর অধ্যাপক বেনজামিন সিলিম্যান, যিনি ইয়েল কলেজের অধ্যাপক, তিনি আবিষ্কার করলেন আর এক রকমের তেল, যে তেলের জ্বালানি শক্তি কয়লা এবং কেরোসিনের চেয়েও বেশি এবং সুন্দর।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই তেল ভীষণভাবে দাহ্য। আগুনের

কাছাকাছি নিয়ে গেলেই দপ করে জ্বলে ওঠে এবং সে আগুন সহজে নেবানো যায় না।

রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই তেলের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ থেকে আটানব্বুই ভাগ হাইড্রোকারবন আছে, বাকী অংশ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন অথবা গন্ধক জাতীয় জৈব পদার্থ বিদ্যমান।

এ তেল এল কোথা থেকে? কী ভাবে?

আবার গবেষণা।

গবেষণার সূত্র থেকে আশ্চর্য ধরনের ব্যাখ্যা তৈরি করলেন বিশেষজ্ঞগণ। অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী এবং লতাগুল্ম সমুদ্রের তলায় জমা হয়ে থাকে। এই প্রাণী এবং ভেষজ উদ্ভিদ মৃত অবস্থায় জমা হয়ে পড়লে, তার ওপর ক্রমশঃ বালি, মাটি, পাথর প্রভৃতি চাপা পড়ে। এমনিভাবে প্রাণীজ এবং উদ্ভিদজাত অংশগুলি পৃথিবীর চাপে এবং উষ্ণতায় বিবর্তিত হতে থাকে। সেই বিবর্তন থেকে ক্রমশঃ মৃত প্রাণী এবং উদ্ভিদ থেকে মাটির তলায় গ্যাস তৈরি হয়, যাকে বলে প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) আর তৈরি হয় দহনীয় তেল যার বৈজ্ঞানিক নাম পেট্রোলিয়াম।

অনেক বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে যথেষ্ট হাইড্রোকারবন আছে। সেগুলি মৃত্যুর পর অক্সিজেন এবং অন্যান্য পদার্থের প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ামে পরিবর্তিত হয়, অবশ্য সেজন্যে পৃথিবীর উপরিভাগের চাপ এবং উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

পেট্রল সাধারণতঃ জল ও গ্যাসের সঙ্গে একসঙ্গে থাকে। পৃথিবীর উপরিভাগে থাকে স্তরীভূত প্রস্তর। তার নীচের স্তরে থাকে গ্যাস, তার তলায় পেট্রল থাকে, তার নীচে জল এবং তার নীচে আবার স্তরীভূত প্রস্তর।

যখন পেট্রলের সন্ধানে গর্ত খোঁড়া হয় তখন গর্ত স্তরীভূত প্রস্তর স্তর ভেদ করে গ্যাসের স্তরে পৌছায়। যে মুহূর্তে গর্ত গ্যাসের স্তরে পৌছায়, সেই মুহূর্তে গ্যাসের চাপে পেট্রল ফোয়ারার মত উপরে উঠে আসে। ভূতত্ত্ববিদেরা কোথায় পেট্রল সঞ্চিত আছে, এ নিয়ে সদাসর্বদা গবেষণা করছেন। ওঁদের এক রকমের যন্ত্র আছে, যার নাম সেস্‌মোগ্রাফ্। এই যন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ভূত্বকের বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা হয়ে যায় আর তাইতে বোঝা যায় মাটির নীচে কী ধরনের প্রস্তর আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা আগে ডিনামাইট ফাটিয়ে ছোটখাটো একটা ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেন, সঙ্গে সঙ্গে সেস্‌মোগ্রাফ মেলে ধরেন। পৃথিবীর

উপরিভাগ এবং মধ্যেরও কিছু ভাগ কম্পিত হয়ে ওঠে এই কৃত্রিম ভূমিকম্পে। বিভিন্ন প্রস্তরের কম্পন বিভিন্নভাবে ফুটে ওঠে সেস্‌মোগ্রাফে। কম্পিত প্রস্তরের কম্পন-চিত্র সেস্‌মোগ্রাফে ফুটে ওঠে আর সেই কম্পিত চিত্র দেখে বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পারেন প্রস্তর স্তরের নীচে পেট্রল আছে কি নেই।

স্থান নির্বাচনের পর খোঁড়ার আয়োজন শুরু হয়। যে স্থান পেট্রল অন্বেষণের জন্য নির্বাচিত হয়, সে স্থানে প্রথমে একটা বিরাট প্লাটফর্ম করা হয়। প্লাটফর্মের প্রান্তে একটি উঁচু ক্রেন্ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর উঁচু ক্রেন থেকে ড্রিল লাগিয়ে দেওয়া হয়। ড্রিল একটা পাইপের মধ্যে পরিয়ে চালু করা হয়। ড্রিল ঘুরে ঘুরে মাটি খুঁড়ে মাটির মধ্যে ঢুকে যায়, ড্রিলের সঙ্গে পাইপও মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। ড্রিল পাথর কেটে কেটে যত গভীরে ঢুকে যায়, পাইপও ক্রমশঃ মাটির তলায় ঢুকে যায়। যখন পাইপ পুরো মাটির তলায় ঢুকে যায়, তখন পাইপের মাথায় নতুন পাইপ লাগিয়ে লম্বা করা হয়। এইভাবে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে যখন ড্রিল সমেত পাইপ পেট্রলের স্তরে পৌছায়, তখন পাইপকে যথা-স্থানে রেখে ভেতর থেকে ড্রিল তুলে নেওয়া হয়। পেট্রল স্তর থেকে প্রথমে পেট্রল মেশানো কাদা ওঠে। পাম্প করে পেট্রলের কাদা তুলে গর্তের আশে-পাশেই ফেলা হয়। আলকাতরার মত পদার্থ গর্তের আশেপাশে ঢুকে গিয়ে সমস্ত ফুটোগুলো বন্ধ করে দেয় এবং শুধু পাইপ দিয়েই পেট্রলজাত পদার্থ ওপরে ওঠে। এ ছাড়াও ভাল স্টীলের পাইপ কেসিং হিসেবে পাইপের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পাম্প করে যে পেট্রল মাটির নীচু থেকে তোলা হয়, তাকে বলা হয় অপরিশোধিত বা ক্রুড পেট্রোলিয়াম।

অপরিশোধিত পেট্রলকে পরিশুদ্ধ করে মানুষের ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হয়। এই রাসায়নিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিস্টিলেশন। ডিস্টিলেশন প্রসেস খুব জটিল পদ্ধতি, তবে সহজভাবে বলা যায় এই অপরিশোধিত তেলকে গরম করে বাষ্পীভূত করা হয়, তারপর ঠাণ্ডা করে পরিশুদ্ধ তেল পৃথক করা হয়।

পেট্রল পরিশুদ্ধিকরণের মুশকিল হল, কোন পেট্রলজাত তেল সত্তর ডিগ্রী ফারেনহাইটেই গরম হয়ে যায় আবার কোন কোন পেট্রল তেল গরম হতে লাগে ছ'শ ডিগ্রী ফারেনহাইট। সেইজন্যে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করা হয় পাইপের দ্বারা। লম্বা পাইপের একদিকে অপরিশোধিত তেল ঢেলে দেওয়া হয়। পাইপের মধ্যে ক্রমশঃ উষ্ণতা বাড়ানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত ছ'শ পঞ্চাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়। এই উত্তাপের ভেতর দিয়ে অপরিশোধিত

তেল যেতে যেতে বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যখন সবচেয়ে বেশি গরম হয়ে যায়, তখন ঠাণ্ডা করে পরিশুদ্ধ তেল বার করে নেওয়া হয়।

পেট্রল থেকে বহু পদার্থের সৃষ্টি হয়। কোন পদার্থ তৈরি করতে প্রত্যক্ষ-ভাবে, কোন পদার্থে পরোক্ষভাবে পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন হয়।

যে পেট্রলে মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, ট্রাকটর প্রভৃতি চলে তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় গ্যাসোলিন। অপরিশোধিত পেট্রলের শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ ব্যবহৃত হয় গ্যাসোলিন তৈরির জন্য।

কেরোসিন তেলও তৈরি হয় অপরিশোধিত পেট্রল থেকে। যত পেট্রল পাওয়া যায়, তার শতকরা তেত্রিশ ভাগ ব্যবহৃত হয় কেরোসিন তৈরির জন্যে।

অপরিশোধিত পেট্রল থেকে ডিজেল পাওয়া যায়, যা দিয়ে বর্তমানে মোটর গাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি চলছে।

এ ছাড়াও বাড়িতে আলো জ্বালার জন্যে অপরিশুদ্ধ তেল ব্যবহার করা হয় আর সবচেয়ে অপরিশুদ্ধ কাদা কাদা তৈলাক্ত পদার্থ দিয়ে মেশিনে লাগিয়ে হড়হড়ে করা হয়। গ্রীজ দিয়ে মেশিন চালালে মেশিনের ক্ষতি হয় না এবং অনেকদিন টেঁকে।

প্রত্যক্ষ ব্যবহার ছাড়াও পেট্রোলিয়ামের পরোক্ষ ব্যবহার অসংখ্য পদার্থে প্রয়োজন হয়, যা বলে শেষ করা যায় না।

পেট্রল থেকে বহু রকমের পদার্থ আবিষ্কার মানুষ করেছে, কিন্তু পেট্রল কীভাবে তৈরি করতে হয়, তা এখনও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। প্রকৃতির কৃপায় যে সমস্ত দেশে পেট্রলের খনি আছে, সেই সমস্ত দেশ প্রকৃতির দানে ধনী হয়ে অন্য দেশকে নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছে। পেট্রলের খনি ফুরিয়ে গেলেই তারাও আবার গরিব হয়ে যাবে, এ কথা না ভেবেই প্রকৃতির দানকে মানুষের আবিষ্কার ভেবে গর্বভরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

॥ চৌত্রিশ ॥

১৬ই জুলাই। ১৯৪৫ সাল। শেষ রাত্রি। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগ্রদা এয়ার বেস-এর সৈন্যদল। মরুভূমি প্রান্তে এই বিমানকেন্দ্র। সামনে মরুভূমির ধুধু প্রান্তর। ছ' মাইল দূরে একটি ইস্পাতের গম্বুজের ওপর বসানো রয়েছে একটি নতুন ধরনের বোমা। নাকি পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে।

জিততেই হবে! প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাতির উদ্দেশ্যে দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করেছেন; যে ভাবেই হোক আমাদের জিততেই হবে। জার্মান বা জাপানের কাছে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করব না।

বৈজ্ঞানিকের দল প্রতিজ্ঞা করেছেন—জাতির সম্মান, দেশের সম্মান বাঁচাতেই হবে। এর আগেও যখনই দেশের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখনই তার সমাধান করেছেন। মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর রবার পাওয়া যায়। জাপানীরা ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় অধিকার করে নিলেন, সঙ্গে ইউরোপের বাজার থেকে রবার একেবারে উবে গেল। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের দল সকলকে ভরসা দিয়ে বললেন—কোন ভয় নেই, আমরা রবারের মত জিনিস ল্যাবোরেটরীতে তৈরি করে দিচ্ছি। তাঁরা কথা রাখলেন। দেখতে দেখতে নিয়োপ্রিন থায়োকল, বুটিল, বুনা, বুনা এস প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম (সিন্থেটিক) রবার তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন। এত তৈরি করে দিলেন যে শুধু আমেরিকা নয়, মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশই এই রবার ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

ঠিক তেমনি জার্মানীতে পেট্রলের অভাব দেখা দিল মারাত্মক রকমের। জার্মানীতে পেট্রল নেই। পেট্রল পাওয়া যায় যে সব দেশে, সবগুলিই মিত্রপক্ষের কবলে। পেট্রলের সংকট ঘোচাবার জন্য জার্মানীর বিজ্ঞানীরা গবেষণায় বসে গেলেন। দিনরাত গবেষণা করে কয়লা এবং লিগনাইট থেকে কৃত্রিম তেল তৈরি করে ফেললেন। যুদ্ধের সময় জার্মানের অর্ধেকের চেয়ে বেশি পেট্রলের চাহিদা এই কৃত্রিম তেল মিটিয়েছে।

দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমানপোত তৈরি করে জার্মান এত বলশালী হয়ে গেল যে বোমায় বোমায় মিত্রপক্ষকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। সমস্ত বৃটেন জার্মানীর উন্নত

ধরনের বিমানবাহী বোমার আঘাতে থরহরিকম্প। বোমার আঘাতে আঘাতে লণ্ডন শহরকে ধূলিসাৎ করে দেবার মনস্থ করেছেন হের হিটলার। চার্চিল নীরব নিথর। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ট্রুম্যান খাঁচায় বন্দী সিংহের মত গর্জন করছেন আর বলছেন—বোমা চাই। এমন বোমা, যে সমস্ত জার্মান আর জাপান বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিকের দল নীরবে এবং গোপনে গবেষণা করে গেছেন। তাঁদের গবেষণার কথা সাধারণের কেউ জানে না। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই বৈজ্ঞানিক দলের নেতা বললেন—আমরা প্রস্তুত।

ট্রুম্যান আদেশ দিলেন—প্রথম পরীক্ষা করা হবে নিউ মেক্সিকোর মরুপ্রান্তে। সৈন্যের দল অ্যাটেনশন্ হয়ে রইল এয়ার-বেস-এ। দূরে—ছ মাইল দূরে—একটি ইস্পাতের গম্বুজের ওপর সেই নবাবিষ্কৃত বোমাটি।

—ফায়ার! আদেশ দিলেন সেনাপতি।

মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার সূর্য একসঙ্গে জ্বলে উঠল। কয়েক হাজার বিদ্যুৎ যেন একসঙ্গে ঝলকে উঠল। দেখতে দেখতে নানা-রকমের রঙ চোখের সামনে খেলা করতে লাগল। সোনালী, লাল, বেগুনে, ধূসর নীল। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বিকট আওয়াজ আর উত্তপ্ত বাতাসের ঢেউ। যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে বোমা ফাটানো দেখছিলেন, তাঁরা বিদ্যুতের ঝলকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন। সকলের মনে হল, তাঁরা এক নতুন যুগের সূচনামুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

না—না। আমার কথা নয়। প্রত্যক্ষদর্শী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস এক ফ্যারেল এই ভয়ংকর বোমার বর্ণনা লিখেছেন।

নতুন নতুন সূচনা হল। নতুন বোমার নাম হল অ্যাটমিক বোম। সমস্ত মানুষের মনে হল তারা যেন এক নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের সকাল সাড়ে দশটায় আমেরিকার বৈমানিক জাপানের সৈন্য শিবির হিরোসিমার ওপর একটি অ্যাটমিক বোমা নিক্ষেপ করেছে।

এই বোমার শক্তি দু হাজার টি. এন. টি বোমার চেয়েও শক্তিশালী। এই বোমার নাম অ্যাটমিক বোমা।

আবার এই মারাত্মক বোমা পড়ল নাগাসাকির ওপর। আতঙ্কে শিউরে উঠল পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। এই ভাবে যদি একটির পর একটি বোমা পড়তে থাকে, সমস্ত পৃথিবী অল্পদিনের মধ্যেই জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে।

জাপান-জার্মান পরাজয় স্বীকার করল। অভিশপ্ত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান ঘটল।

আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে ঘোষণা করেছিলেন ম্যাটার এধং এনার্জি একই পদার্থ এবং একটি থেকে আর একটিতে রূপান্তরিত সম্ভব। আইনস্টাইনের ইকোয়েশন ফিজিকস্-এর ছাত্রছাত্রীরা ভাল করেই জানে। লিখলে এই রকম দাঁড়ায়।

E =

E – Energy, m – mass. c—velocity of light (186, 280 miles per second).

এই অঙ্কের মধ্যেই নিহিত ছিল বিশ্ববিখ্যাত ইঙ্গিত। এর মধ্যে বলা আছে, অতি অল্প পরিমাণের বস্তুকে কল্পনাতীত শক্তিশালী এনার্জিতে পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

ইটালীয়ান পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি (১৯০১-৫৪) চেষ্টা করতে লাগলেন, নিউট্রনগুলোকে সাবঅ্যাটমিক বুলেট হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি করে? তিনি নিউট্রনগুলোকে প্যারাফিনের ভেতর দিয়ে বাহিত করে দেখলেন নিউট্রন-গুলো ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। প্যারাফিনের মত অন্য কোন কার্বনজনিত পদার্থের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলেও একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। কঠিন জল (Hard water)-ও এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের পদার্থকে বলা হয় মডারেটর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানে বসবাসকারী ইহুদীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হের হিটলার কোন ইহুদীকে রেহাই দেবেন না। নাজী সৈন্যরা ইহুদী পেলেই নিধন করেন অথবা নির্বাসিত করেন।

লাইস্ মিটনার (Lise Mitner) একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদী বৈজ্ঞানিক! তিনি পদার্থবিশারদ। তিনি নাজীদের অত্যাচারে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন। কি করবেন তিনি। এখানে থাকলে নির্ঘাত নাজীসৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। বিজ্ঞানী বলে কোন সম্মানই দেবে না। ষাট বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী লাইস সকলের অগোচরে গোপনে কোপনহেগেন-এ পালিয়ে গেলেন।

জার্মানিতে দুজন বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিশারদ ওট্টো হান এবং এফ. ষ্ট্রস্‌ম্যান (Otto Han and F. Strassman) মন্থর নিউট্রন ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণে ব্যবহার করতেন। কোপন্‌হেগনে পালিয়ে যাবার আগে লাইস্ এঁদের সঙ্গে

গবেষণা করতেন। এঁরা যখন গবেষণার পরীক্ষা করতেন, অবাক হয়ে দেখতেন,
পথ ইউরেনিয়ামের অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে বেরিয়াম-এ পরিণত হত। বেরিয়াম
ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক হালকা।

লাইস্ যখন কোপন্‌হেগেন-এ পালিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন
আরও তুজন বিজ্ঞানী। তাঁদের নাম ফ্রলেন মিটনার আর ও. আর. ফ্রিস্ক্।
(Fraulen Meitner and O. R. Frisch) লাইস্ মিটনার ১৯৩৯ সালে
১৭ই জানুয়ারী নেচার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সেই প্রবন্ধে
লিখলেন মন্থর নিউট্রন যখন ইউরেনিয়ামের সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়, তখন ছাই
হিসেবে পড়ে থাকে বেরিয়াম। বেরিয়ামের অংশই বেশী। এই প্রবন্ধ পাঠ করে
ফ্রলেন এবং ফ্রিস্ক্ আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধে তাঁরা ঘোষণা
করলেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস যখন নিউট্রনের সহযোগে বিস্ফোরিত হয়, তখন
তুটি প্রায় একই মাপের নিউক্লিয়াসে ভেঙে যায়! তারই একটির নাম বেরিয়াম
পরমাণু; নিউক্লিয়াস ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়ার নাম দিলেন অ্যাটমিক ফিসন
(Atomic fission)

ফ্রলেন এবং ফ্রিস্ক্ তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বিখ্যাত ড্যানিশ পদার্থ
বিদ্যাবিশারদ নীলস্ বোর্-এর সঙ্গে একাধিবার আলোচনা করেন। নিলস্ বোর
১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে আমেরিকা যান। সেখানে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিকের
সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করেন। আমেরিকার
বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় লক্ষ্য করেন, ইউরেনিয়াম পরমাণু যখন নিউট্রন-এর
নিউক্লিয়াসের মধ্যে মিশে যায়, তখন বিস্ফোরণে নিউক্লিয়াসটি টুকরো টুকরো
হয়ে বেরিয়াম, ক্রিপ্‌টন্ (Barium and Krypton) এবং আরও অজ্ঞাত
পদার্থে পরিণত হয়। এই অজ্ঞাত বস্তু আরও টুকরো হয়ে, পারমাণিক বুলেটে
পরিণত হয় এবং আরও অধিক সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়।
এই রকম পদ্ধতিতে দেখা গেছে, পরপর অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।
একটি পরমাণুর পর, আর একটি পরমাণুর বিস্ফোরণ মাত্র কয়েক পল অনুপলের
মধ্যেই ঘটতে পারে। জার্মান এবং ফরাসী বৈজ্ঞানিকরাও পরীক্ষা করে দেখলেন
এক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েক কোটি পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একটি কমিশন গঠিত
করলেন। এই কমিশনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল যে, এই পরমাণু বিস্ফোরণের
পরীক্ষা-নিরীক্ষা যুদ্ধের কোন কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা বিচার করবার।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কমিশন তাঁদের রিরোর্ট পেশ করলেন, তাতে মন্তব্য করলেন—হ্যাঁ। এই পরীক্ষা পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সামরিক বিভাগ এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করল এবং মেজর জেনারেল লেসলি আর গ্রোভার এই বিভাগের দায়িত্ব নিলেন। পারমাণবিক বোমার গবেষণা নিয়মিত-ভাবে চলতে লাগল, কিন্তু খুব গোপনে কোন সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে যাতে ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রইলেন সামরিক বিভাগ। তারপর সাধারণ মানুষ একেবারে জানতে পারল ট্রুম্যানের ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের ঘোষণার পর। এর পরই প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হেন্‌রী ডি. স্মিথ, অ্যাটম বোমা তৈরির পদ্ধতি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অ্যাটমিক এনার্জি ফর মিলিটারী পারপাস্ প্রকাশ করলেন।

অভিশপ্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হল। পৃথিবীর বুকে আবার শান্তি নেমে এল, কিন্তু বিজ্ঞানীর দল অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগলেন। এ কি হল? এমন মারণাস্ত্র তৈরি হল যার শক্তিতে পৃথিবী ছারখার হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

এই অমিতশক্তিকে কি কল্যাণকর কাজে লাগানো যাবে না? তৈরি হল নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর গবেষণা। পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো যেতে পারে, একথা বৈজ্ঞানিকরা ঘোষণা করলেন। পরমাণু বিস্ফোরণে যে গতির সৃষ্টি হয়, তা দিয়ে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজ, এরোপ্লেন তৈরি করা সম্ভব।

দেখতে দেখতে তৈরি হল মহাকাশযান। প্রথম যুগের মহাকাশযানের চেয়ে এখন আরও ভাল ভাল মহাকাশযান তৈরি হচ্ছে। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাতায়াত করা অনেক সহজ হয়ে গেছে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারে।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কল্যাণে অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। আগে যে সব রোগের কারণ অজানা ছিল, রেডিও-অ্যাক্টিভ্ আইসোটোপের জন্য অতি সহজেই বোঝা যায়। গাছের সবুজ রঙ কি ভাবে তৈরি হয়, সেই ফটোসিন্থে-সিস-এর প্রক্রিয়া রেডিও-অ্যাকটিভ্ আইসোটোপের কল্যাণে জানা গেছে। রেডিও অ্যাকটিভ্ কোবাল্টের সাহায্যে ক্যানসারের মত দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পরমাণুর ব্যবহারে পৃথিবীর চেহারা আরও সুন্দর আরও গতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

একদিন যা অভিশাপ ছিল পৃথিবীর কাছে। আজ তাই আশীর্বাদরূপে দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

জেরহার্ড ডোম্যাক।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। সিল্ক ইণ্ডাস্ট্রির বাইরে নর্দমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডোম্যাক। রেশম শিল্পে রঙ করার জন্যে বিভিন্ন রকমের রঙ ব্যবহার করা হত, কিন্তু কোন রঙই পাকা নয়। দু একবার কাচলেই রঙ ধুয়ে বেরিয়ে যায়। হোরলিন একরকমের রঙ ব্যবহার করতেন, তাতে সালফোনামাইড নামের একটি রসায়নিক পদার্থ মেশাতেন। এই পদার্থ রঙের সঙ্গে মেশালে রঙ পাকা হয়ে যায় একেবারে।

জেরহার্ড ভাবছিলেন রেশম তো এক রকমের পোকা। পোকার গায়ে প্রোটিন আছে। সালফোনামাইড সেই প্রোটিন ভেদ করে রঙকে একেবারে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, সেইজন্যে রঙ পাকা হয়ে যায়।

১৯০৯ সাল থেকেই রেশম শিল্পে এই পদ্ধতি চলে আসছে। ১৯২৭ সালে জেরহার্ড ডোম্যাক দেখছিলেন অন্য জিনিষ। যে নর্দমা দিয়ে রঙ বেরিয়ে আসছে। সে নর্দমায় পোকা-মাকড় নেই বললেই চলে।

কেন ?

অ্যাজো ডাই আর সালফোনামাইড মিশিয়ে তৈরি করতে লাগলেন বিভিন্ন কম্পাউণ্ড পল আলিকের পদ্ধতি মত। তাদের কার্যক্ষমতা দেখতে লাগলেন গবেষণাগারে।

স্ট্রেপটোকক্কাস একরকমের জীবাণু যা মানুষের শরীরে অনেক রকমের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ডোম্যাক দেখলেন তাঁর তৈরি করা ওষুধে স্ট্রেপ্‌টো-কক্কাসই নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হচ্ছে।

ডোম্যাক ইঁদুরের শরীরে স্ট্রেপটোকক্কাসই প্রবেশ করিয়ে রোগ সৃষ্টি করলেন। তারপর নিজের তৈরি ওষুধ প্রয়োগ করলেন। দেখলেন ইঁদুরগুলো একেবারে সেরে গেল।

আবার পরীক্ষা করলেন। এবার কতকগুলি ইঁদুরকে ওষুধ দিলেন, কতকগুলিকে ওষুধ দিলেন না। যেগুলিকে ওষুধ দেওয়া হল, সেগুলো ভাল হয়ে গেল, যেগুলোকে ওষুধ দেওয়া হল না সেগুলো মারা গেল।

অ্যাজো রং ও সালফোনামাইড মিশ্রিত ওষুধটির রঙ ছিল লাল, তাই ডোম্যাক ওষুধটির নাম দিলেন প্রনটোসিল রুব্রাম।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ডোম্যাক বিভিন্ন ধরনের রোগে প্রনটোসিল ব্যবহার করে দেখলেন নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস জাতীয় রোগে অমোর্ঘ কাজ দেয়।

১৯৩৫ সালে ডোম্যাক তাঁর আবিষ্কারের তথ্য ঘোষণা করেন। বিশ্বের সকলে একবাক্যে প্রনটোসিলের বিশেষত্বের কথা স্বীকার করলেন।

১৯৩৭ সালে ডোম্যাককে নোবেল প্রাইজে সম্মানিত করা হয়, কিন্তু হের হিটলারের আদেশে ডোম্যাক এই সম্মানিত পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেন নি।

হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন প্রনটোসিল তৈরির পদ্ধতি যেন কিছুতেই বৃটিশ শক্তি জানতে না পারে। দেখা যাক নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলে বৃটিশ সৈনিকরা কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে? কিন্তু এই চরম ধ্বংসাত্মক নিষেধাজ্ঞার জন্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল আর এক ওষুধ, যে ওষুধ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান আধুনিক যুগের দিকে পদক্ষেপ করল।

॥ ছত্রিশ ॥

১৯২৭ সাল। ডিসেম্বর মাস।

ইংলণ্ডের মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল জীবাণু সম্পর্কে একটা বই সম্পাদনা করছিলেন। ফ্লেমিংকে ভার দেওয়া হল স্ট্যাফাইলো কক্কাস জীবাণু সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লেখার।

১৯২৮ সালে লিখতে বসার আগে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ভাবলেন স্ট্যাফাইলো কক্কাস নিয়ে কিছু কাজ করে হাতে কলমে ব্যাপারটা দেখে লিখলে আরও ভাল হবে।

এই ভেবে তিনি অনেকগুলি স্ট্যাফাইলো কক্কাস এর কালচার প্লেট তৈরি করে ল্যাবোরেটরীতে রেখে দরজা জানালা বন্ধ করে চলে গেলেন, কারণ ঠাণ্ডায় স্ট্যাফাইলো কক্কাস ভালভাবে জন্মাতে পারে না।

কয়েকদিন পরে আলেকজাণ্ডার তাঁর এক বন্ধুকে কালচার প্লেটগুলি দেখাবার জন্যে ল্যাবোরেটরীতে নিয়ে গেলেন।

কয়েকটি প্লেট দেখাবার পর একটা প্লেট দেখাতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বন্ধুকে কিচ্ছু বললেন না। অন্য প্লেটগুলি দেখিয়ে ল্যাবোরেটরী থেকে বেরিয়ে এলেন।

বন্ধুকে বিদায় দিয়ে আলেকজাণ্ডার আবার ল্যাবোরেটরীতে ফিরে এলেন। সেই কালচার প্লেটটি হাতে নিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। প্লেটের মাঝখানে নীলাভ ছত্রাক হয়েছে আর তার আশে পাশে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু নেই কেন?

সেই ছত্রাক প্লেট থেকে নিয়ে অন্য প্লেটে দিয়ে গ্রোথ সৃষ্টি করলেন এবং সেখানে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু দিয়ে দেখলেন সেগুলি মরে যাচ্ছে।

গবেষণার কাজ পুরোদমে চলল। ছত্রাকগুলি অণুবীক্ষণের নীচে পরীক্ষা করে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং দেখলেন সেগুলি দেখতে অনেকটা ঝাঁটার মত। ছত্রাকের নাম দিলেন পেনিসিলিয়াম নোটাটাম।

কালচার মিডিয়াম থেকে আলাদা করে আলেকজাণ্ডার—ফ্লেমিং এই ছত্রাক আলাদা করে ইঁদুর খরগোশ প্রভৃতি জীবের গায়ে ইনজেকশন দিলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন এই ছত্রাক জীবের দেহে তেমন কোন বিষক্রিয়া করে না।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে এক বৈজ্ঞানিক সভায় আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধের কথা বললেন, কিন্তু কেউ তেমন আমল দিলেন না। ইনসুলিনের অনুকরণে আলেকজাণ্ডার তাঁর-ওষুধের নাম দিলেন পেনিসিলিন। আলেকজাণ্ডার তাঁর আবিষ্কারের কথা বলতে প্রধান অধ্যক্ষ ডাক্তার রাইট নিজের কাজ না করে অন্য ধরনের কাজ করার জন্য ভৎর্সনা করলেন।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পদে পদে বাধা পেয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন তবু ঠিক করলেন তিনি যতখানি কাজ করেছেন, ততখানি পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করতে গেলে অধ্যক্ষের অনুমতি প্রয়োজন। ফ্লেমিং গেলেন স্যার রাইটের কাছে। প্রথমে তিনি কিছুতেই অনুমতি দেবেন না, ফ্লেমিংও ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত ফ্লেমিং এর জেদের কাছে হার স্বীকার করে রাইট অনুমতি দিলেন। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এর প্রবন্ধ প্রকাশিত হল ১৯২৯ সালের জুন মাসে।

গ্রেট বৃটেনের-অক্সফোর্ড ডুন স্কুল অফ প্যাথোলজির চিকিৎসক ডাঃ হাওয়ার্ড

ফ্লোরে প্রনটোসিলের মত ওষুধ নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর সহকারী ডাক্তারই, চেইনের কাছে। ডাঃ চেইন জাতিতে জার্মান ইহুদী। হিটলারের ভয়ে পালিয়ে আসেন ইংলণ্ডে এবং প্রফেসর হাওয়ার্ডের সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন। অধ্যাপকের নির্দেশে তিনি লিটারেচার সার্চ করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এর অর্ধসমাপ্ত কাজের কথা দেখতে পেলেন। প্রবন্ধটি পড়ে দুজনেই খুব উৎসাহিত বোধ করলেন এবং নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দিলেন। ওঁরা পেনিসিলিনকে বিশুদ্ধকরণ করলেন, ফ্লেমিং এর পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরি করলেন এবং বিভিন্ন রোগে দিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ২৪ শে অগাস্ট ১৯৪০ সালের বিখ্যাত চিকিৎসাপত্রিকা ল্যানসেটে ফলাফল প্রকাশ করলেন।

এই প্রবন্ধ দেখেই আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ছুটে এলেন প্রফেসর হাওয়ার্ড আর ডাঃ চেইনের কাছে। ফ্লেমিংকে দেখে ওঁরা আনন্দে আত্মহারা। জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কাজ শেষ করেননি কেন?

আলেকজাণ্ডার তাঁর প্রথম জীবনের ব্যর্থতার কারণ বললেন। প্রফেসর হাওয়ার্ড বিভিন্ন সংস্থাকে পেনিসিলিন ব্যবহার করতে বললেন, কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়ঙ্করভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমেরিকা সরকার তখন একটা সারকুলার দিলেন সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ নিউমোনিয়া হচ্ছে। কারুর কাছে যদি প্রনটোসিলের মত ওষুধ থাকে, তাহলে যেন তারা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

প্রফেসর হাওয়ার্ড পেনিসিলিনের কথা জানালেন। আমেরিকা সরকার এই ওষুধ গ্রহণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি করে প্রথম ব্যবহার করলেন ১৯৪২ সালে।

যেসব সৈন্য নিউমোনিয়ায় মারা যাচ্ছিলেন পেনিসিলিনের কল্যাণে আবার তাঁরা বেঁচে উঠলেন।

বিজ্ঞানের রথ এগিয়ে চলল আধুনিক যুগের পথে।

১৯৪৪ সালে বৃটিশ সরকার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লেমিং এবং ডাঃ ই-চেইনকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৪৫ সালে এই তিন মণিষী পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্যে নোবেল প্রাইজ পান।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং স্কটল্যাণ্ডের এক চাষীর সন্তান। জন্ম ১৮৮১ খৃস্টাব্দে ফ্লেমিং এর বয়স যখন সাত, তাঁর বাবা মারা যান। বৈমাত্রেয় দাদা ডাঃ টমাসের

কাছে বড় হন এবং সৈন্যদলে যোগদান করেন। এই সময়ে এক আত্মীয় মারা যাবার সময় আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে উইল করে দুশো পাউণ্ড দিয়ে যান। সেই টাকায় ডাঃ টমাস আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে ডাক্তারী পড়ান এবং অবশেষে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সেই-সাধনার সমাপ্তি।

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৮ই জুলাই।

রাশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের ছোট্ট শহর প্রেলুকাতে জন্ম হল এক শিশুর। এমনি তো কত শিশুই প্রত্যহ জন্মগ্রহণ করছে, কজনকে আর মনে রাখা সম্ভব। কিন্তু যাঁরা মানবজাতির কল্যাণের রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছেন উন্নততর ভবিষ্যতের জন্যে, তাঁদের কথা লেখা হয়ে যায় স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায়।

প্রেলুকার সেই শিশুটির নাম সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যান। দরিদ্র সংসার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও রাশিয়ার অধিকাংশ মানুষ বাস করতেন দারিদ্রসীমার নীচে। সেলম্যান অত্যন্ত মেধাবী। মা তাকে সময় পেলেই পড়াতেন। গ্রামের স্কুলেই সেলম্যানের শিক্ষারম্ভ এবং ১৯০৯ সালে যখন স্কুলের লেখাপড়া শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় তাঁর মা হঠাৎ মারা গেলেন।

মায়ের মৃত্যুতে সেলম্যান অসম্ভব রকমের আঘাত পেলেন এবং ঠিক করলেন রাশিয়া ছেড়ে আমেরিকায় চলে যাবেন।

আমেরিকায় সেলম্যানের খুড়তুতো ভাই মেনডেল কর্ণব্লাট নিউজার্সির মেচাটন গ্রামে থাকতেন। এখান থেকে রাটজার্স কলেজ খুব কাছেই, তাই পরের বছর সেই কলেজে ভরতি হলেন।

কলেজের জীবাণু বিজ্ঞানের প্রধান ডাঃ জেকব লিপম্যানের কাছে গিয়ে সেলম্যান বললেন—তিনি কৃষিবিজ্ঞান পড়তে চান।

প্রফেসর লিপম্যানও দেশত্যাগী রাশিয়ান। তিনি সেলম্যানকে পরীক্ষা করে বুঝলেন সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যান কৃষিবিজ্ঞানেই পারদর্শী হতে পারবেন এবং বিনাদ্বিধায় ওয়াকস্‌ম্যানকে পরের বছরে কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্র করে নিলেন।

১৯১৫ সালে স্নাতক হলেন ওয়াকস্ম্যান।

অধ্যাপক হ্যালস্টেড তাঁকে সহকারী হিসেবে কাজ করার আমন্ত্রণ জানালেন। ওয়ার্কস্ম্যান আশ্চর্য মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই সকলেই তাঁকে সহকারী হিসেবে পেতে আগ্রহী, কিন্তু ওয়াকস্ম্যানের আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল মাটির প্রতি। মাটির মধ্যে শুধু ফসল ফলেনা, তার সঙ্গে হাজার রকমের জীবাণু জন্মগ্রহণ করে। কোন জীবাণু কোন ফলকে নষ্ট করছে, কি ভাবে নষ্ট করছে, কি ভাবে সেই ফসল বাঁচানো যায়, তারই বিশদ গবেষণা করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন ওয়াকস্ম্যান। মাটি থেকে যে সোনার চেয়েও দামী পদার্থ পাওয়া যেতে পারে এ বিশ্বাস সেলম্যান ওয়াকস্ম্যানের ছিল, তাই তিনি মাটিকে প্রণাম করেছিলেন, পূজো করেছিলেন। সবিনয়ে অধ্যাপককে সেই কথা জানিয়ে দিলেন।

১৯১৬ সালে বিয়ে হল আর বিয়ের পরই নববধূ ডেবোরা মিটনিকের সৌভাগ্যে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ এল জৈব রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করার জন্যে। স্বামী স্ত্রীতে রওনা হয়ে গেলেন কালিফোর্নিয়াতে। সেখানে মৌলিক গবেষণা করে পি: এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করলেন। বিজ্ঞানের এই বিভাগ তিনিই সৃষ্টি করলেন পরবর্তী যুগে যার নাম দেওয়া হল সয়েল মাইক্রোবায়োলজি।

এই গবেষণার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন মাটির যত গভীরে যাওয়া যায়-ততই জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়, কিন্তু ছত্রাক-এর বংশবৃদ্ধি কমে না। তিনি আর একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করলেন। একদল জীবাণু অন্যদলকে মেরে ফেলে আবার একদল জীবাণু অন্য আর একজনকে বাঁচতে সাহায্য করে।

দু বছর পরে ওয়াকস্ম্যান পুনরায় ফিরে এলেন রাটজার্সে এবং এইখানেই সুযোগ এল সেই আলোর রশ্মি রেখার। যে রশ্মি স্বর্গের রশ্মি, যে রশ্মি মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। আমেরিকার টি. বি. সংস্থা ওয়াকস্ম্যানকে অনুরোধ করলেন যক্ষারোগের জীবাণু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।

ওয়াকস্ম্যান এক কথায় রাজি হলেন কিন্তু মাটির কথা ভুললেন না। মাটি ও যক্ষার জীবাণু মিলিয়ে দিলে কেমন হয়? ওয়াকস্ম্যান অবাক হয়ে দেখলেন যক্ষার জীবাণু মাটির সংস্পর্শে বেশিদিন বাঁচতে পারে না।

তাহলে?

নিশ্চয়ই মাটির মধ্যে এমন কোন জীবাণু বা ছত্রাক আছে যা যক্ষার জীবাণুকে ধ্বংস করে।

গবেষণা আর অনুসন্ধান। মাঠ, জঙ্গল, ডোবা, জলা সর্বত্র খোঁজ করতে লাগলেন ডাঃ সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যান। অ্যাকটিনোমাইসিন ওষুধ তৈরি করলেন অ্যাকটিনোমাইসেটিস ছত্রাক থেকে, কিন্তু এই ছত্রাক এত বিষাক্ত যে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় জানালেন তাঁদের অর্থের অনটন ঘটেছে এবং আর গবেষণা করা সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এক হয়ে গবেষণার কাজে এগিয়ে আসেন, তাহলে বিশ্বের কত বড় কল্যাণ হতে পারে ডাঃ সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যানের জীবনেই প্রমানিত হল।

আমেরিকার মার্ক শার্প অ্যাণ্ড ডোম নামক ঔষধ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলেন ওয়াকস্‌ম্যানের সাহায্যে। তাঁরা বললেন তুমি রিসার্চ করে যাও, যত টাকা লাগে আমরা দেব।

ওয়াকস্‌ম্যান আবার পূর্ণোদ্যমে রিসার্চ শুরু করলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল, কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখতে পেলেন না ওয়াকস্‌ম্যান।

হঠাৎ একদিন।

একটা মরা মুরগী তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। পেট কেটে দেখা গেল মুরগীর পেটের মধ্যে খানিকটা মাটি রয়েছে। সেই মাটি ফেলে দিলেন না ওয়াকস্‌ম্যান। সেই মাটি থেকে কালচার করে পেলেন এক রকমের ছত্রাক, যার নাম স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস। এই ছত্রাকের সংস্পর্শে এলেই যক্ষার জীবাণু মরে যায়।

পেয়েছেন, তিনি পেয়েছেন। এত বছর ধরে যে ছত্রাকের খোঁজ করছিলেন, তার সন্ধান পেলেন ডাঃ সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যান। ওষুধের নাম দিলেন স্ট্রেপটো-মাইসিন।

মার্ক শার্প অ্যাণ্ড ডোম কোম্পানী স্ট্রেপটোমাইসিন ওষুধ তৈরি করে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের কাছে পাঠালেন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর মানুষের মনে তত অবিশ্বাস নেই, ছত্রাক থেকে ওষুধ তৈরি হলেও হতে পারে।

পৃথিবীর সব চিকিৎসকই রিপোর্টে জানালেন ওয়াকস্‌ম্যান আবিষ্কৃত স্ট্রেপটো-মাইসিনে যক্ষার জীবাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং যক্ষারোগী সম্পূর্ণ সেরে যায়।

বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওষুধ প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হল যক্ষ্মারোগের অমোঘ ওষুধ স্টেপটোমাইসিন।

স্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কর্তা ডাঃ সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যান ১৯৫২ খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। এই অসামান্য বিজ্ঞান রথের সারথি ১৯৭৩ সালের ১৬ই অগাস্ট পরলোকগমন করেন।

॥ আটত্রিশ ॥

জন্ম তারিখ ও সাল-৩০শে নভেম্বর ১৮৫৮ পিতার নাম-ভগবান চন্দ্র বসু। জন্মস্থান—রাঢ়িখাল, বিক্রমপুর, ঢাকা বঙ্গদেশ।

ছেলেটির বাল্যশিক্ষা গ্রামের স্কুলে তারপর কলকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে যখন পাস করলেন, জগদীশচন্দ্র বসু, তখন তাঁর পিতামাতা নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করছেন। ভগবানবাবু চাকরি শেষে যে অর্থ পেয়েছিলেন, সবটাই ব্যয় করেছিলেন ব্যবসায়ে, কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে সে ব্যবসায় নষ্ট হয়ে যায় এবং সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হয়ে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন।

জগদীশচন্দ্র মনস্থ করলেন চাকরি করবেন, কিন্তু মা বামাসুন্দরীর দৃঢ়তায় জগদীশচন্দ্র বিলেতে গেলেন ডাক্তারী পড়ার জন্যে। বিলেতে যাবার আগে জগদীশচন্দ্র একবার আসামের জঙ্গলে যান বেড়াবার জন্যে, সেখানে তাঁর কালাজ্বর হয়। সেই কালাজ্বর কলকাতায় ভাল হয়নি এবং জ্বর অবস্থাতেই জগদীশচন্দ্র বিলেত চলে যান। বিলেতেও অনেক চিকিৎসা হল, কিন্তু কিছুতেই জগদীশচন্দ্র ভাল হলেন না, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে শেষ পর্যন্ত তিনি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিলেন। সমস্ত রকমের চিকিৎসাও পরিত্যাগ করলেন। যোগ ব্যায়াম আরম্ভ করলেন, ভোরবেলায় সমুদ্র তীরে বেড়ানোর অভ্যেস করলেন। নৌকো বাইতে শুরু করলেন। এইভাবে থাকার পর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এবার তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হলেন পিওর সায়ান্স নিয়ে। কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে ১৮৮১ সালে একটি বৃত্তি পেলেন এবং কেমব্রিজ

থেকে বি. এ. আর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এসসি পড়তে লাগলেন।

বি. এ ও বি-এসসি পাস করে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন দেশে ফিরে আসবেন। মিঃ ফসেট তখন পোস্ট মাস্টার জেনারেল। মিঃ ফসেট জগদীশচন্দ্রের ভগ্নিপতি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মিঃ ফসেট ভারতে লর্ড রিপনকে চিঠি লিখে দিলেন জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে।

লর্ড রিপনের নির্দেশে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্সএর পদে চাকরি পেলেন। মাইনে অবশ্য সাহেবদের চেয়ে কম।

অল্পদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক হিসেবে খুব সুনাম কিনলেন! শুধু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র নয়, জগদীশ চন্দ্রের ক্লাশ করতে কলকাতার বহু কলেজের ছাত্রই উপস্থিত হত। দীর্ঘ তিন বছর পরে জগদীশচন্দ্র চাকরিতে পার্মানেণ্ট হলেন এবং তিন বছরের আটকানো মাইনে একদিনে পেয়ে গেলেন। সেই থেকে টাকা দিয়ে জগদীশচন্দ্র পিতৃঋণ শোধ করে দিলেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পিতা ভগবানচন্দ্র দেহত্যাগ করলেন! দু বছরের মধ্যে মাতা বামাসুন্দরীও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

জগদীশচন্দ্রের বিবাহ হল শ্রীমতি অবলাদেবীর সঙ্গে। অবলাদেবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী। অবলাদেবীর বাবার নাম শ্রীদুর্গামোহন দাস।

অবলাদেবীকে জগদীশচন্দ্র বললেন—আমি রিসার্চ করতে চাই।

অবলাদেবী ধীর স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন—ছেলেখেলা না করে রিসার্চের মত রিসার্চ করলে আমার আপত্তি নেই।

—সংসার চলবে কি করে?

—সে দায়িত্ব আমার।

তখন জগদীশচন্দ্রের নিদারুণ অর্থকষ্ট চলছিল। চন্দননগরের একটি ছোট বাড়িতে ভাড়া থাকেন আর সেখান থেকে কলকাতায় আসেন কলেজ করতে। প্রতিদিন বিকেলে অবলাদেবী কলকাতায় আসতেন। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে রাতে ফিরতেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাকস্ওয়েল বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে অনেক মৌলিক তথ্য প্রকাশ করেন। একই সময়ে জার্মানীতে আর এক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাঁর নাম হেনরীচ হার্জ। তিনিও ম্যাকস্ওয়েলের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা করেন এবং মৌলিক তথ্য প্রকাশ করেন।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন হার্জের ভক্ত। হার্জ-প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন বিদ্যুৎ

তরঙ্গের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে শব্দ প্রেরণ করতে, কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁর আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

জগদীশচন্দ্র প্রথমে গুরুর মৃত্যুসংবাদ শুনে মর্মাহত হয়ে পড়েন, তারপর স্থির করেন গুরুর অসমাপ্ত কাজ তিনি সমাপ্ত করবেন। জগদীশচন্দ্র অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, টুরমালিন জাতীয় স্ফটিকের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গ পাঠালে আলোক তরঙ্গ একমুখী হয় এবং শব্দতরঙ্গও বিনাতারে প্রেরণ করা যায়।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জগদীশচন্দ্র এই পরীক্ষা করে সার্থক ফল পেলেন। এই পরীক্ষার সাক্ষী হিসেবে ছিলেন আর এক অসাধারণ বিজ্ঞানসাধক। তাঁর নাম প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আর ছিলেন অধ্যাপক লাঁফো।

চারিদিকে জগদীশচন্দ্রের জয় জয়াকার। বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ইলেকট্রিসিয়ান পত্রিকায় মন্তব্য করলেন- বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের যতগুলি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, নিঃসন্দেহে জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার শ্রেষ্ঠ।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দেই বৃটিশ নেভির সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন স্যার হিনরী ম্যাকসন। তিনি জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা পড়লেন। যেভাবে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্র ব্যবহারের কথা লিখেছিলেন তেমনিভাবে একটি যন্ত্র জাহাজে তৈরি করে, জাহাজের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিনাতারে সংবাদ পাঠাতে লাগলেন।

একই সময়ে ইটালীর অধিবাসী গাগলিওমো মারকনি বিনাতারে সংবাদ পাঠানোর গবেষণা করছিলেন।

জগদীশচন্দ্র স্থির করলেন বিলেত যাবেন। তার আবিষ্কারের কথা পশ্চিম-জগতের বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমানিত করতে হবে। কিন্তু টাকার-অভাব। টাকা কোথায় পাবেন? এমন সময় জগদীশচন্দ্রের প্রাণের বন্ধু কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অর্থ সাহায্য করে বিলেত পাঠান।

জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে পৌছে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু সকলকে দেখান। সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ার পত্রিকা উচ্ছ্বসিত ভাবে এই মৌলিক আবিষ্কারের কথা লিখলেন। সকলেই তাঁকে এই পদ্ধতি পেটেণ্ট করার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন ঋষিতুল্য মানুষ। তিনি পেটেণ্ট করে নিজে সুখভোগ করতে চাইলেন না। তিনি যা আবিষ্কার করেছেন পৃথিবীর সাধারণ মানুষের উপকারে আসুক এই তিনি চেয়েছিলেন, তাই-কিছুতেই তিনি পেটেণ্ট করলেন না। ইতিহাসে লেখা হয়ে

গেল ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ইটালীর অধিবাসী মার্চিজ গাগলিওমো মারকনি বিনাতারে বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি পেটেণ্ট করেছেন। এই যন্ত্রের নাম রেডিয়ো।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। এবার-বোটানির।

গাছের স্পন্দন, গাছের অনুভূতি দেখা যায় এমন একটি যন্ত্র-আবিষ্কার করলেন জগদীশচন্দ্র। নাম দিলেন ক্রেসকোগ্রাফ।

ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রের পর তৈরি করলেন রেসোন্যাণ্ট রেকর্ডার।

১৮৯৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে সম্মানসূচক ডি. এসসি. উপাধি দান করলেন।

প্যারিসে সেবার-বিজ্ঞান কংগ্রেস হবে। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার বিষয়-বস্তু প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু গভর্নমেণ্ট রাজি হলেন। কবি রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর এই খবর শুনে নিজে আবার টাকা সংগ্রহ করে অবলাদেবীর হাতে দিয়ে এসে বললেন বন্ধুবরকে প্যারিসে যেতেই হবে।

প্যারিস কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র এবং বক্তব্য পেশ করলেন। সকলেই মুগ্ধ, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন—এই আবিষ্কারগুলি একেবারে মৌলিক। ১৯০০ সালে জগদীশচন্দ্র এই স্বীকৃতি পেলেন। ১৯০২ সালে তিনি ফিরে এলেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র আবার ইউরোপ গেলেন।

১৯১৭ সালের ৩০ শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্রের উনষাট বছরের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠল বসু বিজ্ঞান মন্দির।

১৯৩৭ সালের ২৩ শে নভেম্বর বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র—গিরিডিতে দেহত্যাগ করেন। ২৪ শে নভেম্বর তাঁর নশ্বর দেহ কলকাতায় আনা হল। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কলকাতাতেই সম্পন্ন হয়েছিল।

---

* লেখকের লেখা পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া দ্রষ্টব্য।

॥ উনচল্লিশ ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান যশোর জেলার সাগরদাঁড়ির কাছে কপোতাক্ষী নদী। সেই নদীর তীরে রাড়লি গ্রামে ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।

সেই শিশুর নাম প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়ের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ইংরিজী ভাষায় এবং তিনি ইংরিজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে ছেলে প্রফুল্ল চন্দ্রকে নিয়ে কলকাতায় এলেন হেয়ার স্কুলে ভরতি করবার জন্যে।

১৮৭০ সালে হরিশ্চন্দ্রবাবু পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে আসেন। প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করতেন এবং শিক্ষকদের পড়া শুনতেন। ক্লাশের ছেলেরা তাঁকে বাঙাল বলে ক্ষ্যাপাত, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না প্রফুল্লচন্দ্র।

১৮৭৪ খৃস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর রকম রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। বহুদিন তিনি শয্যাগত ছিলেন, তারপর যখন উঠলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। সেই স্বাস্থ্য আর কোনদিন ভাল হয়নি, চিরকালের জন্য রুগ্ন হয়ে গেলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

সুস্থ হয়ে আবার স্কুলে ভরতি হলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এবার হেয়ার স্কুলে নয়, অ্যালবার্ট স্কুলে। প্রত্যেকবারই ফার্স্ট হন প্রফুল্লচন্দ্র, প্রত্যেকবারই ফার্স্ট প্রাইজ পান। বাবা হরিশ্চচন্দ্র ঠিক করলেন পরের বছর পাস করলে প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে ভরতি করে দেবেন, কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার আগেই প্রফুল্লচন্দ্র দেশের বাড়িতে পালিয়ে গেলেন। পরীক্ষা দিলেন না। এ ব্যাপারে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন।

পরীক্ষার প্রায় দু মাস পরে প্রফুল্লচন্দ্র দেশ থেকে ফিরলেন। হেড মাস্টার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল? তুমি পরীক্ষা না দিয়েই কোথায় চলে গিয়েছিলে?

—দেশে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—নিজেকে কেমন চোর চোর বলে মনে হচ্ছিল।

—তার মানে?

—বাবা বলছিলেন এ বছর উনি আমাকে হেয়ার স্কুলে ভরতি করবেন। আমি জানি, আমি পরীক্ষা দিলেই ফার্স্ট প্রাইজ নিয়েই অন্য স্কুলে চলে যাব ভেবে নিজেকে চোর বলে মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে যে এ-স্কুলে পড়বে, সেই ফার্স্ট প্রাইজ নিক। এবার পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার আমি ট্রানসফার নিয়ে হেয়ার স্কুলে চলে যাব।

শিক্ষকরা প্রফুল্লচন্দ্রের কথা শুনে অবাক। শিক্ষক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বললেন —তোমাকে আমরা ছাড়ব না। আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব।

কালীপ্রসন্নবাবু সেদিনই হরিশ্চন্দ্রবাবুর, সঙ্গে কথা বললেন। প্রফুল্লচন্দ্র অ্যালবার্ট স্কুলেই থেকে গেলেন।

স্কুল থেকে কলেজ। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পেডলারের কাছে তিনি কেমিস্ট্রি শিক্ষালাভ করেন। রসায়ন শাস্ত্রে পাঠ সমাপ্ত করে প্রফুল্লচন্দ্র স্থির করলেন বিলেত যাবেন, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রবাবুর অত টাকা ছিল না। তখন গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ বলে একটা স্কলারশিপ দেওয়া হত। প্রফুল্লচন্দ্র সেই স্কলারশিপের পরীক্ষায় বসলেন এবং সেই স্কলারশিপ পেলেন।

১৮৮২ সালে জগদীশচন্দ্র তখন বিলেতে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে চিঠি লিখলেন। জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রকে বিলেতে আপ্যায়ন করলেন। প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা ইউনিভারসিটি থেকে কেমিস্ট্রি পড়তে লাগলেন।

১৮৮৩ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এসসি হলেন। তাঁর থিসিস এত ভাল হয়েছিল যে এডিনবরার কেমিকেল সোসাইটি প্রফুল্লচন্দ্রকে ১৮৮৭-১৮৮৮ সালের জন্য সহ সভাপতি নির্বাচিত করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আগে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ সায়ান্স হন অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বাবা।

প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কাজ করা আরম্ভ করলেন।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট অফ সায়ান্স। মাসিক আড়াইশো টাকায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন অধ্যাপক পেডলারের সহকারী হিসেবে। তিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন কাঁটা চামচও ধরেছেন, কিন্তু কোনদিন ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া আর কোন পোষাক পরেন নি। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের দেবদূত। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিকরা যে রসায়ন-পদার্থ তৈরি করতেন, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে।

প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন রকমের পশুর হাড় পুড়িয়ে ক্যালাসয়াম ফসফেট তৈরি করলেন। ক্যালসিয়াম ফসফেটে নার্ভের দুর্বলতা কমে যায়। কিন্তু হাড় পোড়ানো কে খাবে? সকলেই প্রফুল্লচন্দ্রকে পাগল বলতে লাগল, তখন তিনি নিজেই হাড়পোড়ানো ছাই খাওয়া শুরু করলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন খাদ্যে ভেজাল ধরার পদ্ধতি আবিষ্কার করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের 'জার্নাল অফ দি-এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

স্যার-টমাস হল্যাণ্ড ফিজিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে কাজ করতেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বন্ধু ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে অনুরোধ করলেন কিছু ধাতু দিতে। তিনি বিভিন্ন রকমের ধাতু দিতেন প্রফুল্লচন্দ্রকে। প্রফুল্লচন্দ্র সেই ধাতু নিয়ে ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতেন। পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখলেন হলদে গুঁড়ো যেন জমা হচ্ছে টেস্ট টিউবের নীচে। একটু একটু করে ডাইলুট নাইট্রিক অ্যাসিড মেশাচ্ছেন ঠাণ্ডা শীতল মার্কারি ধাতুর সঙ্গে। কিন্তু একি.! হলদে হলদে ক্রিস্ট্যালগুলো কি? প্রথমে তিনি ভাবলেন ক্ষার জাতীয় কোন পদার্থ তারপর ভাবলেন নাইট্রিক অ্যাসিডের মত অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে ক্ষারজাতীয় পদার্থ তৈরি হবে কি করে?

হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে হাজার হাজার বিদ্যুতের ঝলক। পেয়েছেন, তিনি পেয়েছেন। রিসার্চ করতে লাগলেন। একবার নয়, দুবার নয়, বার বার।

প্রফুল্লচন্দ্রের রিসার্চ পেপার পৃথিবীর একশ চল্লিশটিরও বেশি পত্রিকায় প্রকাশিত হল। চারদিকে তাঁর জয় জয়াকার। এই নতুন পদার্থটি হল মারকিউরাস নাইট্রাইট। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্মান দিলেন মাস্টার অফ নাইট্রাইট্স্।

প্রফুল্লচন্দ্র মনেপ্রাণে বাঙালী। বাঙালীর কিসে উন্নতি হবে এই চিন্তাই সর্বদা করতেন। তিনি বলতেন—ব্যবসায় না করলে বাঙালীর উন্নতি হবে না।

বাঙালীর উন্নতির জন্যে সাধারণ মানুষ যাতে সস্তায় ওষুধ পায়, তারই জন্য তিনি ১৯০১ সালে গড়ে তুললেন ওষুধ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের নাম বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ওষুধের ফ্যাক্টরী করেন। আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কোম্পানীর সঙ্গে সুপরিচিত।

এই বরেণ্য বৈজ্ঞানিক দেহত্যাগ করেন ১৯৩৭ সালে।

শেষ অধ্যায়

আমাদের দেশে কীভাবে গবেষণা করতে হয়, বিশেষ করে চিকিৎসা-
বিজ্ঞানে এখনও সেই টিম পরিণতভাবে গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা পাওয়ার
পরও তিনদশক পরেও আমরা একটি সম্পূর্ণ টিম তৈরি করে উঠতে পারিনি
যেখানে মৌলিক গবেষণা করতে পারা যায়। বর্তমানে কোন বিষয়বস্তুর
ওপর গবেষণা করতে গেলে যে টিমের প্রয়োজন, তার মধ্যে চিকিৎসক, রসায়নবিদ
(কেমিস্ট), বায়োকেমিস্ট, ফার্মাকোলজিস্ট অতি অবশ্য থাকা প্রয়োজন।

আর দরকার ডেডিকেশন্। সাধনা। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের
সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে এবং তাঁদের অধিকাংশই চান
কোন বিষয়ে ডক্টরেট করে বিলেত আমেরিকা যাবেন, ডক্টরেট হয়ে সেখানে
অথবা ভারতে ফিরে এসে মোটা মাইনের চাকরি করবেন। রিটায়ার্ড হলে
ভাল পেনসন অথবা গ্র্যাচুইটি পাবেন। সারাজীবন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেবেন।
সংসারের ভবিষ্যত নিরাপত্তা স্থিতি করে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।

এর ব্যতিক্রমও আছে। সে কথায় পরে আসছি।

১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড এর মেডিকেল এবং
বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান পদে যোগ দিলাম। আমার কাজ হল মেডিকেল
রিপ্রেজেন্টটিভদের বিজ্ঞান বিষয়ে পড়িয়ে দেওয়া এবং ফর্মুলাগুলি দেখে ঠিক করা
কোন ওষুধটি ভাল এবং কোন ওষুধটিকে আরও উন্নত ধরণের করে তোলা যায়।
আমি স্টাডি করতে করতে দেখলাম, একটি ওষুধ অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
তৈরি করেন, যে ওষুধ তৈরি করেছিলেন রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক
বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ভি. পি. ফিলাটভ্।

ফিলাটভ্ বলেছিলেন কোন পশু বা মানুষ মারা যাবার দু থেকে বারো ঘণ্টার
মধ্যে কোন ত্বক শরীর থেকে কেটে নিয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে
সাতদিন রেখে দিলে এই রক্ষিত ত্বক বা টিসুর মধ্যে ভাইটাল ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
সেই রক্ষিত টিসু যদি কোন দুর্বল অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের ওপর ব্যবহার করা যায়,
তাহলে সেই দুর্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত কোষ পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠে। তিনি বলেন এই
কার্যপদ্ধতি হচ্ছে রক্ষিত কোষের মধ্যে ভাইটাল সাবস্ট্যান্স্ তৈরি হচ্ছে বলে।

এই ভাইটাল সাবস্ট্যান্স এর নাম দিলেন বায়োজেনাস স্টিমুলেটার-অথবা বায়োজেনিক স্টিমুলেটর।

ফিলার্টভের মৃত্যুর পর এই রিসার্চ আরও এগিয়ে গেল। যে টিস্যু থেকে বায়োজেনাস স্টিমুলেটর হয়, তার জলীয় নির্যাস থেকেও বায়োজেনাস স্টিমুলেটর পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতে ১৯৫২ সালে অ্যালবার্ট ডেভিড লিলিটেড প্ল্যাসেণ্টার জলীয় নির্যাস তৈরি করেছিলেন এবং চোখের অসুখে ব্যবহার করতেন। চোখের মনিতে (কর্নিয়া) ঘা হলে অথবা আঘাত লাগলে ঘা হয়। যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় লিউকোমা। এই অসুখে প্ল্যাসেণ্টার নির্যাস ইনজেকশন দিলে ঘা সম্পূর্ণ রূপে সেরে যায় এবং মণির দাগও সম্পূর্ণ রূপে মিলিয়ে যায়।

এই সময়ে ১৯৬১ সালে আমার সঙ্গে মালিকের মত বিরোধ হয় এবং চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিই। ১৯৬৫ সালে কোম্পানী বিক্রি হয়ে যায় এবং শ্রীযুক্ত জি. ডি. কোঠারী কোম্পানী কিনে নেন। তিনি কোম্পানী কিনে নিয়েই আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি দেখা করতেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন কোথাও চাকরি করছি কি না?

—না। জবাব দিলাম।

আমার তখন নিদারুণ অর্থকষ্ট।

—চাকরি করবেন?

—সম্মানের চাকরি হলে নিশ্চয়ই করব।

—আপনাকে আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

আমি পূর্বের পদে যোগ দিলাম।

আমি রোজই লাইব্রেরীতে যাই এবং প্ল্যাসেণ্টার বিষয় পড়াশুনা করি। ১৯৫৪ সালে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ বি. কে. দাশগুপ্ত এবং তার সহকর্মীরা ২৫টি কর্নিয়াল আলসার রোগে প্ল্যাসেণ্টার নির্যাস ইনজেকশন দেন এবং ২৩ জন রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যান। এমন কি তাঁদের চোখের দাগও মিলিয়ে যায়। তাঁর ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশিত হল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র জার্ণালে ১৯৫৪ জুন সংখ্যায়।

আমি পড়াশুনা করতে করতে হঠাৎ আমার মাথায় এল এই নির্যাস কি ভাবে এই ঘা সারাচ্ছে? কর্নিয়ার মধ্যে তো রক্ত সঞ্চালন নেই। এই নির্যাসের মধ্যে যে পদার্থ সমষ্টি আছে, তা শরীরের মধ্যে কাজ করে কী করে? রক্তের মধ্যে দিয়ে

দিয়ে তো যায় না। তাহলে কি সরাসরি কোষের মধ্যে প্রবেশ করে কোষের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ঘটায়?

এ নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম। গিনিপিগ এবং ইঁদুরের চোখে স্ট্রেপ্‌টো-ককাস ও স্ট্যাফালোকককাস জীবাণু দিয়ে কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করে প্ল্যাসেণ্টার নির্যাস ইনজেকশন দিয়ে পুরোপুরি সারিয়ে দিলাম। আমার মনে হল শুধু চোখে কেন শরীরের যে কোন জায়গায় ঘা তৈরি করে ইনজেকশন দিলে সেই ঘা সেরে যাওয়া উচিত। আমি বিভিন্ন জন্তুর গায়ে নানারকম ক্ষত সৃষ্টি করলাম এবং এই ওষুধ দিয়ে সেই ঘা সম্পূর্ণ নিরাময় করলাম।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন কলেজ অফ গাইনীকলজি অবস্ট্রেটিক এবং চাইল্ড হেলথ প্রতিষ্ঠানে দশজন পেশেণ্টের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করলাম। তাঁরা ভুগছিলেন শ্বেতপ্রদহ এবং জরায়ু এবং ফ্যালোপিয়ন টিউবের ইনফেকশনে। ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট তৈরি করে মেডিসিন সায়ান্স ও সার্ভিস পত্রিকায় পাঠিয়ে ছিলাম।

১৯৬৭ সালে কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীজগমোহন কোঠারী কোম্পানীর বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটা সভা ডাকলেন। সেখানে তিনি বললেন কোম্পানীর সব ওষুধই আপনারা দেখেছেন। কোন ওষুধ নিয়ে রিসার্চ করলে বিক্রি বাড়তে পারে।

কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল সেলম্যান ওয়াকস্‌ম্যানের কথা। তাঁকে যদি আমেরিকার ওষুধ প্রতিষ্ঠান মার্ক শার্প অ্যাণ্ড ডোম সাহায্য না করতেন, তাহলে কোন দিনই স্ট্রেপটোমাইসিনের মত ওষুধ আবিষ্কৃত হত না। আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম প্রচেষ্টা একান্তভাবে প্রয়োজন। আমি ভাবলাম যদি এঁরা সাহায্য করেন, তাহলে প্ল্যাসেণ্টা একসট্রাক্ট ওষুধকেও মর্যাদাসম্পন্ন আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

আমি বললাম—প্ল্যাসেণ্টা এক্সট্রাক্ট্‌ নিয়ে রিসার্চ করলে বিক্রি বাড়তে পারে।

—কত বাড়বে?

—লক্ষ টাকার ওপরে—

আমার সহকর্মীরা আমাকে বিদ্রূপ করে বললেন—পাগলের মন্তব্য এই উক্তি। কারণ তখন এই ওষুধের বিক্রি সারা বছরে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা।

মিঃ কোঠারী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করতে হবে?

—আমি যা খুশি করব। কেউ বাধা দিতে পারবেন না।

—বেশ আমি রাজি।

মিঃ কোঠারী অনুমতি দিলেন।

আমি আরও রিসার্চ করতে লাগলাম। এর মধ্যে খবর পেলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওষুধ প্রতিষ্ঠান সিবা গাইগী এই ওষুধের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। পরীক্ষা করছেন ডাঃ ডি. কে রায়। ইউরোপেও, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীতে ওষুধের প্রচলন আছে, তবে তাঁরা তৈরি করেন শূকর গো মহিষাদির প্ল্যাসেণ্টা থেকে।

আমার রিসার্চ রিপোর্ট ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে মেডিসিন সায়ান্স ও সার্ভিস পত্রিকায় প্রকাশিত হল। আমিই সর্বপ্রথম ভারতীয় চিকিৎসক যিনি প্রমাণ করলেন চোখ ছাড়াও শরীরের অন্য কোন স্থানে রোগ হলে, প্ল্যাসেণ্টা এক্সট্রাক্ট প্রয়োগ করলে সেরে যায়। আমার দশজন রোগিনীকে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, শুধু অসুখ সেরে যাওয়া নয়, প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এই সময়ে ওষুধটির নাম দিলাম প্লাসেণ্টেক্স। প্ল্যাসেণ্টা এক্সট্রাক্ট থেকে তৈরি বলেই নাম দিলাম প্লাসেণ্টেক্স।

সবই তো হল, কিন্তু ওষুধের বিক্রি বাড়ে না। ওদিকে সিবা গাইগী রিসার্চ করে চলেছেন। ওঁরা যদি আমাদের আগে বাজারে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ওষুধ চালু করে দেন, তাহলে কিছুতেই প্রতিযোগিতায় আমরা পেরে উঠব না।

ঠিক করলাম এমন একজনকে দিয়ে ট্রায়াল করাতে হবে যাতে দেশে ঝড় বইয়ে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ বোম্বাইয়ের ডাক্তার বি. এন. পুরন্দরের কাছে গিয়ে আমার ক্লিনিকাল রিপোর্ট দেখিয়ে একটা ট্রায়াল দিতে অনুরোধ করলাম। তাঁকে বললাম—এই দেখুন স্যার, আমি ট্রায়াল দিয়েছি। ওষুধে কোন বিষক্রিয়া হয়নি বরং আশ্চর্য সুন্দর ফল পেয়েছি। এই দেখুন প্রিক্লিনিকাল স্টাডিজ।

প্রিক্লিনিকাল স্টাডিজ কথার অর্থ-গিনিপিগ, ইঁদুর, কুকুর প্রভৃতির ওপর যে পরীক্ষা করা হয়। সেখানেও দেখা যাচ্ছে কোন বিষক্রিয়া নেই।

বিশ্বাস করুন, এই ঋষিতুল্য মানুষটি একটি পয়সাও স্পর্শ করলেন না। বললেন—একেবারে নতুন আর মৌলিক ওষুধ। কাগজ পত্র রেখে যাও আর যদি আমি ট্রায়াল দিই, তাহলে দরকার মত ওষুধ পাঠিয়ে দিও।

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ডাঃ বি. এন পুরন্দরে, তার সুযোগ্য পুত্র

ডাঃ সি বি পুরন্দরে এবং ডাঃ ঊষা হিরলেকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিলেন। যেসব রমনীদের—ফ্যালোপিয়ান টিউব বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে সন্ধান হয় না, যে সব রমনীদের ঋতুকালে যন্ত্রণা হয় এবং তলপেটে জন্মগ্রন্থিগুলিতে ইনফেকশন হয়। সেইসব রোগে ব্যবহার করলেন প্লাসেণ্টে_ক্স। ওঁরা অত্যাশ্চর্য সুফল পেলেন। কোন ক্ষেত্রে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সুফল পেলেন, কোন ক্ষেত্রে শতকরা একশ ভাগ সুফল পেলেন। ডাঃ বি এন. পুরন্দরে আমাকে কিছু না বলে এক কাণ্ড করে বসলেন। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন গোয়ার ম্যাডগাঁওতে হয়েছিল। আমি হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম আমার প্লাসেণ্টে_ক্স, ওষুধের রিপোর্ট পাঠ করলেন ডাঃ পুরন্দরে। সর্বভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলী এবং বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা ডাঃ পুরন্দরের রিপোর্ট শুনলেন।

সত্যিই ঝড় বয়ে গেল। ডাঃ পুরন্দরের রিপোর্ট ১৯৭০ সালের জানুয়ারী সংখ্যার দি ক্লিনিক্যাল পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

ডাঃ পুরন্দরে ঋষিতুল্য মানুষ।

তাঁর বহু ভক্ত আছেন সারা ভারতবর্ষে আমি নিজেও একজন তাঁর ভক্ত। এঁরা সকলেই প্ল্যাসেণ্টে_ক্স প্রেসক্রপশন করতে শুরু করলেন।

বিরোধী পক্ষের ডাক্তাররা বললেন—এ সব বুজরুকী। কি করে কাজ হয় আমরা জানতে চাই।

১৯৬৯ সালে আমি এর উত্তর দিতে পারিনি। আমি মিঃ কোঠারীকে বললাম এরপর রিসার্চ করতে গেলে আমাদের ভাল কেমিস্ট, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

মিঃ কোঠারী অভিজ্ঞ কেমিস্ট মিঃ এন. এস নায়ার এবং ডক্টর ডি. পি ঘোষকে কোম্পানীতে নিয়ে এলেন। ডক্টর ডি. পি. ঘোষ অভিজ্ঞ কেমিস্ট এবং গ্লুকোনেড কোম্পানীতে পেথিডিন ওষুধ তৈরি করতেন। মিঃ নায়ার হরলিক্স এবং মার্টিন হারিস কোম্পানীতে ছিলেন এবং অত্যন্ত উন্নত মানের ওষুধ তৈরি করেন।

বিরোধী পক্ষের চিকিৎসকদের কাছে গিয়ে বললাম—আপনারা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখুন এবং ফল পেলে প্রেসক্রপশন করবেন। তাতে খানিকটা কাজ হল এবং ওষুধের বিক্রি উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

এই সময়ে আমি একটি পেশেন্ট দেখলাম। ভদ্রমহিলার প্রথম পুত্র অস্বাভাবিক রকম মৃগী রোগে আক্রান্ত। সে ভালভাবে কথা বলতে পারে না এবং জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নয়। ভদ্রমহিলা আর একটি সন্তান চান। তিনি কলকাতার বিখ্যাত

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দীকে দেখান। ডাঃ নন্দী বলেন ভদ্রমহিলার দুটি ওভারীতেই টিউমার হয়েছে এবং টিউমারের সঙ্গে ফ্যালোপিয়ন টিউব জড়িয়ে গেছে (টি. ও. মাস) এ অবস্থায় সন্তান হবার কোন প্রশ্নই নেই এবং জরায়ু-শুদ্ধ দুটি ওভারীই অপারেশন করে বাদ দিতে হবে।

আমিও পরীক্ষা করলাম। ডাঃ নন্দী যে কথা বলেলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। জরায়ুর দু দিকে পাতিলেবুর মত দুটি টিউমার এবং অপারেশন ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই। ভদ্রমহিলা কিছুতেই অপারেশনে রাজি হলেন না এবং আর একটি সন্তানের মা হওয়ার জন্যে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আমি নিরুপায় হয়ে প্লাসেন্টে্রক্স ইনজেকশন দিলাম। চল্লিশটি ইনজেকশনের পর অবাক হয়ে গেলাম। টিউমার সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে এবং ভদ্রমহিলা অন্তঃসত্তা। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান সিজারিয়ান সেকশন করে করা হল। পুত্র সন্তান। গরীব মা-বাবা প্রায় বিনা অর্থে একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন।

আমার অভিজ্ঞতার কথা মেডিকেল কলেজের গাইনী ডিপার্টমেন্টের সহ অধ্যাপক ডাঃ অরুণ মিত্র এবং আর জি. কর হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ ভবেশ লাহিড়ীকে বললাম। ওঁরা এই সম্পর্কে বড় করে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে ভারত সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেণ্ট আমাকে ডেকে পাঠালেন। দিল্লীতে গিয়ে তথাকালীন ড্রাগ কন্ট্রোলার মিঃ পি রামচন্দন-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন—প্লাসেন্টে্রক্স বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

আমার মাথা ঘুরে গেল। তখন এই ওষুধের বিক্রি লক্ষ টাকার ওপরে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

মিঃ রামচন্দন বললেন—গভর্নমেন্টের নতুন আইন হয়েছে ভারতে কোন নতুন ওষুধ বিক্রি করতে গেলে প্রথমে বিভিন্ন জন্তুর ওপর প্রয়োগ করতে হবে। যদি কোন বিষক্রিয়া দেখা না যায়, তাহলে কমপক্ষে তিনটে কি চারটে কেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিতে হবে। কেন্দ্রগুলি যে কোন হাসপাতাল হলে হবে না। সরকারী হাসপাতাল হতে হবে এবং সেই হাসপাতালের সঙ্গে মেডিকেল ছাত্রদের শিক্ষা যুক্ত থাকবে। জন্তুর ওপর দু বছর পরীক্ষা করেও যদি দেখা যায় কোন রকম বিষক্রিয়া হচ্ছে না, তখনই এই ওষুধ বাজারে বিক্রি করা চলবে। তিনি আইনের নম্বরটিও বললেন ৬৯ বি।

সব শুনে বুঝলাম বিদেশী কোন অর্থবান ওষুধ প্রতিষ্ঠান মিঃ রামচন্দনকে

এই বুদ্ধি দিয়েছেন। আমাদের ওষুধ সত্যিই রুল ৬৯-বির আওতায় পড়ে, কারণ ভারতে অন্য কোন কোম্পানী এ ওষুধ তৈরি করেন না।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে মিঃ রামচন্দন বললেন—তাহলে কি ঠিক করলেন?

মৃদু হেসে উত্তর দিলাম—আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব, তার উত্তর দেবার পরও যদি মনে হয় প্লাসেন্টেক্স রুল ৬৯ বি এর আওতায় পড়ে, আমি মেনে নেব।

—বলুন।

—এ ওষুধ কবে বাজারে ছাড়া হয়েছে?

ফাইল দেখে বললেন, ১৯৫২ সালে।

ফাইল না দেখে ওঁরা কিছু মনে রাখতে পারেন না।

—কত বছর ধরে এ ওষুধ বাজারে চলছে?

—কুড়ি বছরের ওপর।

—কুড়ি বছরে কত পেশেন্ট-এর ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

মিঃ রামচন্দন এবার আমার কথার প্যাঁচ বুঝতে পারলেন। তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

আমি বললাম—কম পক্ষে দশলক্ষ পেশেন্টকে দেওয়া হয়েছে। আপনার আইনে আছে টক্সিসিটি টেস্ট দু বছর করতে হবে। আমার ওষুধ কুড়ি বছর ধরে মানুষকে দেওয়া হয়েছে। খারাপ বিষক্রিয়া, এমন কি ক্যানসারও যদি হত, তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে প্রকাশ পেত। সেসব কিছুই হয়নি বরং ভাল কাজই দিয়েছে। ভারতীয় ওষুধ বলেই আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আপনি ওষুধ বিক্রি বন্ধ করবেন না, তবে একে আরও উন্নত করার রিসার্চ আমরা করে যাব এবং যখন যা পাব, তখন তাই আপনাকে জানাবো।

মিঃ রামচন্দন ফাইলে সেই মন্তব্যই করলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়ে কলকাতায় চলে এলাম।

কলকাতার ডাঃ ভবেশ লাহিড়ী ডাঃ অরুণ মিত্র তাঁদের—ফলাফল প্রকাশ করলেন। তাঁরাও সুফল পেলেন। ডাঃ মহামায়া সরকার দীর্ঘদিন ধরে ট্রায়াল দিলেন এবং তাঁর ট্রায়ালে একটা নতুন জিনিষ দেখা গেল। শুধু হরমোন দিলে যেসব রোগিনী ফল পান না, হরমোনের সঙ্গে প্লাসেন্টেক্স দিলে অত্যন্ত সুফল পাওয়া যায়।

কেন? আমি খোঁজ করতে লাগলাম। অনেক খুঁজে দেখলাম এডিনোসিন ট্রাইফসপেট হরমোন মেসেঞ্জারের কাজ করে। আমি ডক্টর ঘোষকে বলতে ডক্টর ঘোষ অ্যানালিসিস করে দেখলেন প্লাসেণ্ট্রেক্স এ এটিপি আছে।

অন্ধ্রের ডাঃ জে সীতাম্মা, কেরালার ডাঃ সুভদ্রা নায়ার, কানপুরের ডাঃ এস. এন. সিনহা এবং ডাঃ ডি শুক্লা বিভিন্ন বিষয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিলেন। ডাঃ শুক্লা পোড়া ঘায়ে প্লাসেণ্ট্রেক্স ব্যবহার করে আশ্চর্য সুফল পেলেন। এরই ওপর থিসিস লিখে তিনি এম. ডি. ডিগ্রী পেলেন।

মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজির প্রধান এবং ডীন অফ দি মেডিকেল ফ্যাকালটি ডাঃ মিসেস ললিথা কামেশ্বরণ প্লাসেণ্ট্রেক্স এর বিভিন্ন ফার্মাকোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া দেখে জানালেন এই ওষুধ বহু গুণ বিশিষ্ট এবং দোষমুক্ত। ডাঃ এস কামেশ্বরণ নাক কান গলার—রোগে ব্যবহার করে—খুব সুফল পেলেন।

মহারাষ্ট্রের অমরাবতী নগরীর খ্যাতনামা চর্মবিশারদ—ডাঃ এস. কে পুনসি প্লাসেণ্ট্রেক্স ব্যবহার করলেন শ্বেতী রোগে এবং অত্যন্ত সুফল পেলেন।

বর্তমানে ইউরোপ মেনে নিয়েছেন প্লাসেণ্ট্রেক্স এর প্রাধান্য। ইউরোপও মানুষের প্লাসেণ্টা থেকে নির্যাস বার করে ওষুধ করছেন। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল সংখ্যায় দিল্লীর—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকা দি ইস্টার্ণ ফার্মাসিস্ট আমি প্লাসেণ্ট্রেক্স এর সম্ভাব্য কারণগুলি লিখে প্রকাশ করেছিলাম এবং তখন মন্তব্য করেছিলাম অ্যানিম্যাল প্লাসেণ্টা এক্সট্রাক্ট থেকে হিউমান প্লাসেণ্ট একসট্রাক্ট ভাল কাজ করবে, কারণ হিউম্যান প্লাসেণ্টা এক্সট্রাক্ট, এ ডোনার এবং রেসিপিয়েণ্ট দুজনেই একগোত্রীয় (হোমোজেনাস)। কিন্তু অ্যানিমাল প্লাসেণ্টা একসট্রাকট এর বেলায় ডোনার—ও রেসিপিয়েণ্ট দুজনে আলদা গোত্রের (হেটেরোজেনাস) সেইজন্যে আমাদের ওষুধে যে কাজ হবে ওদের ওষুধে ততখানি কাজ হতে পারে না।

এ সম্পর্কে আমি ১৯৮০ সালে ডঃ সুনি বার্গস্ট্রং এর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। অধ্যাপক সুনি বার্গস্ট্রং আমাকে উৎসাহিত করেন এবং সিমেণ্টের ওপর বসে পড়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। যে বিষয়ে তিনি জানেন না, সে বিষয়ে সবিনয়ে বললেন—এ বিষয়ে আমি জানি না, ডাঃ ম্যাকলিনটন্ এ বিষয়ে জানেন তুমি তাঁকে লেখ। আমিও লিখে দেব।

উদাহরণটি দেবার উদ্দেশ্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কি সরল চরিত্রের হয় দেখানোর জন্যে। ১৯৮৩ সালে অধ্যাপক সুনি বার্গস্ট্রং প্রস্টাগ্লাণ্ডিন আবিষ্কার করার জন্যে নোবেল পুরস্কার পান। ডাঃ বি. এন. পুরন্দরেও ভারত সরকারের ধন্বন্তরি পুরস্কারে সম্মানিত হন। এরা ঋষিতুল্য ব্যক্তি। আরও একজন তথাকথিত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ভারতীয়। তিনি আমার প্রস্তাব শুনেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন—কত টাকা দিতে পারব?

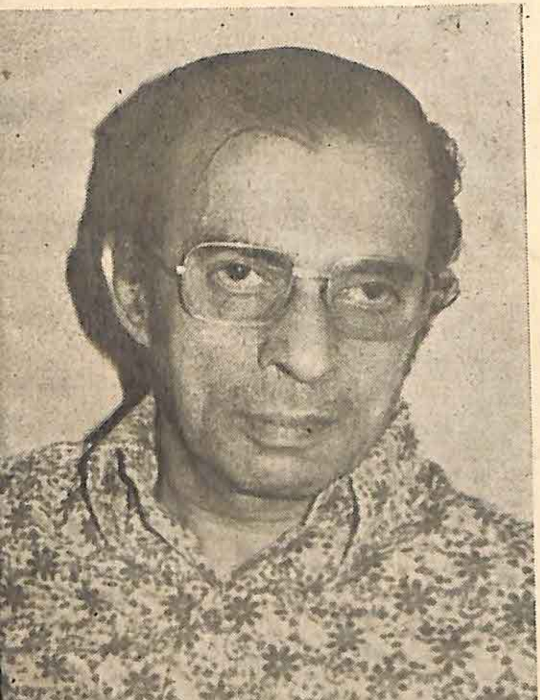
আমি তাঁর সঙ্গে আর আলোচনা করিনি। সারাজীবন বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কাটিয়ে এই শিক্ষালাভ করেছি, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রথমেই টাকা পয়সার কথা কখনও তোলেন না। তাঁরা জানতে চান সমস্যার কথা এবং সে সমস্যা সমাধানের —চিন্তা করেন। বছর কয়েক পরে দেখা গেল সেই বৈজ্ঞানিকের সব কাজই ভুয়ো। যাকগে ও সব কথা। তিনি সেই সময়ে এত বিখ্যাত হয়েছিলেন যে নাম করলেই সকলে এমন কি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী অথবা রাজীব গান্ধীও চিনে ফেলবেন।

বর্তমানে প্লাসেন্টেক্স এর বিক্রি কোটি টাকার বেশি। একাধিক ভারতীয় কোম্পানী এই ওষুধ তৈরি করেছেন এবং আমেরিকার মার্ক শার্প অ্যাণ্ড ডোমের রিসার্চ ডিভিশন যোগাযোগ করেছেন।

তবে এই কৃতিত্বের ভাগ আমি একা নিলে অপরাধ হবে। ১৯৬৭ সালে যাঁরা আমায় পাগল বলেছিলেন তাঁরা আজ কেউ নেই। আছেন শুধু মিঃ কোঠারী। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার জন্যে তিনি কখনও একটি কথাও বলেননি, সেইজন্যে প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। তারপর আমার সঙ্গে যারা আছেন তাঁদের মধ্যে মিঃ এন. এল. সাবু। মিঃ এন এস নায়ার, ডক্টর ডি পি ঘোষ, মিঃ কে পি মুন্দ্রা, মিঃ এস. এন. চ্যাটার্জি এবং ডাঃ সুরপ্রিয় মুখার্জি। এরা যদি সহযোগিতা না করতেন, তাহলে প্লাসেন্টেক্স এর এই সাফল্য কখনও সম্ভব হত না। এরা সকলেই দীর্ঘজীবি হোন এবং আমার মৃত্যুর পরে আমার অসমাপ্ত কাজ এরা শেষ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। কারণ কাজের এখনো অনেক বাকি।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক প্লাসেন্টেক্স প্রেসক্রিপশন করছেন এবং একশোরও বেশি ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট আমার কাছে আছে। সকলের বক্তব্য বিষয় এবং নাম ধাম এত অল্প পরিসর বইতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই—যাঁদের

নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এইটুকু শুধু বলে। সমস্ত ভারতীয় চিকিৎসক যদি এই ভারতীয় ওষুধটিকে ভাল না বাসতেন নিজের বলে মনে না করতেন, তাহলে কিছুতেই এই ওষুধ এত প্রাধান্যলাভ করত না।



লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৩১ সালের ২৮ নভেম্বর। ১৯৪৭ সালে চক্রধরপুর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হাইস্কুল থেকে চারটি বিষয়ে লেটার নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে আশুতোষ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. এস.সি. পাশ করেন। এম. বি. বি. এস. পাশ করেন আর. জি. কর কলেজ থেকে। অ্যানাটমি পরীক্ষায় পান ফার্স্ট সার্টিফিকেট অফ অনার্স। ডি. জি. ও পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৯৫৯ সালে বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 'অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড'-এর মেডিকেল ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন এবং এখনও যুক্ত। তাঁরই মুখ্য গবেষণায় প্লাসেণ্টার জলীয় নির্যাস থেকে যে ওষুধের সৃষ্টি, সেই ওষুধ বর্তমানে লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক নানা রোগে নিত্য ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন।

তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা পঁচিশ। দুটি উপন্যাস কানাড়া ও অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত।